গোপাল হালদার

প্রসঙ্গ : বিদ্যাসাগর

গোপাল হালদার

অরুণা প্রকাশনী : কলকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
নববর্ষ ১৩৯৮
এপ্রিল ১৯৯১
প্রকাশিকা
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকর
শান্তিরাম দত্ত
মা শীতলা কম্পোজিং ওয়ার্কস
৭০ ডবলু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৬

পঁচিশ টাকা

একালের তরুণদের উদ্দেশে

সূচী

প্রসঙ্গ : নিবেদন

বিদ্যাসাগরের জীবনান্তের পরে বাঙালি-জীবনে একশত বৎসর অতিবাহিত হয়েছে—আধুনিক বাঙালি-জীবন মোটামুটি এ সময়ে গড়ে উঠেছে। যাঁদের দানে তা সম্ভব হয়েছে, তাঁদের মধ্যে প্রধান একজন পুরুষ বিদ্যাসাগর। আমাদের অনেক ত্রুটি থাকলেও মানতেই হবে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ও কীর্তি আমরা বিস্মৃত হইনি। বিদ্যাসাগরকে অন্যতম পুরোধারূপে বরাবর শ্রদ্ধা করে এসেছি। তবে কালের নিয়মেই স্বীকার করতে হবে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বরূপ ও কীর্তির তাৎপর্য সবসময়ে আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। নিজের কালের থেকে বিদ্যাসাগর চিন্তা-চেতনায় অনেকটাই এগিয়েছিলেন—তিনি যথার্থ আধুনিক মানুষ ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে এমন অনেক অসামান্য মূল্যায়ন রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখের হাত থেকে আমরা পেয়েছি যা বিদ্যাসাগরের জীবনমূল ও তাঁর চিরন্তনমূল্য আমাদের নিকট সুস্থির করে স্থাপন করে গিয়েছে। তবুও তাঁর সম্পর্কে আরো কিছু কথা হয়ত বলবার আছে—বর্তমান লেখক তা বিশ্বাসও করেন। বিদ্যাসাগরের রচনা সংগ্রহ ও সংকলন করতে গিয়ে এ কথাটা আমার মনে হয়েছিল, কিন্তু নানা কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কিছু বলবার সংকল্প আমার ছিল, তা প্রকাশের সুযোগ করে দিয়ে অরুণা প্রকাশনীর কর্মাধ্যক্ষগণ আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। পাঠক একটু যত্নসহকারে 'প্রসঙ্গ : বিদ্যাসাগর' গ্রন্থের সূচী ও পরিশিষ্টাংশ লক্ষ্য করলেই এ সত্য অনুধাবন করতে পারবেন ;—পূর্বসূরীদের সকল প্রয়াস ও গবেষণা সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ করেই বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক একটা পরিচয় তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছি।

বর্তমান লেখক বিশ্বাস করেন, বিদ্যাসাগরের চরিত্র-মহিমা নতুন করে অনুধাবন করা প্রয়োজন—বিশেষ করে যখন সমস্ত জগৎজোড়া সংকট এবং বাঙালি-জীবনে নতুন করে অন্ধকার তখন বিদ্যাসাগর যেন আজও মনুষ্যত্বের এক সবল প্রেরণার বাহক, অজেয় পৌরুষের আশ্রয়।

এই মুহূর্তে বারবারই মনে হয়—'Vidyasagar thou should'st be living at this hour.' বিদ্যাসাগর আজও প্রাসঙ্গিক, আজও আধুনিক—এ গ্রন্থ প্রকাশ তাই অপ্রাসঙ্গিক নয়। পরিশেষে অরুণা প্রকাশনীর কর্তৃপক্ষ এবং আমার স্নেহভাজন সহযোগী অমিয় ধরের অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি। ইতি—

বিনীত
গোপাল হালদার

কলকাতা
৯ই মার্চ, ১৯৯১

১

প্রস্তাবনা

বিদ্যাসাগরকে প্রণাম! বাঙালীর জীবনে তিনি এক অভিনব আবির্ভাব—নবজাগরণের প্রদীপ্ত প্রকাশ। ষাট-বাষট্টি বৎসর পূর্বে 'প্রবাসী' অফিসে বিদ্যাসাগরের জীবন-তথ্য আলোচনায় তথ্য-বিশারদ স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের একবার বলেছিলেন, "বিদ্যাসাগর,—বিদ্যাসাগর তো সাহেব ছিলেন।" চটি-চাদর পরা সেই পণ্ডিতের সম্বন্ধে, যিনি সাহেব কর্তৃপক্ষের সামনে আপনার চটিসুদ্ধ পা টেবিলে তুলে দিয়ে সাহেবদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন নিজের ব্যক্তিগত ও জাতীয় মর্যাদাবোধ, তাঁর সম্বন্ধে সাহেবিয়ানার প্রশ্ন নিশ্চয়ই ওঠে না। এ হচ্ছে 'ইউরোপীয় গুণগ্রাম' (European virtues) বলে আমরা যা বাহ্যতঃ জানি তারই কথা। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বে শুধু দয়া নয়, করুণা নয়, সেই ইউরোপীয় কর্মশক্তি ও আধুনিক জীবন-দৃষ্টি মিলিত হয়ে 'দয়ার সাগর'কে আমাদের সামনে রেখে দিয়ে গিয়েছে 'অজেয় পৌরুষের ও অক্ষয় মনুষ্যত্বে'র বলিষ্ঠ ঐতিহ্যরূপে ; সত্যসত্যই সে ঐতিহ্যবোধ আমাদের আছে কিনা জানি না। সেদিনের সমাজে তিনি ছিলেন একক ; অথচ 'আধুনিকতার প্রবহমান ধারা'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরই এই কথা—বিদ্যাসাগর ছিলেন মিলিত। একথা সত্য হলে মৃত্যুর একশো বৎসর পরেও বিদ্যাসাগর জীবিত। এই প্রবাহ-বোধ—রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আমাদের এই নবজাগরণের প্রবাহ—এর উত্থান, পতন, পরাজয়ের মধ্যেও দেখি তাঁর জয়লেখা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) সম্বন্ধে কেউ বলেন তিনি নাস্তিক ছিলেন। Positivist কেউ বলেন না। মুখে না বললেও তিনি ব্রাহ্মণ, এমন কি শ্রীদুর্গাও লিখতেন। দুর্দান্ত তাঁর পুরুষকার। বাস্তবজ্ঞানের সঙ্গে হৃদয়ধর্ম শুধু নয়, সত্যকারের কর্মযোগীর গুণও সম্মিলিত হয়েছিল এই চটি-চাদর-পরা পণ্ডিতের মধ্যে, মাইকেলের কথা মনে পড়ে, 'The first man among us.' শুধু বাঙালী মায়ের হৃদয়ধর্ম নয়, ভারতীয় ঋষির জ্ঞান, আর ইউরোপীয় কর্মশক্তি—এর তুলনা কোথায়? রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত জ্ঞান-ধর্ম-সাহিত্য-সৃষ্টিতে উজানবাহী এই বাঙালী জাগরণের মধ্যে বিদ্যাসাগর অনন্য পুরুষ। দয়া নয়, মায়া নয়—'অজেয় পৌরুষ,...অক্ষয় মনুষ্যত্ব'—রবীন্দ্রনাথের মতে,—এই ধর্ম মাতামাতিশূন্য মহা-

পুরুষের চারিত্র্যধর্ম। হৃদয়ধর্মেও তিনি মহান, তা তো সর্বস্বীকৃত। ত্রুটি তাঁর ছিল তা নয়,—এক গুঁয়ে, একযোগে কাজ করতে প্রায় অনভ্যস্ত এবং রাজনৈতিক কর্মে সাধারণভাবে অনীহা, সমাজ-সংস্কারেও ইংরেজ শাসকবর্গের পথ চেয়ে থাকা—এসব নিশ্চয়ই তাঁর শক্তিকে খর্ব করেছে—সমগ্রভাবে জাগরণের যুগকেও পুষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু বাংলার জাগরণ বিদ্যাসাগরের মধ্যেই পেয়েছিল সত্যকারের বস্তু-নিষ্ঠ, দৃঢ়ব্রত ও মহাপ্রাণ পুরুষ। প্রায় বুদ্ধদেবের মত তিনি দৃষ্টান্ত রেখে যান—জীবনকে যুক্তি দিয়ে, কর্ম দিয়ে ও আন্তরিক প্রেম দিয়ে গড়তে হলে ভগবান ও পরলোক নিয়ে মাতামাতি করা নিষ্প্রয়োজন, এমন কি অর্থহীন ; ধর্ম নিজ নিজ ব্যক্তিগত ভাবনা ও সাধনার বিষয়। তিনি যুগধর্মের Secular ও human বাঙালী আদর্শ নিজ জীবনে মূর্ত করে যান—রেখে যান এক সহজতর ও অখণ্ড মনুষ্যত্বের (humanity) দৃষ্টান্ত। কিন্তু তা জীবনে গ্রহণ করতে পারল দেশের আর কোন্ মানুষ?

বিদ্যাসাগরের জীবন বহুমুখী এবং বিস্তৃত ১৮৯১ পর্যন্ত—বঙ্কিম যুগের প্রায় শেষ অবধি। তবে শেষের দিকে তাঁর শক্তি ক্ষয় হয়ে এসেছে। তাঁর বহুমুখী কর্মের প্রধান দিকগুলিই স্মরণ করে বুঝি কী তাঁর দান। বিদ্যাসাগরের কাজের প্রথম দিক : শিক্ষাসংস্কার। সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন বিদ্যাসাগরের বিশেষ কীর্তি। পরের পর্বে মেট্রোপলিটান কলেজ গড়াও তাই। কিন্তু সেসব সার্থক প্রয়াসের অপেক্ষা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ তাঁর ব্যর্থ প্রয়াস দুটি (১) জনশিক্ষার জন্য বঙ্গ বিদ্যালয়, গুরুট্রেনিং স্কুল প্রভৃতি স্থাপন করে শিক্ষার আলো দেশে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা। (২) বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে নারীদের মধ্যে সে আলো বিস্তারের অধীর আগ্রহ (১৮৫৬)। এই কাজেই সরকারের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। আর তাতে এই অজেয় পুরুষ সেদিনের অত বড় চাকরি ত্যাগ করেন (১৮৫৮)। জন-শিক্ষার বিস্তার ব্যাহত হয় সরকারের ঔদাসীন্যে। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন ইংরেজ রাজপুরুষেরা জনশিক্ষা বিস্তারে আগ্রহহীন ; বোঝেননি, এটাই শাসক-স্বার্থ। তিনি আরও দেখেছিলেন বাঙালীদের বাংলা স্কুল সম্বন্ধে ঔদাসীন্য ; বোঝেননি, তাই মধ্যবিত্তদের স্বার্থ। সাধারণ মানুষ বাংলায় লেখাপড়া শিখলে তাদের কি লাভ? চাকরি তো বাংলানবিশরা পাবে না, পাবে ইংরেজিওয়ালারা। ১৮৩৮-এর পর ইংরেজি শিক্ষা ও চাকরি একসঙ্গে গাঁথা হয়ে গিয়েছে মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের মনে। চাকরিই মধ্যবিত্তের নতুন ধর্ম। বাংলায় শিক্ষা তাই কেউ ছুঁতেও চায় না।

শিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের আর একটি প্ল্যানও ছিল, তাও সমান তাৎপর্য-পূর্ণ। কোন্ ভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম? বিদ্যাসাগর ১৮৪৭-এর সময় থেকেই বলেন

সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার লক্ষ্য হবে,—মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান ও বিজ্ঞান ছাত্রদের নিকট উপস্থিত করা। লক্ষণীয়—(১) মাধ্যম—মাতৃভাষা, (২) শিক্ষণীয়—আধুনিক জগতের 'Science and Knowledge of the Western World'। (৩) শুদ্ধ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় বই লেখবার ক্ষমতা আয়ত্ত করার জন্যই প্রয়োজন কিছু সংস্কৃত শিক্ষা (বেদ-বেদান্ত নিষ্প্রয়োজন—এমন কি ক্ষতিকর)। এবং (৪) পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিদ্যা সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজন ইংরেজি শিক্ষা। ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে 'ল্যাঙ্গোয়েজ প্রোব্লেম' সমাধানের পক্ষে ও শিক্ষানীতির দিক থেকে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট শিক্ষানীতি আর হতে পারে না। এই হতে পারত জাতীয় শিক্ষা এবং নবজাগরণের আসল শিক্ষা-বনিয়াদ।

বিদ্যাসাগরের কাজের দ্বিতীয় দিক: বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের চেষ্টা। এখানেই হয় তাঁর পৌরুষের পরীক্ষা। বিধবা-বিবাহ আইন সিদ্ধ করানো অসীম পরিশ্রমে এবং বিধবা-বিবাহ প্রচলনে তাঁর 'তনমনধন' সমর্পণ—এই একটি দিক। আশ্চর্য এই, নবশিক্ষিত হিন্দুরাও বিদ্যাসাগরের এই প্রয়াসের সমর্থনে বিশেষ এগিয়ে আসেনি। ধনী ও বড়লোকেরা তাঁকে নিরাশই করে। আর একদিক, বহুবিবাহ নিষেধ করার করার জন্য আন্দোলন—এটিতেও তিনি ব্যর্থ হন। এই দুই ব্যর্থতার সূত্রে, আর তাঁর স্ত্রী-শিক্ষার আগ্রহে, দেখতে পাওয়া যায় নবজাগরণ কতটা খর্বিত। বিদ্যাসাগরের প্রয়াসে দেখতে পাই আর একটা চেতনার আভাস—নারী-সম্পর্কে নতুন বোধ জন্মগ্রহণ করছে। নারী-সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আরম্ভ হয় পাশ্চাত্ত্য রিনাইসেন্সের সময় থেকে নারীর দৈহিক রূপকে আশ্রয় করে। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের এই বোধ জন্মাল নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, মমতা ও স্নেহ আশ্রয় করে। বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি ও সৃষ্টি—শকুন্তলা, সীতার বনবাস থেকে ক্ষুদ্র আত্মচরিত পর্যন্ত—নারীর প্রতি এই শ্রদ্ধায় উদ্বুদ্ধ। এইখানেই আমরা বিদ্যাসাগরের বুদ্ধি ও বিশাল স্নেহময় হৃদয়েরও পরিচয় পাই—যে পরিচয় সাধারণের দেওয়া 'দয়ার সাগর' নামেও ফুটে উঠেছিল। সেই পরিচয় আরও সত্য হয়, যদি মনে রাখি বিদ্যাসাগরের সাহেবী গুণ—European virtues বা best bourgeois virtues শেখানোর উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সুপরিকল্পিত শিক্ষাগ্রন্থ রচনা, ছাপাখানা, গ্রন্থালয় স্থাপন, ব্যবসায়, নিয়মানুবর্তিতা, কার্যদক্ষতা ইত্যাদি। নিজের জীবনকে সুস্থ-দৃঢ়চিত্তে সংগঠন--ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষের এই তো প্রধান virtue। তাতেই নতুন সমাজেরও ভিত্তি রচিত হয়।

বিদ্যাসাগরের তৃতীয় দিক ; বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, তিনি সাহিত্যধর্মী বাংলা গদ্যের জনক। বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত

সকলেই তাঁর এ মর্যাদা স্বীকার করে নিয়েছেন। আর, 'বিদ্যাসাগরী বাংলা' সম্বন্ধে একালে অনেকের যা ধারণা তাও ঠিক নয়; বিদ্যাসাগর সহজ ও স্বচ্ছ বাংলাও লিখেছেছেন—চমৎকার নির্মল বাংলা। অসমাপ্ত আত্মচরিত 'বিদ্যাসাগর চরিত'-এর বাংলা স্বচ্ছতোয়া—বিবরণের, আখ্যানের, জীবনচরিতের ও উপন্যাসের মত চরিত্র-চিত্রের সম্পদে তা বিদ্যাসাগরের প্রাঞ্জল, সরস ভাষার অনুপম কীর্তি। বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' শুধু কালিদাসের সার্থক অনুবাদ নয়, অভিনব রূপান্তরও। 'সীতার বনবাস'ও শুধু আহরণ নয়; ভবভূতি ও বাল্মীকি সমন্বিত রূপায়ণ। 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাসে' বাংলা গদ্য—ভাষার লালিত্য, বেদনা-গাম্ভীর্যে, করুণামাধুর্যে ও সংস্কৃত শব্দের সংহত যোজনায়, ক্লাসিক গুণান্বিত স্থির রূপ লাভ করেছে। বিধবা-বিবাহের সমর্থনে বা বাল্যবিবাহের প্রতিবাদে লেখাগুলির যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবিচার আন্তরিক আবেগে মর্মস্পর্শী, আবার কখনো ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে প্রায় মৌলিক ভঙ্গীর বাংলা। এই বিদ্যাসাগরী ভাষাকেই সরল করেছেন পরে বঙ্কিম। বিদ্যাসাগরের হাতে গড়ে উঠেছিল সংস্কৃত কলেজের একদল লেখকও, তাও স্মরণীয়।

শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার বা সাহিত্যকীর্তি দিয়ে বিদ্যাসাগরের পরিমাপ হবে না, তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর প্রারব্ধ বহ প্রচেষ্টার অপেক্ষাও মহত্তর। এ মানুষের স্বরূপ না বুঝলে ঊনবিংশ শতকের বাঙালী-প্রয়াস বোঝা অসম্পূর্ণ থাকে। 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ'—একথা ঊনবিংশ শতকের কীর্তিমান বাঙালীদের মধ্যে যাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি সত্য তিনি বিদ্যাসাগর। এ মানুষ আপন মহিমায় একক। সে মহিমা তাঁর পৌরুষ, তাঁর অখণ্ড মনুষ্যত্ব—এবং আজ যা আমরা বিশেষ করে বুঝি—তাঁর মানবধর্মিতা, যা ছিল তাঁর স্বধর্ম। সমগ্রভাবে দেখলে সেই পৌরুষের ও মনুষ্যত্বের সাধনাই বাংলার জাগরণের সাধনা।

পরিশেষে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রমহিমা উপলব্ধির সহায়ক একখানি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করে (দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট), আমাদের প্রস্তাবনা সমাপ্ত করব।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বীরসিংহ থেকে কলকাতায় অগ্রজকে লিখেছিলেন—বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবা ভবসুন্দরীকে বিবাহ করতে মনস্থ করেছেন; সে বিবাহ সম্পন্ন হলে কুটুম্বগণ তাঁদের সম্পর্ক পরিত্যাগ করবে। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যেন সে বিবাহ নিবারণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন-তখনি পত্রের উত্তর দিলেন না। ২৭শে, শ্রাবণ বিবাহ সম্পন্ন হলে পর, ৩১শে শ্রাবণ সে বিবাহে সম্পূর্ণ অনুমোদন জানিয়ে শম্ভুচন্দ্রকে এক পত্রে লেখেন—

"....কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে, এই ভয়ে যদি আমি

পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবা বিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে, আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব ; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।"

এ পত্র চিরস্মরণীয়। বিদ্যাসাগরের 'অজেয় পৌরুষ, অক্ষয় মনুষ্যত্ব' পত্রের প্রতিটি ছত্রকে দিয়েছে স্বাভাবিক সমৌজ্জ্বল্য। বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শ ও কর্মজীবনের বিচারেও এ পত্র প্রয়োজনীয় এক প্রধান সূত্র। বিধবাবিবাহ প্রবর্তনকে সেই অনন্যকর্মা মহাপুরুষ তাঁর জীবনে "সর্বপ্রধান সৎকর্ম" বলে মনে করতেন। তাঁর নিজ জীবনাদর্শও এই কথাতে সুস্পষ্ট। তাঁর মৃত্যুর পরে ১০০ বৎসর অতিবাহিত। কালের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বাঙ্গীণভাবে দেখে মানুষ বিদ্যাসাগরের মহিমা আমাদের বিনম্র হৃদয়ে অনুভব করার প্রয়োজন আজ স্বতঃসিদ্ধ। বহুধারায় বাহিত সেই অদ্ভুতকর্মা পুরুষের কর্মজীবনকেও সেই সঙ্গে যুক্তিনিষ্ঠ শুভবুদ্ধিতে আলোচনা ও বিচার করবার প্রয়োজন তেমনি সর্বস্বীকার্য।

২ শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগর

যুগের পরিপ্রেক্ষিত

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যুগটার মধ্যভাগে বিদ্যাসাগরের স্থান। কবে থেকে যুগের আরম্ভ, কবে তার শেষ, এ তর্কে না গিয়েও বলা যায়—হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮১৭ ইং, ২০শে জানুয়ারি) থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান (১৯১৮ ইং, ১১ নবেম্বর), ১৯১৯-এ পাঞ্জাবের উপর জঙ্গী অত্যাচার, এবং গান্ধীজীর ভারতীয় রাজনীতিতে আবির্ভাব—মোটামুটি এই একশত বৎসরকে সমগ্রভাবে একটা যুগ বলে গণনা করা চলে। যুগটা প্রধানত বাঙালি জীবন নিয়ে, 'বাঙলার নবযুগ', 'বাঙালি জাগরণের যুগ'।

এই একশত বৎসরের জীবনপ্রবাহকে কেউ বলেছেন 'নবজাগৃতি', কেউ 'নবযুগ'। অনেকেই ইংরেজিতে বলেন 'রিনাইসেন্স' বা ফরাসি ধারায় উচ্চারণ করে বলেন 'রেনেসাঁস'। সবিনয়ে জানাই আমার তাতেও আপত্তি নেই, তবে ইংরেজিতে তাকে Awakening বলাই নিরাপদ মনে করি। কারণ অনেকেরই ঐ ইংরেজি বা ফরাসি কথাটা ব্যবহারে গুরুতর আপত্তি। তাঁরা বিদেশীয় ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে সুবিদগ্ধ, আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর 'জাগরণে' তাঁরা রিনাইসেন্সের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ খুঁজে পান না। আমি অবশ্য জানি—ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা যে আলোড়নে চঞ্চল হই তার আসল উৎস আমাদের পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবিষ্কার নয়, সেরূপ পুনরাবিষ্কারও তখন হয়েছে, কিন্তু তা ওই জাগরণেরই ফলে। যাঁরা একে বাঙলার রিনাইসেন্স বা রেনেসাঁস বলেন তাঁরাও এ সত্য স্বীকার করেন ; তারাও মনে করেন না যে ইতালির বা ইউরোপের রিনাইসেন্সের একটা 'কার্বনকপি' আমাদের বাঙলার বা ভারতবর্ষের রিনাইসেন্স, কিম্বা দুটি সমতুল্য। অধ্যাপক সুশোভন সরকার স্বল্পতম কথায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন—এ দুয়ের তুলনা হয় না। কিন্তু তা জেনেই 'রিনাইসেন্স' শব্দটার ব্যবহার তিনি বাতিল করে দেন নি। আমিও তা দিতে চাই না। কেমন করে পরাধীন জাতির মধ্যে আসবে সেই ইতালি বা ইউরোপ-ভূমির রিনাইসেন্স, আসবে ইউরোপের ১৪শ-১৬শ শতাব্দীর জিনিস ভারতবর্ষে ১৯শ শতাব্দীতে ? আমরা

তখন শুধু ইউরোপীয় 'রিনাইসেন্সের' ফলভাগী হই নি। ১৯শ শতকে আমরা শুধু ইউরোপের ১৫শ-১৬শ শতাব্দীর ভাবনার উত্তরাধিকার নিয়ে পড়ে থাকলে তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের সৌভাগ্যের কারণ হত না। এই ১৯শ শতকে আমরা পেয়েছিলাম ইংরেজের মারফৎ আধুনিক জীনের তথা 'Modern Age'-এর স্পর্শ। সেই মডার্ন এজ-এর মধ্যে ইউরোপের রিনাইসেন্স রিফর্মেশন ও ফরাসি বিপ্লবের সম্পদ মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। মডার্ন এজ তখনকার মত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। আমাদের ১৯শ শতকের বাঙালি রিনাইসেন্স তাই মানব-ইতিহাসের আধুনিকতম সম্পদসমূহ গ্রহণেরই প্রয়াস। এ শুধু সুকুমার শিল্পের ও জীবন-জিজ্ঞাসার বিকাশ নয়। মডার্ন এজ বা 'আধুনিকতা'র অর্থ ফিউডাল সভ্যতা থেকে অন্তত বুর্জোয়া সভ্যতায় প্রবেশ এবং মধ্যযুগের সমাজের রূপান্তর—ভাবী সভ্যতার দিকে যাত্রা।

এ কারণেই তাই মনে রাখা দরকার ১৪শ-১৬শ শতাব্দীতে ইতালীয় বা যে-কোনো দেশের শিল্প ও সাংস্কৃতিক রিনাইসেন্স উপরতলার মানুষদের দিয়েই উজ্জীবিত ও পরিচালিত হতে পারত—সেসব দেশে তাই হয়েছিল। কিন্তু মডার্ন এজ বা আধুনিক জীবন সেভাবে উদ্ভূত হতে পারে, কিন্তু উজ্জীবিত হতে পারে না। তার চাই ব্যাপকতর বনিয়াদ। যুগ-উদ্বোধনের দায়িত্ব প্রথম দিকে থাকতে পারে উদ্যোগী মধ্যবিত্তের হাতে, অনেক সময়েই তা থাকেও, কিন্তু মডার্ন এজ-এর প্রাণশক্তি যোগায় জনসাধারণ। এই আধুনিক যুগের প্রকাশ শুধু শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে নয়; বিজ্ঞানে, বাস্তব জীবন-জিজ্ঞাসায়, নব নব বাস্তব উদ্যোগে, বিশেষ করে শিল্প-বাণিজ্যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ও জীবনযাত্রায় প্রয়োগ-বিজ্ঞানের সৌকর্যে। মডার্ন-এজ বা আধুনিক যুগ আমাদের কাছে সেই চ্যালেঞ্জ নিয়েই এসেছিল, আমাদের সমাজে তার বাহন হয়েছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত, অথবা তারও একটি অংশ, প্রধানত শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক। ১৮১৭ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত বাঙলার, তথা ভারতের ইতিহাস সেই ভদ্রলোকেরই কীর্তি-অকীর্তির ইতিহাস। জাগরণ ব্যাপক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার সৌভাগ্য পেল না। সমাজের অভ্যন্তরীণ দৈন্য ও মধ্যবিত্তের অভ্যন্তরীণ স্ববিরোধিতা প্রবল ছিল।

এই নবজাগরণের স্রোতে তা অনেক ঘূর্ণিপাক রচনা করতে বাধ্য। তা আমরা দেখতেও পাই; আর শেষ অবধি দেখতে পাই তার পদে পদে জয়-পরাজয়। জয়েও পরাজয়, আর পরাজয়েও জয়—বিশুদ্ধ জয় নয় বা বিশুদ্ধ পরাজয় নয়। তথাপি এই নবজাগরণ ভারতেতিহাসের এক অভূতপূর্ব মহোৎসব, এই কথাটিও দৃঢ় কণ্ঠেই জানাতে চাই। রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই শতাধিক বৎসরের ইতিহাসে এই বঙ্গভূমিতে যে মহৎ জীবনের উদ্বোধন হয়, সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে তেমন পরম উজ্জ্বল প্রতিভার দীপান্বিতা আর কখনো আসে নি। ১. ধর্মসংস্কারে, ২. সমাজ

সংস্কারে, ৩. শিক্ষাদীক্ষায়, ৪. নারীজাতির উন্নয়নে, ৫. লোক-সেবার আয়োজনে, ৬. সংস্কৃত-চর্চায়, ৭. প্রাচীন ভারতের পুনরাবিষ্কারে, ৮. নব-বিজ্ঞানের গবেষণায়, ৯. সাহিত্যে, ১০. নাট্যকলায়, ১১. সঙ্গীতে, ১২. নৃত্যকলায় এবং ১৩. স্বাধীনতার আন্দোলনে—এত দিকে এমন জাগরণ আর কবে দেখা গিয়েছিল ভারতবর্ষে? এমন অল্পকালের মধ্যে ভারতের মাত্র একটি জাতির (বাঙালির) মধ্যে যত মনস্বীর, যত কর্মীর, যত ভাবুকের, যত শিল্পী ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে, ভারতের ইতিহাসে তা আর ঘটে নি—অশোকের কালে নয়, গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ে নয়, মোগল রাজত্বে—আকবরের দিনেও নয়, বৈষ্ণব আন্দোলনের বাঙলায়ও নয়। মধ্যবিত্ত বাঙলার সেই জাগরণের মূল্যটি তাই বলে কম নয়—এখনো তার জের আছে। কিন্তু সে যুগের চরিত্রবিচার না করেও—সে যুগের বাঙালি জাগরণের সকল অসম্পূর্ণতা স্বীকার করেও, তার জন্য গৌরব বোধ করা চলে।

সাধারণভাবে কয়েকটা বিশেষ পর্বে এই যুগকে ভাগ করা চলে।

প্রথম পর্বটা 'প্রস্তুতির পর্ব'—মোটামুটি তা উনিশ শতকের প্রথমার্ধ। এরই মধ্যে রামমোহনের কাল (১৮১৫-১৮৩২), 'ইয়ং বেঙ্গলে'র কাল (১৮৩৩-১৮৪১) ও তত্ত্ববোধিনীর কাল (১৮৪১-১৮৫৯)।

দ্বিতীয় পর্ব: 'প্রকাশের পর্ব', মোটামুটি তা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিশ শতকের দুই দশক। এরই মধ্যে সৃষ্টির প্রথম উদ্ভাস (মধুসূদন থেকে বঙ্কিম), সৃষ্টির উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন (রবীন্দ্রনাথের উদয় থেকে স্বদেশী আন্দোলন, ১৯০৪-১৯১৪)। তারপরে 'বাঙলার জাগরণ' মিলে যেতে থাকে 'সর্বভারতীয় জাগরণে'। স্বদেশী যুগ থেকে দেশবিভাগ পর্যন্ত বাঙালি জীবনে তখন বরং সংঘাত ও সংকটের কাল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাল (১৮২০-১৮৯১) দুই পর্বের সংযোগস্থল। তাঁর কর্মজীবন মোটামুটি ১৮৪৬ (সংস্কৃত কলেজে যোগদান) থেকে প্রায় ১৮৭৫ পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৮৫০-এর শেষভাগ থেকে ১৮৬৫ পর্যন্ত তাঁর কর্মজীবনের মধ্যাহ্নকাল। তারপরে আশাভঙ্গ ও দীর্ঘ অপরাহ্ণ—১৮৭৫ থেকে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য, অস্তাচলশায়ী। উনিশ শতকের জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে এই কর্মজীবনকে সমগ্রভাবে দেখলে বুঝতে পারি—রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাঙলার তিনিই তৃতীয় যুগপুরুষ; আর সমগ্র মনুষ্যত্বের দিক থেকে বুঝি, রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখের কথার যাথার্থ্য; উপলব্ধি করা যায়—বাঙালি জাতির মধ্যে বিদ্যাসাগর অনন্য; এক নতুন আবির্ভাব; সেই হিসাবেই যেমন নিজে ভাগ্যানিপীড়িত, তেমনি আবার বাঙালি উজ্জীবনের অঙ্গীকার, পৌরুষের প্রেরণা। এ কথা তো বাঙালির ভুলবার সাধ্য নেই—বিদ্যাসাগর বাঙালিরই মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের যখন জন্ম তার পূর্বেই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রামমোহনের আন্দোলনে কলকাতার বাঙালি সমাজ চঞ্চল। তিনি যখন কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে যোগদান করছেন (১৮২৯) তখন হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর যুগ সমাগত। তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, অধ্যয়ন তাঁর তপস্যা। কিন্তু পার্শ্বস্থ হিন্দু কলেজ তখন 'ইয়ং বেঙ্গলে'র বিদ্রোহে টলটলায়মান। সমাজে ঝড় বইছে। উন্মার্গগামীদের যৌবনের বিদ্রোহে, দিগ্‌ভ্রান্ত ঔদ্ধত্যে তাঁর সহানুভূতি না থাক, যুক্তি সাহস সত্যবাদিতায় সেই ইংরেজিওয়ালা ইয়ং বেঙ্গল কিন্তু এক অনস্বীকার্য যুগসত্যের অগ্রদূত। বিদ্যাসাগরের উন্মুখ জাগ্রত চিত্তে সে যুগের এই ছায়া পড়েছিল কিনা জানবার উপায় নেই। কিন্তু সংস্কৃত কলেজে পাঠ-সমাপনান্তে আমরা দেখি এই যুগচেতনাকে গ্রহণ করবার জন্য বিদ্যাসাগর প্রস্তুত। ১৮৭০ পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে তিনিই বাঙালি সমাজে অগ্রগণ্য।

কর্মজীবনের ধারা

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন বাঙালি নবযুগের প্রস্তুতির পর্ব থেকে প্রকাশের পর্বে উত্তরণের চিত্র। সেই গতিপথের চিহ্নগুলি চক্ষুর সম্মুখে রাখা প্রয়োজন। (দ্রষ্টব্য : ঘটনাপঞ্জী ও জীবনপঞ্জী)। বিদ্যাসাগর প্রথমে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার বা সে কলেজের বাঙলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত রূপে। নিয়োগের তারিখ—২৯শে ডিসেম্বর ১৮৪১। কার্যত, ১৮৪২-এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্মজীবনের আরম্ভ। মোটামুটি ১৮৫৮-র ৩রা নবেম্বর পর্যন্ত সরকারী শিক্ষাবিভাগেই তিনি নিযুক্ত ছিলেন। অবশ্য মাঝে প্রায় এক বৎসর আট মাস কাল তাঁর চাকরি ছিল না। না হলে দু দফায় তিনি কাজ করেন একে একে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ও সংস্কৃত কলেজে :

১৮৪২-১৮৪৬ : ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রথমবার, হেড পণ্ডিত—মাইনে ৫০ টাকা।

১৮৪৬ (৬ই এপ্রিল)—১৮৪৭ (১৬ই জুলাই) : সংস্কৃত কলেজে প্রথমবার, অ্যাসিস্টেণ্ট সম্পাদক—বেতন ৫০ টাকা। শিক্ষা সংস্কারের প্রথম প্রয়াস, সেক্রেটারির সহিত বিরোধ, পদত্যাগ। কার্যকাল মাত্র এক বৎসর তিন মাস।

[১৮৪৭ (১৬ জুলাই)—১৮৪৯ : বিনা চাকরিতে, বিদ্যাসাগর 'বেকার'—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি প্রতিষ্ঠা (১৮৪৭) ও পুস্তক রচনায় নিরত।]

১৮৪৯ (১লা মার্চ)—১৮৫০ (৪ঠা ডিসেম্বর) : ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দ্বিতীয়বার ; হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ, বেতন ৮০ টাকা।

১৮৫০ (৬ই ডিসেম্বর)—১৮৫৮ (৩রা নবেম্বর) : সংস্কৃত কলেজে দ্বিতীয়বার ;

সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক, ও (১৮৫২-র ২২শে জানুয়ারি থেকে) অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপাল), বেতন ১৫০ টাকা ; সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন, শিক্ষার আদর্শের ও নীতির সংঘর্ষ—সাফল্য। ১৮৫৪-র ৬ জুন—অধ্যক্ষপদের সঙ্গে দক্ষিণ বাঙলা স্কুল ইনস্পেক্টর পদ লাভ, বেতন একত্রে ২০০ টাকা। বঙ্গ বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। চাকরি-জীবন এই কলেজের পদত্যাগে শেষ (১৮৫৮)।

এ সময়কার শিক্ষাসম্পর্কিত অন্য প্রধান কর্ম—(ক) সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন—শিক্ষাদর্শের সংঘর্ষ। (খ) পাঠ্যপুস্তক রচনা—বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) থেকে চরিতাবলী (১৮৫৬) পর্যন্ত প্রায় দশখানা পুস্তক রচনা। (গ) শিক্ষাবিস্তার—১৮৫৫ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত চারটি জেলায় ২০টি মডেল স্কুল (বঙ্গবিদ্যালয়) স্থাপন; পাঁচটি (?) নর্মাল স্কুল (শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়), পাঠশালাসমূহের পরিদর্শন ; (ঘ) স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে ১৮৫৭-র নবেম্বর—১৮৫৮-র মে, এই সাত মাসের মধ্যে প্রায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন—বিদ্যালয়গুলির জন্য তাঁর মাসে খরচ হত ৮৪৫ টাকা (মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় ১,৩০০)—সরকারী মঞ্জুরির প্রত্যাশায় এরূপ খরচের কারণেই শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিরোধ বাধে—বিদ্যাসাগরের পদত্যাগের তা অন্যতম কারণ। অবশ্য সরকার শেষ পর্যন্ত সে খরচ দেয় ; কিন্তু বিদ্যালয়গুলিকে আর মঞ্জুরি দিতে অস্বীকার করাতে, বিদ্যালয়গুলি বিলুপ্ত হয়। (ঙ) তদতিরিক্ত বীরসিংহের অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অন্যান্য বেসরকারি বিদ্যালয় স্থাপনে সহায়তা। (চ) ১৮৫০-এর ডিসেম্বর থেকে ১৮৬৮ অবধি বেথুন বিদ্যালয় কমিটির তিনি অবৈতনিক সম্পাদক।

শিক্ষাক্ষেত্রে ছাড়াও এই সময়েই বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারে প্রত্যক্ষভাবে অগ্রসর হন—১৮৫৫ থেকে ১৮৫৬, তাঁর বিধবাবিবাহবিষয়ক প্রচার ও আন্দোলনে সমস্ত দেশ আলোড়িত হয় (১৮৫৬-র ১৬ই জুলাই বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হয়)। তারপর আরম্ভ হয় কার্যক্ষেত্রে বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান—১৮৫৬, ৭ই ডিসেম্বর থেকে। বিদ্যাসাগরের তা সর্বপ্রধান কাজ হয়ে ওঠে। অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটে সিপাহী বিদ্রোহ ও সিপাহী যুদ্ধ (১৮৫৭-৫৮)। তাতে দেশের পরিস্থিতি বদলে যেতে থাকে। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইনের জন্যও (১৭ই ডিসেম্বর) আবেদন ও আন্দোলন একসঙ্গেই চলেছিল।

চাকরি ত্যাগের পরও স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের প্রধান প্রধান কর্ম ত্রিধারাতেই অগ্রসর হয়—প্রথমত, সমাজক্ষেত্রে—বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিষেধ আদি সমাজসংস্কারের চেষ্টায় ; দ্বিতীয়ত, শিক্ষাক্ষেত্র—পুস্তক রচনায়, সম্পাদনায়, প্রকাশে ; এবং বহু স্কুল কলেজ (বিশেষত বেথুন স্কুল ও পরে মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজ) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় ; কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো', পরীক্ষক, পাঠ্যনির্বাচক কমিটির সদস্য প্রভৃতি নানা কর্মে; তৃতীয়ত, সাহিত্যক্ষেত্রে—বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিষয়ক ও সমাজসংস্কারমূলক গ্রন্থ, পুস্তিকা প্রভৃতি রচনাসূত্রেই এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হন। সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত সাহিত্য হিসাবে বিদ্যাসাগর যদি কোনো গ্রন্থ রচনা করে থাকেন, তবে তা প্রধানত 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস'। তাঁর জীবৎকালে (স্বরচিত) 'বিদ্যাসাগরচরিত', 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ' প্রভৃতি মৌলিক লেখা অপ্রকাশিত ছিল।

অদ্ভুতকর্মা হলেও নিছক কর্মজীবন দিয়ে বিদ্যাসাগরের জীবনের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। তাঁর জীবনের অন্য পরিচয় তাঁর চারিত্রধর্মের শক্তিতে, তাঁর মনুষ্যধর্মে। আর সবসুদ্ধ তাঁর পরিচয় তাঁর আপন সাক্ষ্যে, আপন কর্মে,—আপন-প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজে, লেখায়। কিন্তু শিক্ষকরূপেই বিদ্যাসাগর জীবনারম্ভ করেন। আর তিনিই সম্ভবত বাঙালির প্রথম ও প্রধান শিক্ষাগুরু। সেই শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগরের পরিচয় গ্রহণ তাই আমাদেরও প্রথম কর্তব্য।

শিক্ষাগুরু : প্রস্তুতি

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিদ্যাসাগর বাঙলা পড়াতেন সিবিলিয়ান সাহেব ছাত্রদের। এ কলেজেই ১৮০০-তে উইলিয়ম কেরির অধ্যক্ষতায় ওরূপ ছাত্রদের জন্য বাঙলা গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়। বাঙলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে তা এক প্রধান স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু ১৮৪২-এ কলেজের আর সেদিন ছিল না। তথাপি শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগর সেখানে আপন প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। ক্যাপ্টেন জে. টি. মার্শাল ছিলেন কলেজের সুযোগ্য সেক্রেটারি। ২১ বৎসরের যুবক পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের গুণে তিনি মুগ্ধ হন, আর সে সূত্রে পরিচিত হয়ে সরকারী শিক্ষা পরিষদের (কাউন্সিল অব এডুকেশন) সেক্রেটারি ডক্টর এফ. জে. ময়েট (F. J. Mouat) হয়ে ওঠেন বিদ্যাসাগরের গুণগ্রাহী সুহৃদ্। বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনে এঁদের স্থান সামান্য নয়। তা ছাড়া, এই কলেজে অধ্যাপনাসূত্রে বিদ্যাসাগরের এমন কিছু ইংরেজ ছাত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটল যাঁরা পরবর্তীকালে দেশের উন্নতিকামী রাজপুরুষরূপে এদেশে খ্যাতি অর্জন করেন। এই বাঙালি পণ্ডিতের কর্তব্যনিষ্ঠায় ও চরিত্রগুণে এই সিবিলিয়ানরাও তেমনি কেউ কেউ চিরদিনের মতো হন বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধাশীল সুহৃদ্। যেমন, ফ্রেডরিক হ্যালিডে, সীটন কার, সিসিল বীডন প্রভৃতি। অন্যদিকে, তাঁদের সাহচর্যে ও আচরণে বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ও ইংরেজ চরিত্রের এমন কতকগুলি স্থির সম্পদের পরিচয় পান যাতে, সাম্রাজ্যবাদী শাসক-ধর্ম যে মূলত পরাধীন সমাজের পরম অকল্যাণের হেতু, এ বোধও স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগরের

চেতনায় উগ্র হয়ে উঠতে পারে নি। বরং বুর্জোয়া শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার মূল সত্য এ সময়েই তাঁর ধারণায় সুস্থির হয়ে ওঠে। সময়টা তাঁর কর্মজীবনের প্রারম্ভকাল— এ সময়কার অভিজ্ঞতা তাই তাঁর জীবনদৃষ্টি ও শিক্ষাচিন্তাকে প্রভাবিত করে থাকবে, এ অনুমান অসংগত নয়।

এই প্রস্তুতিকালে বিদ্যাসাগর মার্শাল সাহেবের পরামর্শে যথারীতি ইংরেজি ও হিন্দী শিখতে যত্নপর হন, আর বৎসর তিন-চারের মধ্যে ইংরেজি ভাষায় অধিকারও অর্জন করেন—তার প্রমাণ যথেষ্ট। এই ইংরেজি পড়ায় বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করতেন ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ('স্বদেশী' নায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা), নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি ; অন্যদিকে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে সংস্কৃত শিখতে আসতেন প্যারীচরণ সরকার, শ্যামাচরণ সরকার ও (পরবর্তী সময়ে) রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই সময়েই বিদ্যাসাগর আবার অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গেও পরিচিত হন আর 'তত্ত্ববোধিনী সভা'য় যোগদান করেন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদকীয় পরিচালকদেরও (পেপার কমিটির) সদস্য হন (১৮৪৩)। 'তত্ত্ববোধিনী'র আসরে ও পত্রিকায় বাঙলার নবজাগরণের পাদপীঠ রচিত হচ্ছিল (১৮৪৩-এর সময় থেকে)—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার প্রেরণাস্থল, সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যুক্তিনিষ্ঠ বাস্তব জ্ঞান ও সামাজিক চিন্তার উৎস। বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের আলোচনা তার পৃষ্ঠাতে চলে। এই পরিবেশও বিদ্যাসাগরের বিকাশের পক্ষে অনুকূল ছিল।

চাকরির এই প্রথম পর্বেই মার্শাল সাহেবের কথায় বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রদের জন্য পাঠ্যগ্রন্থ রচনায়ও হস্তার্পণ করেন—তা এক মহামূল্য সূচনা। সম্ভবত দুষ্প্রাপ্য 'বাসুদেব চরিত' তাঁর প্রথম রচনা। না হলে প্রথম রচনা 'বেতালপঞ্চবিংশতি'। হিন্দী 'বৈতালপচ্চীসী' অবলম্বনে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' রচিত। বিদ্যাসাগর অনুভব করে থাকবেন—পঠন-পাঠনের মতোই পাঠ্যপুস্তক রচনাও শিক্ষার প্রধান এক কাজ। শিক্ষাদর্শ, শিক্ষানীতি, শিক্ষাবিস্তারের জন্য পুস্তক প্রণয়ন, পুস্তক প্রকাশন-ব্যবস্থা— সমগ্রভাবে, বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শ ও শিক্ষাভাবনা এ সময়েরও মধ্যে এভাবে তাঁর মনে দানা বেঁধে ওঠে।

শিক্ষাচিন্তা : প্রথম আভাস

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছেড়ে ১৮৪৬-এর ৬ই এপ্রিল বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন। তাঁর নিজের কলেজ সংস্কৃত কলেজ, তাঁর শিক্ষা-ভাবনাকে কাজে লাগাবেন, এই আশা। সংস্কৃত কলেজের আমূল সংস্কারের উদ্দেশে তাই তিনি

শীঘ্রই তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেন (১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৪৬)।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার দিক থেকে এটি প্রথম প্রামাণিক পত্র। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাধারার আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব তাতে উত্থাপিত হয়েছে : সংস্কৃত পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তন—ব্যাকরণের পাঠ সহজতর ও স্বল্পকালীন করা ; ব্যাকরণের পাঠ্যপুস্তক ও পাঠপ্রণালীর সেরূপ পরিবর্তন ; 'ন্যায়ে'র পাঠ 'স্মৃতিপাঠে'র আগে না রেখে পরে আনার ব্যবস্থা করা ; সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বিজ্ঞান, কাব্য ও সংস্কৃত রচনার প্রথা রক্ষা করে সংস্কৃত-বাঙলা অনুবাদ বাতিল করা ; ইংরেজি বিভাগের পাঠ্যতালিকার আমূল পরিবর্তনসাধন—এ পরিকল্পনায় এরূপ নানা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার দিক থেকে তা খুবই গুরুতর এবং যুক্তিযুক্ত। কিন্তু কেন ? এসব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য কী ? আধুনিক যুগে সেই প্রশ্ন এ আলোচনায় সর্বাপেক্ষা গুরুতর মনে হয়। প্রস্তাবের শেষে বিদ্যাসাগর তা নির্দেশ করেছেন :

I have carefully studied the working of the system, and the suggestions made are brought forward with the view of facilitating the acquirement of the largest store of sound Sanskrit and English learning combined, under the impression that such training is likely to produce men who will be highly useful in the work of imbuing our vernacular dialects with the science and civilization of the western world. (বিনয় ঘোষের উদ্ধৃতি থেকে পুনরুদ্ধৃত)।

এ কথার সারমর্ম : সংস্কৃতের জ্ঞানভাণ্ডার ও ইংরেজির জ্ঞানভাণ্ডারের সম্মিলিত সম্পদে ঐ কলেজের ছাত্রদের সমৃদ্ধ করতে হবে যাতে তাঁরা বিশেষভাবে ভারতীয় ভাষাগুলিকে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার দানে পরিপুষ্ট করে তুলতে পারেন। বিদ্যাসাগরের মূল শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষানীতি ১৮৪৬ সালের এ পরিকল্পনাতে আভাসিত হয়েছিল। পুনরুক্তি হলেও বলি, সে আদর্শ—পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার দান সযত্নে আহরণ ; সে শিক্ষানীতি—মাতৃভাষায় সেই দান পরিবেশন ; এবং তার প্রধান উপায়—সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষার মিলিত সম্পদে ছাত্রদের শক্তি সম্পুষ্ট করা।

এ শুধু কি একটা শিক্ষাদর্শ ? এই কথার মধ্যে কি বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শও নিহিত নেই ? আধুনিক যুগের বিজ্ঞান ও আধুনিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদে ভারতীয় সমাজকে উজ্জীবিত করাই বিদ্যাসাগরের সেই আদর্শ।

আশ্চর্য নয় যে, বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-পরিকল্পনায় বাধা জুটবে। বরং আশ্চর্য

এই যে, বিদ্যাসাগরের কর্মনীতির সমর্থকও ছিল—আর তাঁরা ময়েট, মার্শাল, হ্যালিডের মতো ইংরেজ শিক্ষাবিদ্ শুধু নন, অনেকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পন্ডিত। প্রধান বাধা হয়েছিলেন সেক্রেটারি রসময় দত্ত—আর তাঁর বাধা নীতিগত বলা যায় না, অনেকাংশে ব্যক্তিগত, সহকারীর প্রতি অসূয়া-অনুদারতাই তার মূল।

রসময় দত্ত ছিলেন জজ ; সংস্কৃত কলেজে সেক্রেটারির কাজ তাঁর ঠিকে কাজ ; আয়ের দিক থেকে গৌণ জিনিস। মামুলিভাবে সপ্তাহে দু-একবার কলেজে এসেই তা সম্পন্ন হত। কিন্তু বিদ্যাসাগর কাজে যোগদান করেই এমন উদ্যোগ, পরিশ্রম ও কর্মনিষ্ঠা নিয়ে কলেজের কাজ আরম্ভ করলেন যাতে বোঝা গেল তিনিই হয়ে উঠছেন কলেজের প্রাণ। কর্মে অনিচ্ছুক উপরস্থ কর্তার এ অবস্থায় অস্বস্তি ও আশঙ্কাবোধ স্বাভাবিক। মতদ্বৈধটা অবিলম্বেই প্রকট হল। তা বৃদ্ধি পেতেই ঈশ্বরচন্দ্র পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন ডঃ ময়েটের কাছে। পন্ডিতেরা তা জেনে তের জনে মিলে আবেদন করলেন—ঈশ্বরচন্দ্রকে কলেজের ছাড়া ঠিক হবে না। রসময় দত্ত ঈশ্বরচন্দ্রকে জানাতে বললেন—তাঁর পদত্যাগের কারণ কী? বিদ্যাসাগর তাঁকে যে সুদীর্ঘ উত্তর (৩রা মে, ১৮৪৭) দিলেন তাতে পরিষ্কারই বোঝা যায়—সেক্রেটারি বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনাকে চেয়েছিলেন প্রথম ধামাচাপা দিতে, পরে খন্ডিত ও বিকৃত আকারে তা কর্তৃপক্ষের গোচর করতে। আর, কলেজ পরিচালনায় বিদ্যাসাগরের উপর রসময় দত্ত একদিকে দুর্বহ কাজের ভার চাপিয়ে দেন, অন্যদিকে নানা তুচ্ছ সত্য-মিথ্যা ওজর তুলে চেষ্টা করেন বিদ্যাসাগরকে পযুর্দস্ত করতে। বিদ্যাসাগরের পত্রে বিদ্যাসাগরের তথ্যানুগত্যের সঙ্গে দেখা যায় সেই ব্যক্তি-চরিত্রেরও সুস্পষ্ট আভাস—অন্যায়ের প্রতি তীব্র বিরাগ, স্পষ্টবাদিতা, স্বমতে দৃঢ়তা, এমন কি, বিদ্যাসাগরের জেদ ও আত্মাভিমান।

সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের প্রথম কাজের এই কার্যকাল ১৫ মাস ; শোনা যায় সংস্কৃত কলেজ থেকে এই পদত্যাগ করবার সময়েই হিতৈষীরা কেউ কেউ রসময় দত্তের প্রশ্ন তাঁকে জানান, 'বিদ্যাসাগর খাবে কী?' তখন কলকাতায় গোটা বিশেক আত্মীয় ও শিক্ষার্থী বিদ্যাসাগরের পোষ্য ; তিনি পরিবারের প্রধান নির্ভর, অবশ্য ভ্রাতাও চাকরি করতেন। বিদ্যাসাগর উত্তর দিয়েছিলেন, 'রসময় দত্তকে বলো বাজারে আলুপটল বেচব, তবু মত বিকিয়ে চাকরি করব না।'

বিদ্যাসাগর তাই এ সময়ে সে হিসাবে বেকার থাকেন—প্রায় ১ বৎসর ৮ মাস কাল। তবে নিষ্ক্রিয় বসে থাকবার মানুষ তিনি নন। 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (দ্বিতীয় ভাগ) রচিত হতে থাকে। 'জীবনচরিত' রচনাও অগ্রসর হয়। অন্যদিকে, স্বাধীন ব্যবসায়ের উদ্যোগও দেখেন—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরিও

(১৮৪৭) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে অবশ্য (১৮৪৮-৪৯ ইং) বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে একযোগে স্থাপন করেন ছাপাখানা 'সংস্কৃত যন্ত্র'। বেশ বোঝা যায়—তাঁর শিক্ষার আদর্শ কার্যকর করার জন্য তিনি নিজেই কার্যে অগ্রসর হয়েছেন—অন্যের ভরসায় বসে নেই। শিক্ষাবিস্তারের জন্য ধাপের পর ধাপ কিরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পুস্তক রচিত করা চাই, তাও স্থির বুঝেছেন ; অন্যের ভরসায় না থেকে তা প্রকাশার্থে অগ্রসর হয়েছেন ; সেখানেও না থেমে নিজের পুস্তকভাণ্ডার বা বইয়ের দোকানও স্থাপন করেছেন—এবং মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করার প্রয়োজনও বোধ করেছেন। দূরদৃষ্টি এবং বাস্তববুদ্ধি দিয়ে বুঝেছেন—এই হবে তাঁর জীবিকারও উপায় : সমাজকর্মে, কর্মজীবনে, এমনকি, চাকরিতেও তাঁর মতো স্বাধীনচেতা মানুষের স্বাধীন মতামত নিয়ে বিচরণ করবার সুযোগ এভাবেই আয়ত্ত হবে। বিদ্যাসাগরের এসব প্রয়াস আদর্শানুযায়ী জীবন-প্রস্তুতির প্রয়াস। অন্যদিকে এসব প্রয়াস স্পষ্ট বোঝায়—বিদ্যাসাগর বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন প্র্যাকটিকাল মানুষ।

সংস্কৃত কলেজে : শিক্ষাদর্শ শিক্ষানীতি

সেই সংস্কৃত কলেজে তিনি দ্বিতীয়বার পদার্পণ করলেন (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৫০) কলেজ পরিচালনার কর্তৃত্ব নিয়ে। রসময় দত্তও অবিলম্বে বিদায় নেন। জেদ চরিতার্থ করা অবশ্য বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি চাইছিলেন তাঁর নিজের কলেজকে নিজ নীতিতে গঠনের অধিকার। সংস্কৃত কলেজকে তিনি শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্র করে তুলবেন ; আর, সেই সূত্রে নিজের শিক্ষাদর্শ, শিক্ষানীতি ও শিক্ষা-পদ্ধতি প্রভৃতি নিজের উদ্যোগে, কর্মশক্তিতে, বাস্তব কর্মকুশলতায় রূপায়িত করবেন। তাঁর এখন কাজ হল কলেজের পাঠ্যবিষয়, পাঠক্রম, পাঠপ্রণালী সব ঢেলে সাজা। এদিকে তাঁর শিক্ষাদৃষ্টির প্রথম স্পষ্ট পরিচয় বহন করছে ১৮৫২-তে ১২ই এপ্রিল তারিখের Notes on the Sanskrit College (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। হাতে লেখা এ খসড়া কলেজের নথিপত্রের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়, প্রকাশিতও হয়েছে। এখন তা সুবিদিত। ২৬টি ছোটবড় অনুচ্ছেদে (প্যারায়) এই নোট্‌স্‌ বা খসড়া রচিত। কালানুক্রমিকভাবে এটি বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার দ্বিতীয় প্রধান দলিল, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার রূপ এতে পরিস্ফুট। প্রথম ৫টি প্যারা অবিস্মরণীয়—মূল উদ্দেশ্য তাতে পরিষ্কার (আমরা তা পরিশিষ্টে মুদ্রিত করেছি)। বাকি ২১ প্যারা সংস্কৃত কলেজের সংস্কার-বিষয়ক ভাবনা ও তার উন্নতির পরিকল্পনা। তার ৬ থেকে ১৭ প্যারা পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে ; ১৮ থেকে ২০ পাঠপদ্ধতি সম্পর্কে ; পরের ৫টি (২১-২৫) কলেজের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে। সে সবের কিছু

কিছুও বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার বৈশিষ্ট্যসূচক। তার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাচ্ছে। বিদ্যাসাগর গোড়াপত্তন করেছেন তাঁর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও নীতি জানিয়ে :

১। সুসমৃদ্ধ বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি :—যাঁরা এদেশে শিক্ষা তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন এ হওয়া উচিত তাঁদের প্রথম লক্ষ্য।

২। যাঁরা ইউরোপীয় জ্ঞানসম্ভার থেকে জ্ঞানবিজ্ঞানের উপকরণ সংগ্রহ করতে সক্ষম নন, এবং পরিচ্ছন্ন, ভাববহ ও রীতি-শুদ্ধ বাঙলা ভাষায় তা প্রকাশ করতে অক্ষম, তাঁরা এরূপ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।

৩। যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত নন তাঁরা পরিচ্ছন্ন, ভাববহ, রীতি-শুদ্ধ বাঙলা ভাষা লিখতে পারেন না। তাই, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদেরও ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে সুশিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

৪। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, যাঁরা কেবল ইংরেজিতে বিদ্বান্ তাঁরা প্রাঞ্জল পরিচ্ছন্ন বাঙলা ভাষায় নিজেদের ভাব প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁরা এত বেশি ইংরেজিভাবাপন্ন যে, তাঁরা যদি পরে কিছুটা সংস্কৃত পাঠও নেন, তা হলেও মনে হয় তাঁদের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় প্রাঞ্জল ও পরিচ্ছন্ন বাঙলা লেখা প্রায় অসম্ভব।

৫। অতএব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা যদি ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত হয়, তাহলে একমাত্র তারাই সুসমৃদ্ধ বাঙলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।

এখন প্রশ্ন তাহলে এই—সংস্কৃত কলেজে কী ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। বিদ্যাসাগর জানালেন—(৭) ব্যাকরণ ও সাহিত্য দুই-ই ছাত্রদের ভালোভাবে শিক্ষণীয়, (৮) অলংকারশাস্ত্রে 'কাব্যপ্রকাশ' ও 'সাহিত্যদর্পণে'র দু-একটি অধ্যায় পড়াই যথেষ্ট। (৯) ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলংকারশাস্ত্র দিয়ে তাঁদের সংস্কৃত বিদ্যার ভিৎ দৃঢ় করা চাই। (১০) স্মৃতিশাস্ত্রের কয়েকটি বিশেষ নির্বাচিত গ্রন্থ ও অংশ পড়াই যথেষ্ট। (১১-১৩) গণিতশাস্ত্রের লীলাবতী ও বীজগণিত মোটেই যথেষ্ট নয়, সময়ই শুধু নষ্ট হয়। তা না পড়ে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার অনুরূপ গণিত পাঠপ্রবর্তন প্রয়োজন। (১৪-১৮) সংস্কৃত ষড়্দর্শনের মধ্যে তর্কবিদ্যা, রসায়নতত্ত্ব, ধর্মাচরণবিধি, ভগবৎ-চিন্তা প্রভৃতি যা আছে তা কলেজের শিক্ষায় কতটা প্রয়োজনীয়, সে আলোচনা আগেই করা হয়েছে (১৮৫০-এর ১৬ই ডিসেম্বরের রিপোর্ট)। বিদ্যাসাগর তাই দর্শন-পাঠ সম্বন্ধে এই খস্ড়ায় যা লিখলেন তার সার এই :

'১৬। এ কথা ঠিক যে, হিন্দু দর্শনের অনেক মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না। তা হলেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের

এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত।…(তবে পাশ্চাত্ত্য দর্শনও পড়া চাই।) ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দুই দর্শনেই সম্যক জ্ঞান থাকলে আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝা সহজ হবে !…আমার ধারণা, সর্বমতের দর্শন পাঠ করবার সুযোগ দিলে ছাত্রদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত গড়ে উঠবে। ভালো করে ইংরাজি শিক্ষার জন্য কলেজে শিক্ষার সময়ও যথেষ্টরূপে নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।'

উপরের উদ্ধৃত অংশ (১-৫ অনুচ্ছেদ) একটি সুস্থির ও গভীর শিক্ষাচিন্তার পরিচায়ক। সে উদ্দেশ্যে তিনি জানালেন শিক্ষণীয় বিষয় কী, কোথায় তা পাওয়া যাবে, কোন্ ভাষায় তা পরিবেশিত হবে, সে ভাষা আয়ত্ত করার জন্য চাই কী উপায়। প্রথমেই লক্ষণীয়, কী লক্ষ্য : সুসমৃদ্ধ বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি—পরিচ্ছন্ন সহজবোধ্য সুন্দর ভাষায়। বিদ্যাসাগর যা প্রস্তাব করেছেন, তাতে কোথাও বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নেই। বিদ্যাসাগরের এই অন্তর্দৃষ্টি আভাসিত হয়েছে পত্রের দর্শনবিষয়ক বিশ্লেষণে, মন্তব্যে ও তাঁর সম্যক জীবনদৃষ্টিতে। যথা, বাস্তবের সঙ্গে যার বিরোধ তেমন দর্শনের সার্থকতা নেই। তবে হিন্দু দর্শন সংস্কৃত বিদ্যায় একেবারে বর্জনীয় হতে পারে না। অন্যান্য দর্শনের সঙ্গে তা পাঠ্য হলে শিক্ষার্থীর বিচারবুদ্ধি দিগ্‌ভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা কমবে, বিচারবুদ্ধি বাস্তব জীবনের নিরিখেই বিচার করতে শিখবে।

পুনর্গঠনের সংগ্রাম

এরূপ পরিকল্পনায়, সংস্কৃত কলেজে নিয়োগের পর থেকেই (১৮৫১, ২২শে জানুয়ারি) বিদ্যাসাগর হাত দিয়েছিলেন পুনর্গঠনে। সম্পূর্ণ ক্ষমতা পেয়েই তিনি কলেজে দ্বিতীয় বার যোগদানে স্বীকৃত হন। দেখা গেল, তখন পরিচালনায় অদ্ভুত তাঁর উদ্যোগ, পরিশ্রম ও কর্মকুশলতা, শাসনশৃঙ্খলা প্রবর্তনে তাঁর অদ্ভুত শক্তি। অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিয়মিত উপস্থিতি, ক্লাসে শৃঙ্খলা, ছুটির সঠিক নিয়ম প্রবর্তন, শুধু ব্রাহ্মণ-বৈদ্য নয়, উচ্চবর্গের সমস্ত হিন্দু শিক্ষার্থীর কলেজে প্রবেশাধিকার—এসব তিনি এখন প্রবর্তিত করলেন। অন্যদিকে, হিন্দু কলেজ ও মাদ্রাসায় পাস করা ছেলেদের মতো সংস্কৃত কলেজের যোগ্য ছাত্রদেরও জন্য তিনি ডেপুটিগিরিতে প্রবেশের সুযোগ প্রথম আদায় করলেন—জীবিকার সেইরূপ সুযোগে বাধা না থাকায়, বুদ্ধিমান ছাত্রদের নিকট সংস্কৃত কলেজ আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। অন্য দিকে, সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা এতদিন অবৈতনিক ছিল, ছাত্রদের তাই কলেজে যাতায়াতে, পড়াশুনায় দায়িত্ববোধ দেখা যেত না। বিদ্যাসাগর সে স্থলে (১৮৫৪ জুন) মাসিক এক টাকা করে ছাত্রবেতনের ব্যবস্থা করলেন। এ সব পরিচালনার ব্যাপার। আসল বিষয়—শিক্ষার উন্নয়ন, বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। ব্যাকরণ,

সাহিত্য প্রভৃতি পাঠ্যবিষয় ও পাঠ্যবস্তুর যে যে পরিবর্তন তিনি প্রয়োজন মনে করেছিলেন, তা চালু করলেন (১৮৫১, নবেম্বর)। 'উপক্রমণিকা' (১৮৫১ ইং), পরে 'ব্যাকরণকৌমুদী' (১৮৫৩-৫৪) এবং 'ঋজুপাঠ' (১৮৫১) রচনা ও প্রকাশ করে সংস্কৃত ভাষার পথ তিনি সুগম করলেন ; সংস্কৃত বিদ্যাকে ফলপ্রদ করল তাঁর শিক্ষাপ্রণালী। অন্যদিকে, কলেজে ইংরেজি বিভাগকেও করে তুললেন বিস্তৃত ও সুনিয়ন্ত্রিত—লীলাবতী বীজগণিতের স্থলে পাঠ্য হল পাশ্চাত্ত্য গণিতবিদ্যা। সংস্কৃত কলেজ এভাবে ১৮৫১ থেকে ১৮৫৩-র মধ্যে যেন নবকলেবর ও নতুন প্রাণ লাভ করল।

এই আমূল দ্রুত পরিবর্তনে যে কারও কারও আপত্তি হবে, তা বোঝা যায়। কিন্তু আপত্তিটা এল বাঁকা পথে, আর সংস্কৃতজ্ঞ ইউরোপীয় পন্ডিতের কাছ থেকে। তাতে যে তর্ক উঠল তার আখ্যা দেওয়া যেতে পারে—'বিদ্যাসাগর-ব্যালেন্টাইন' সংবাদ। আজ সে তর্কের মূল্য যৎসামান্য—তবে, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদৃষ্টি ও চরিত্রশক্তির দিক থেকে তার মূল্য কম নয়। সেই তর্কের মূলটা তাই আমাদের পক্ষে লক্ষণীয় (দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট)।

জেমস আর. ব্যালেন্টাইন বারাণসী সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, সংস্কৃতে বিদ্বান্। সেই সংস্কৃত কলেজ পরিচালনাও বেশিদিন ধরে করেছেন। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে যে পরিবর্তন এক বৎসরের মধ্যেই প্রত্যক্ষ হল তাতে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট ছিলেন ; কিছু দ্বিধাও বোধ হয় ছিল। তাই শিক্ষা পরিষদ ব্যালেন্টাইনকে আহ্বান করলেন—বিদ্যাসাগরের পরিচালিত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে তাঁর রিপোর্ট পেশ করতে। ব্যালেন্টাইন কলিকাতায় এসে কলেজ পরিদর্শন করে (১৮৫৩, জুলাই-আগস্ট) দীর্ঘ রিপোর্ট দেন। তাতে বিদ্যাসাগরের সুখ্যাতি না ছিল তা নয়, কিন্তু তিনি বিদ্যাসাগরের ব্যবস্থা ও পদ্ধতিতে ত্রুটিও দেখলেন। প্রস্তাব করলেন, কিছু নতুন পাঠ্য বই পড়িয়ে সে ত্রুটিকে শুধরে নেওয়া হোক। তাঁর মতে, ত্রুটি প্রধানত এই যে, সংস্কৃত জ্ঞানে সত্যের একটা ধারা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক ; ইংরেজি জ্ঞানে দেখা যাওয়া উচিত সত্যের পৃথক এক ধারা। ছাত্রেরা ভাবে, সত্য দ্বিমূর্তি ('Truth is double')। ব্যালেন্টাইন প্রস্তাব করলেন, তাঁর নিজের রচিত মিল-এর লজিক-এর (J. S. Mill, Logic) সংক্ষিপ্তসার, ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শবাদী দার্শনিক বিশপ বার্কলের 'তত্ত্বান্বেষণ' (Berkeley, Inquiry) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পড়ানো হোক। বার্কলের ভাববাদ অনেকটা ভারতীয় ভাববাদের মতো—দুয়ের মিল দেখবে ছাত্রেরা। তাতে দু-দেশের দর্শনের প্রতিই শ্রদ্ধাবান হবে—এই ছিল ব্যালেন্টাইনের যুক্তি।

শিক্ষা পরিষদ ব্যালেন্টাইনের রিপোর্ট যথারীতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর ব্যালেন্টাইনের সমালোচনা সমুচিত মনে করলেন না, তাঁর প্রস্তাবিত পাঠ্যগ্রন্থও প্রবর্তিত করার প্রয়োজন দেখলেন না। সুদীর্ঘ যে উত্তর (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩ ইং) তিনি লিখলেন তার প্রয়োজনীয় সার-সংক্ষেপই এখানে যথেষ্ট। নিজের শিক্ষাদর্শের ও শিক্ষানীতির পিছনে বিদ্যাসাগরের বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতা ছিল, মতের কতকটা উগ্রতা সত্ত্বেও, তা বোঝা যায়। যথা, প্রথম কথা :

> কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য ও বেদান্ত না পড়িয়ে উপায় নেই।...বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নেই।... সংস্কৃতে যখন এগুলি শেখাতে হবে, এদের প্রভাব কাটিয়ে তুলতে প্রতিষেধকরূপে ইংরেজিতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ানো দরকার।

বিদ্যাসাগরের মতে, বার্কলের Inquiry সে ধরনের যথার্থ পাশ্চাত্ত্য দর্শন নয়—ইউরোপেও এখন আর তা (বার্কলে) খাঁটি দর্শন বলে বিবেচিত হয় না। কাজেই, এতে কোনক্রমেই সে কাজ (প্রতিষেধকের কাজ) চলবে না। বার্কলের দর্শনে বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনের প্রতি ভারতীয় ছাত্রদের শ্রদ্ধা কমা দূরে থাক বরং আরও বেড়ে যাবে।

দ্বিতীয় কথা : 'সত্য দ্বিবিধ'—ছাত্রদের মনে এ ভ্রান্ত ধারণা জন্মাবে, ব্যালেন্টাইনের এ ভয়ও অমূলক। বিদ্যাসাগর তর্ক তুললেন—

সংস্কৃত ও ইংরেজি দু-ভাষার বিজ্ঞান ও সাহিত্য পড়ে যে যথার্থরূপে ধারণা করেছে, তার কাছে সত্য—সত্যই। সত্য দু-রকম—এ ভাব অসম্পূর্ণ ধারণার ফল। 'সংস্কৃত কলেজে আমরা যে শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করেছি, তাতে এরূপ ফলের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই দূর হবে।'

বিদ্যাসাগর খলিফা ওমরের আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা পোড়াবার কুযুক্তির (প্রচলিত) কাহিনীর উল্লেখ করে পরিহাস করে লিখেছেন—ভারতীয় পণ্ডিতদের গোঁড়ামি ঐ আরব খলিফাদের গোঁড়ামির চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।...ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদের নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণ করবার কোনো সম্ভাবনা আছে, এমন আমার বোধ হয় না।—শেষে বাঙলার তৎকালীন অবস্থা উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর যা লিখেছেন তাতে বিদ্যাসাগরের সমগ্র প্রয়াসেরই রূপাভাস আমরা পাই, সঙ্গে সঙ্গে বুঝি, বিদ্যাসাগর নূতন দিগন্তের যাত্রী। তিনি লিখছেন :

> বাঙলাদেশে যেখানে শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে সেখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব কমে আসছে। দেখা যাচ্ছে, বাঙলার অধিবাসীরা শিক্ষালাভের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র !...

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার—এই এখন আমাদের প্রধান প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলি বাঙলা স্কুল স্থাপন করতে হবে, এইসব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে, শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করতে পারে এমন একদল কর্মী সৃষ্টি করতে হবে—তা হলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল থেকে মুক্তি—শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই। এই ধরনের দরকারী লোক গড়ে তোলাই আমার উদ্দেশ্য—আমার সংকল্প। এর জন্য আমাদের সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হবে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা কলেজের পাঠ শেষ করে এই ধরনের লোক হয়ে উঠবে—এমন আশা করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এই প্যারায় যে ইঙ্গিত—জনশিক্ষা বিস্তার ও তার প্রস্তুতি, আমরা তা পর প্রসঙ্গে দেখব। কিন্তু যা উপলক্ষ করে এসব কথা—ব্যালেন্টাইনের সেসব প্রস্তাব শিক্ষা পরিষদ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে চালু করবার নির্দেশ দিলেন। তার ফলে, বিদ্যাসাগর ময়েট সাহেবকে আধা-সরকারী চিঠিতে জানান—তাঁর সমস্ত অভিলাষ ও উদ্দেশ্যই যখন এভাবে ব্যর্থ হতে চলেছে, তখন তাঁকেও বলতে হবে—'আমার কাজ ফুরিয়েছে।' আমরা জানি—কর্তৃপক্ষ এবার নতিস্বীকার করলেন। বিদ্যাসাগর নিজের ব্যবস্থিত শিক্ষাপ্রণালী অনুসরণ করবার স্বাধীনতা পেলেন। তার ফলে, কলেজের সর্ব দিকেই সাফল্য দেখা দিল।

শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস

সংস্কৃত কলেজের সীমানা ছাড়িয়ে শিক্ষার বৃহত্তর ক্ষেত্রের দিকে এ সময়ে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি গিয়েছে। বেথুন সাহেব প্রথমাবধিই চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের মতো নারী-সমাজের সুহৃদ্‌কে তাঁর নারী বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে। ১৮৫৬-র ডিসেম্বরে তিনি সে স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদক হন। বেথুন স্কুলকে তিনি লালন করেছেন, পালন করেছেন—তাঁর উৎসাহে, সে পরিশ্রমে, সে কর্মকুশলতায় বেথুন স্কুলের শৈশব ও বাল্য গড়ে ওঠে। এদিকে, ছোটলাট স্যর ফ্রেডারিক হ্যালিডের পূর্বাপর আগ্রহ ছিল বাঙলা শিক্ষা প্রচলনের—বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি তাঁর (১৮৫৪-র ১৬ই নবেম্বরের) মন্তব্য রচনা করেন। বিদ্যাসাগরের ১৮৫৪-র ৭ই ফেব্রুয়ারির ১৯ অনুচ্ছেদের মন্তব্য হ্যালিডের প্রস্তাবের ভিত্তিস্থানীয়। সংগঠন ও পাঠ্য বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট প্রস্তাব ছাড়াও অন্তত ১ ও ২ ধারার মূল কথাগুলি এখানে তাই উল্লেখ না করলেই নয়।

১। সুবিস্তৃত ও সুব্যবস্থিত বাঙলা শিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়; কেননা মাত্র তার সাহায্যেই জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব।

২। লেখাপড়া, আর কিছু অঙ্ক শেখাতেই এ শিক্ষা পর্যবসিত হলে চলবে না। শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্ব শেখানো প্রয়োজন।

এই লক্ষ্য ও মূলনীতি অনুযায়ীই প্রস্তাবিত হয় বাঙলা স্কুল সংগঠনের নীতি নিয়ম। হ্যালিডে বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কারও হাতে তাঁর এই বাঙলা স্কুলের সংগঠন ও পরিদর্শনের ভার দেবেন না। বিদ্যাসাগরের উপর তাঁর বিশেষ আস্থা। সরকারী কানুন সরিয়ে রেখে তিনি বিদ্যাসাগরকেই এ উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে অতিরিক্ত নিযুক্ত করলেন অ্যাসিস্টেন্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুলস। হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরকে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়ও (১৮৫৭) উৎসাহ দেন। বিদ্যাসাগর জীবনে করবার মতো এবার কাজ পেলেন—একদিকে বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন ও জনশিক্ষার আয়োজন, অন্যদিকে বালিকা বিদ্যালয়ের আয়োজন ও নারীসমাজের উন্নতির ভিত্তি স্থাপন। কিন্তু, দুই-ই স্বপ্ন। হ্যালিডে সাহেবের সহানুভূতি সত্ত্বেও বালিকা বিদ্যালয়গুলি উঠে গেল প্রধানত সরকার ও আমলাতন্ত্রের বিমুখতায়। বাঙলা ভাষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের প্রয়াসও প্রায় ব্যর্থ হয়ে যায় দু কারণে—হ্যালিডের পরে (১৮৬২) কোনো রাজপুরুষই সে কাজে বিশেষ উৎসাহিত বোধ করেননি। বরং নতুন শিক্ষা-তত্ত্বাবধায়কগণ আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিতেই শিক্ষাচালনা চাইতেন, শিক্ষার প্রসার নয়। অন্যদিকে, শুধু বাঙলা শিখে চাকরির বাজারে কারও যখন বিশেষ সুবিধা হয় না তখন বাঙালি ভদ্রলোকেরাও—গ্রামে ও শহরে—বাঙলা স্কুলের উপর বিমুখই হতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য—জাতীয় জীবনকে আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায়, আধুনিক সভ্যতায় সমুন্নত করে তোলা। বাঙালি ভদ্রলোকের লক্ষ্য—ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত পদ, মান ও সুযোগ-সুবিধার জন্য ইংরেজি শিক্ষা। ভদ্রলোকশ্রেণী ছাড়িয়ে নিম্নতর শ্রেণীতে যথার্থ শিক্ষা ছড়িয়ে পড়লে, ভদ্রশ্রেণীর সে চাকরির ভাগীদার অনেক জুটে যাবে।—বাঙলায় শিক্ষা না হলেও ভদ্রলোকের আপত্তি নেই, জনশিক্ষা বাড়লেই বরং ভদ্রলোকের বিপদ বাড়তে পারে। এভাবেই জনশিক্ষার প্রয়াসও বাঙলা স্কুলের সঙ্গে খর্বিত ও প্রায় অচল হয়ে যায়। বিদ্যাসাগরের দুই প্রধান চেষ্টা নিষ্ফল হয়।

এই জনশিক্ষার প্রশ্নটা আবার ওঠে ১৮৫৯-এ। অল্প খরচে কিরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, তা জানার জন্য সরকার থেকে বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চাওয়া হয়।

বিদ্যাসাগর জানান (২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯)—উচ্চশিক্ষা বাদ দিয়ে জনসাধারণের শিক্ষার চেষ্টা উচিত নয়। কোনো দেশেই গণশিক্ষা সম্ভব হয়নি, এদেশে তা অসম্ভব। প্রশ্ন হবে, তাহলে বিদ্যাসাগরের পূর্বোদ্ধৃত (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯) পত্রের 'জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার' কথার অর্থ কী ? তিনি কি জনশিক্ষা চাননি ?

বিশদ আলোচনা না করেও সংক্ষেপে কথাটা বলা যায়—বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের মানুষ। উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোকের শ্রেণীগত দোষগুণের দ্বারা বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি কোথায় কতটা খর্বিত, সে কথা অবান্তর নয়। কিন্তু এই বিশেষ প্রসঙ্গে তা গৌণ। তিনি নিজে যা উল্লেখ করেছেন তা মোটামুটি যথেষ্ট—উনিশ শতকের ১৮৫৯-৬০ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোথাও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়নি—ইংলন্ডেও না, যে ইংলন্ড ধনে মানে তখন বুর্জোয়া সভ্যতার শীর্ষস্থানীয়। ভারতে বা বাঙলাদেশে ১৮৫৯-৬০ সালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব তোলা তাই অবাস্তব—এখনো—১৯৯০ সালেও—স্বাধীন ভারতে যখন শতকরা ৭০ জন নিরক্ষর। আর, বিদ্যাসাগর কোনো অবাস্তব ব্যাপারে মাথা ঘামাতেন না। শুধু বাস্তববাদী নন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল—কি শিক্ষায়, কি সমাজকর্মে, কি নীতিতে, কি কর্মপ্রণালীতে, তেমন সম্ভাব্য কাজই তিনি বেছে নিতেন, নিজের কর্মপদ্ধতি ও প্র্যাকটিক্যাল-বুদ্ধি দ্বারা রূপায়িত করতেন। সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন ব্যাপারেও তাঁর সেই শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপ্রণালীর বাস্তব কার্যোপযোগিতার পরীক্ষা হয়। শিক্ষাবিস্তারেও তিনি ছিলেন এরূপ প্র্যাকটিক্যাল। দেশে শিক্ষা দ্রুত প্রসারিত করতে হলেও চাই বাঙলার মাধ্যমে প্রধান বিদ্যাসমূহ শিক্ষা ; শিক্ষার্থীর পথ সুগম করতে হলেও চাই বাঙলা ভাষায় বিদ্যার বিকিরণ, ইংরেজি ভাষা থেকে সেজন্য আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ ; সংস্কৃতের ভান্ডার থেকে রচনাকৌশল অর্জন। চাকরি ত্যাগ করে বিদ্যাসাগর ক্রমেই ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন আরও দুই কর্মে—সমাজসংস্কারে ও বাঙলা সাহিত্যরচনায়। অবশ্য কোনো সময়েই তিনি শিক্ষা-আয়োজন পরিত্যাগ করেননি, তাও আমরা জানি। সে সময়েও প্রত্যেকটি কাজেই দেখি তাঁর সুশৃঙ্খল বাস্তবচেতনা ও প্র্যাকটিক্যাল পরিচালনাশক্তির পরিচয়—সুশৃঙ্খল পদ্ধতির পুস্তকরচনা ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা।

পরিচালনাশক্তি

চাকরিত্যাগের পরে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দুটি প্রধান কাজ : বেথুন স্কুলের সম্পাদকরূপে তা পরিচালনা—ছাত্রীসংগ্রহ, নিয়মিত চালনা ইত্যাদি। দ্বিতীয়, মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজকে অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তোলা। (জীবনপঞ্জী দ্রষ্টব্য)।

দুটিই আমাদের শিক্ষা-ইতিহাসে অভিনব প্রতিষ্ঠান—এবং তার কাহিনী যে কোনো দেশের পক্ষে গৌরবের বিষয়। নারীর উন্নতি বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রধান ধ্যান, সমস্ত সামাজিক প্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দু। জীবন-শেষেও তিনি বীরসিংহে (১৮৯০) স্থাপন করেন 'ভগবতী বিদ্যালয়', আর কর্মাটারে চালাতেন পাঠশালা। জীবনের সব জিনিসে তখন তিনি আশাহীন, তবু আশা ছাড়েন না বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার—তাঁর উইলের দিকে তাকালেও তা দেখতে পাওয়া যায়। যতক্ষণ কিছুমাত্র শারীরিক সামর্থ্য ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজ ছিল তাঁর নিত্য সাধনার ক্ষেত্র।

কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল যাঁরা স্থাপন করেছিলেন তাঁদের কর্মশক্তি ও উৎসাহ বোধ হয় নিবে আসছিল। তাই ১৮৬১ সালে বিদ্যাসাগরকে সে স্কুলের সম্পাদক করে তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে চাইলেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকবার শক্তি রইল না আর বিদ্যাসাগরের। নাম পরিবর্তন করে ১৮৬৪-তে স্কুলটি হল 'মেট্রোপলিটান স্কুল'। যে কমিটি নিয়ে কার্যপরিচালনা তার দায়িত্ববোধ ও কর্মশক্তি বিদ্যাসাগরকে তুষ্ট করত না। যেখানে কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলত না সেখানে তিনি সে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতেন (যেমন ১৮৭৬-এ ত্যাগ করেন তাঁর সাধের হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফন্ডের ট্রাস্টিপদ), নইলে অন্যদের কর্তৃত্ব ত্যাগ করিয়ে নিজে নেবেন তা পরিচালনার দায়িত্ব। মেট্রোপলিটান স্কুল বাঁচল বিদ্যাসাগরের সেই কর্তৃত্বভার গ্রহণে। আর, শুধু বাঁচা নয়, বাঁচার মতো বাঁচা—বিদ্যাবুদ্ধি, দুর্বার পরিশ্রম, অক্লান্ত কর্মশক্তি সব নিয়ে যেমন করে তিনি সংস্কৃত কলেজকে প্রাণবান করতে চেয়েছিলেন, মেট্রোপলিটান স্কুলকেও তেমনিভাবে জীইয়ে তুললেন। পঠন-পাঠন-হিসাবপত্র—সব জিনিসেই খরদৃষ্টি, আর খরতর তাঁর কোমল-কঠিন শৃঙ্খলা-ধারা। কি ছাত্র, কি শিক্ষক—কেউ যেমন তাঁর স্নেহবঞ্চিত হবেন না, তেমনি কেউ পাবেন না শৃঙ্খলাভঙ্গের পরেও অব্যাহতি। দশ বৎসর যেতে না যেতেই ১৮৭৩ সালে স্কুলকে তিনি কলেজে উন্নীত করতে চাইলেন। কলিকাতায় তখনো সরকারী কলেজ ছাড়া ছিল মিশনারি সাহেবদের কলেজ। মেট্রোপলিটানই বাঙালি-পালিত প্রথম বেসরকারী কলেজ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিশনারি ও সরকারী সদস্যরা প্রথম এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। দেশীয় লোকে আবার কলেজ চালাবে কি ? কিন্তু এই দেশীয় লোক যে বিদ্যাসাগর যাঁর সামনে শাসকসাহেবরাও অনুভব করবেন—হাঁ, দেশী লোক নয়, একটা মানুষ। অনুমোদন আদায় তিনি করলেন। প্রথম বৎসরের পরীক্ষার ফলেই দেখা গেল—ছাত্রদের অদ্ভুত কৃতিত্ব। বিদ্যাসাগরের কর্মশক্তির সাফল্য। গোরা সাহেবরাও বলতে বাধ্য হলেন—পণ্ডিত অবাক্ কাণ্ড করেছে। বিদ্যাসাগরের আনন্দের সীমা ছিল না—উৎসাহেরও সীমা রইল না।

ক্রমেই কলেজ বি-এ অনার্স, এম্-এ ও আইন পড়াবার অধিকারও পেল। সেখানে বিদ্যাসাগর এনে জোটাতেন এন. এন. ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো খ্যাতনামা অধ্যাপকদের। নিজে তদারক করতেন তাঁদের অধ্যাপনা ; আর সেখান থেকে যাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁরা অনেকেই বাঙলার কৃতী পুরুষ—উচ্চ রাজকর্মে বা দেশের সেবায় অনেকেই হয়েছেন অগ্রণী।

একথা বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষানীতিকে প্রয়োগ করবার সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতিতে ছিল না। তখনো শিক্ষাক্ষেত্রে একচ্ছত্র প্রতাপ ইংরেজির। বাংলা ঘুঁটেকুড়ানীও নয়। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সে শিক্ষানীতিতে কিছুমাত্র সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু প্রথমত তিনি প্র্যাকটিক্যাল মানুষ, বুঝেছিলেন গত্যন্তর নেই। দ্বিতীয়ত, নিজের অভিজ্ঞতাতেই ক্রমশ বুঝেছিলেন—শিক্ষা চাইলে আপাতত এ অবস্থাকে মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। বাঙালী ভদ্রলোক সেরূপ ইংরেজি শিক্ষাই চায় যার লক্ষ্য 'গাড়িঘোড়া চড়া'। সমাজকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে আলোকিত করে আধুনিক পৃথিবীতে জীবিত সমাজ গড়ে তোলা—বিদ্যাসাগরের সে আদর্শে তারা উৎসাহী নয়। যতটুকু আধুনিক শিক্ষায় ব্যক্তিজীবনে সুযোগ-সুবিধা লাভ হয়—তাই যথেষ্ট। এ মনোভাবে বিদ্যাসাগরের সায় ছিল না, কিন্তু ক্রমেই তিনি দেখছিলেন—প্রতিকূল শক্তি তাঁর চেয়ে অনেক প্রবল। কাজেই ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে বিদ্যাসাগর ক্রমেই অনুভব করেন এ বাস্তব অবস্থা মেনে নিয়েই শিক্ষা-সংগঠন ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে। আর এ অবস্থার মধ্যেই তাঁর সুচিন্তিত পদ্ধতির পুস্তক-রচনার সাহায্যে একদিকে গঠন করতে হবে যথোচিত শিক্ষিত জীবনদৃষ্টি, অন্যদিকে সমাজসংস্কারের উপযোগী শিক্ষিত কর্মপ্রবৃত্তি। জীবন অনমনীয় বিদ্যাসাগরকেও কিছু শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করেছে ; তা পরবর্তী কালের তাঁর কথায় ও মন্তব্যে বোঝা যায়।

পাঠ্য-রচনা

পাঠ্যপুস্তক রচনায় বিদ্যাসাগর হাত দিয়েছিলেন সাহেব ছাত্রদের পঠন-পাঠনের জন্য—'বেতাল পঞ্চবিংশতি' মোটেই তাঁর অভিপ্রেত বিষয়বস্তুর বই নয়। তা তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু 'বোধোদয়ে'র রচনাকালের (১৮৫১) পূর্বেই তাঁর শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষানীতি স্থির হয়ে উঠেছিল। তিনি পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করেছেন শিক্ষার পথ সুগম করতে হলে কী চাই—কী জাতীয় জ্ঞান বা তথ্য (বিষয়বস্তু) আমাদের ছাত্রদের প্রথম ও প্রধান জ্ঞাতব্য ; এবং কী রূপে সে জ্ঞান শিক্ষার্থীদের বয়স, বুদ্ধি, ভাষাবোধ ও শিক্ষামানের কথা বিচার করে পরিবেশন করা

প্রয়োজন। একেবারে ধারাবাহিকভাবে এ পথে অগ্রসর হতে তিনি প্রবৃত্ত হন। 'বর্ণপরিচয়ে'র (১৮৫৫) বর্ণজ্ঞান থেকে শুরু করে দ্বিতীয় ধাপে 'কথামালা'র (১৮৫৬) নীতিমূলক গল্প, তৃতীয় ধাপে 'চরিতাবলী'র (১৮৫৬) দরিদ্র সন্তান শিক্ষোন্নত পুরুষদের জীবনী,—আর, পরবর্তী ধাপে 'বোধোদয়ে' (১৮৫১) ঐহিক পদার্থসমূহের আবশ্যিক জ্ঞান—এসব সুশৃঙ্খল শিক্ষাচিন্তার পরিচায়ক। পূর্বে লিখিত (১৮৪৯) 'জীবনচরিত' আসলে সে পর্যায়ে গণ্য নয়। প্রধান কারণ 'জীবনচরিতে'র ভাষা দোষাবহ। বরং 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ২য় ভাগ (১৮৪৮) সে দিক থেকে এই প্রাথমিক পাঠ্যধারার সঙ্গে সংগতিযুক্ত। সেই প্রাথমিক পর্ব শেষ হতে পরিণতবুদ্ধি ও রসবোধের দাবিকে স্বীকার করে রচনা করেন 'আখ্যানমঞ্জরী' ;—তাও ঘটনাপ্রধান। কিন্তু তৎপূর্বেই স্বচ্ছন্দ রসাস্বাদনের জন্য রচিত হয়েছিল 'শকুন্তলা' (১৮৫৪) ও 'সীতার বনবাস' (১৮৬০) ; আর সর্বশেষের ওরূপ রচনা হল ১৮৬৯-এর 'ভ্রান্তিবিলাস'—এ লেখাগুলি শিক্ষাসাহিত্য অপেক্ষাও মূলত চিত্তরঞ্জন সাহিত্য ; অবশ্য 'কথামালা', 'চরিতাবলী'তেও বিদ্যাসাগরের সরস চিত্তের স্পর্শ না আছে তা নয়। তার মধ্যে কৌতুক-ছটা সুস্পষ্ট।

তথাপি আজকের দিনে বিদ্যাসাগরের এই ছাত্র-পাঠ্যগ্রন্থগুলি বিচার করলে আমরা খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করি না। পূর্বাপর নীতিমূলক উদ্দেশ্য তাতে খুব প্রকট। আর, বিষয়ের দিক থেকে রূপকথা, উপকথার কল্পনা-রঙীন কোনো আকর্ষণই এসব রচনায় নেই—নীরেট 'জ্ঞানের' কথা। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার—তখনো আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান (পেডাগোজিক্স) গড়ে ওঠেনি ; শিক্ষামনোবিজ্ঞানও ছিল অজ্ঞাত। এবং বিদ্যাসাগরের মতো পুরুষ চেয়েছিলেন দেশটাকে ধোঁয়ার রাজ্য, স্বপ্নের রাজ্য, কল্পনার রাজ্য থেকে ছাড়িয়ে ঐহিক পৃথিবীতে, বাস্তব জগতে দাঁড় করাতে। তিনি তাই অপার্থিব ও পৌরাণিক কাহিনীর ছায়াও মাড়াননি—এমনকি, অনেকটা ঐ কারণেই 'আখ্যানমঞ্জরী'তে ভারতীয়দেরও কারও কথা নেই। এ অবশ্য বাড়াবাড়ি। কিন্তু তখন যে প্রাণের দায়—স্বপ্ন দেখার, কল্পনা-প্রশ্রয়ের সময় তা নয়। এ সত্যও অগ্রাহ্য করার মতো নয়—শিক্ষার্থীদের খেলায়-গল্পে-চিত্রে-গানে শিক্ষিত করে তোলা যেমন সত্যকারের শিক্ষাপদ্ধতি,—মনের পূর্ণ বিকাশের জন্যই চাই শিক্ষা—সেদিন তেমনি সত্য ছিল বিদ্যাসাগরের এই বোধ—ধোঁয়ার রাজ্য থেকে জীবনের রাজ্যে দেশকে আনতে হবে। আজও কি সে প্রয়োজন শেষ হয়েছে, আমরা বলতে পারি ?

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের এই প্রয়োজনীয় পরিচয় গ্রহণ করতে করতে আমরা

যেন ভুলে না যাই—কর্মজীবন সমগ্র জীবন নয়। অন্তত বিদ্যাসাগরের পক্ষে তো নয়ই। মানুষ বিদ্যাসাগর তাঁর কীর্তির চেয়েও মহৎ—তাঁর অনমনীয় চরিত্রশক্তিতে, তাঁর মানবপ্রেমে। তাঁর জীবনকে যদি আমরা সেই সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখি তাহলে তাঁর কর্মজীবনের যথার্থ তাৎপর্যও উপলব্ধি করতে পারি না। বিদ্যাসাগরের কর্ম তাতে মনে হবে, তৎকালীন অকৃতকার্যতায় ও সাময়িক পরাজয়ে বহুভাবে ব্যাহত। আজ আর কি তার গুরুত্ব আছে? বিদ্যাসাগরের জীবনের এই আধুনিক তাৎপর্যের কথা রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছিলেন ৬৭ বৎসর পূর্বে—বিদ্যাসাগরের জন্মদিবসের ভাষণে (বিদ্যাসাগরের আধুনিকতা, প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৯ বাংলা):

"বহমান কালগঙ্গার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিল ছিল, এইজন্যই বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।"

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের ধারাকেও এই 'বহমান কালগঙ্গা'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তাঁর আধুনিকতা অনুভব করা আজ আমাদের তাই দায়িত্ব। সেখানে একদিকে সাক্ষ্য বিদ্যাসাগরের সমসাময়িকদের লেখা ও কথা, বিদ্যাসাগরের জীবনীসমূহ ও অন্যান্য লেখা। অন্য প্রধান সাক্ষ্য বিদ্যাসাগরের আপন দান—জীবনসংগ্রামে তাঁর দাখিল করা প্রতিদিনের প্রমাণপত্র। শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগরের আপন পরিচয়, তাঁর কর্মে ও সংগ্রামে, তাঁর শিক্ষানীতির ব্যাখ্যায়, তাঁর আপন রচিত ক্লাসের অধীতব্য ও স্বচ্ছন্দোপভোগ্য বাংলা রচনায়। সমাজসেবী বিদ্যাসাগরের পরিচয় তাঁর কর্মে, ও স্বনামী ও বেনামী পুস্তক-পুস্তিকায়। সাহিত্য-স্রষ্টা বিদ্যাসাগরের পরিচয় তাঁর ভাব-ও-ভাষায় সমৃদ্ধ, স্বচ্ছন্দ গম্ভীর বাংলা রচনায়। তাঁর জীবনীকারেরা তাঁর জীবন উদ্ঘাটনে যে প্রয়াস পান, সে প্রয়াস সম্পূর্ণ হয় বিদ্যাসাগরের নিজের সাক্ষ্যে—তাঁর রচনায়, লিখিত মন্তব্যে, পত্রে, এবং তাঁর হাস্য-পরিহাস-সমৃদ্ধ অজস্র আলাপে-কাহিনীতে।

জন্মের ১৭০ বৎসর পরে তাঁর কর্মজীবন অনুসরণ করতে গিয়ে প্রথমেই আমাদের মনে হয়—বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন শিক্ষাগুরু হবার জন্য।—তৎকালীন সমস্ত সাফল্য-ব্যর্থতার পরেও আজ দেখতে পাই—তিনি আধুনিক জাতীয় শিক্ষার যুগেও শিক্ষাগুরু। জাতীয় শিক্ষার যে ধারা তিনি বাধামুক্ত করতে চেয়েছিলেন, আমরা দেখেছি, তা তখন সুসম্ভব হয়নি—এখনো হয়েছে বলা যায় না,—কিন্তু তা এখনো বাতিল হবার মতো নয়।

কর্মকুশলতা

শিক্ষাক্ষেত্রে যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা বিদ্যাসাগরের গ্রহণ করলাম, তাতে দেখতে পাই শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগরের তিনটি প্রধান দিকের তৎপরতা। শিক্ষাসংস্থা গঠনের

ও পরিচালনার দিক থেকে এক বাস্তববুদ্ধিযুক্ত অসামান্য পরিশ্রমী ও কর্মপটু শিক্ষানায়ক তিনি। সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন, বঙ্গবিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়-সমূহের দুর্বার গতিতে সংগঠন, বেথুন স্কুলের প্রায় আশৈশব পালন ও পোষণ, আর মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজের (এখন যার নাম বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সার্থক) পুনরুজ্জীবন—এসবের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাস্তব কর্মক্ষেত্রে বাঙালী চরিত্রের যে শিথিলতা, যে আরামপ্রিয়তা ও বৈষয়িক বুদ্ধির অভাব প্রায় অনস্বীকার্য, বিদ্যাসাগরের তা চক্ষুশূল ছিল। বিদ্যাসাগরের একাগ্রচিত্ত ও একান্ত আত্মপ্রত্যয়শীল ব্যক্তিত্বের পক্ষে এসব শিথিলতা ছিল অসহ্য। তাই প্রায় ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিষ্ঠান-পরিচালনার ক্ষমতা আপনার হস্তে গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন। তাঁর জীবনী পাঠ করলে 'এঁড়ে' বিদ্যাসাগরের স্বভাবের 'একগুঁয়েমি' অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে হয়—কতটা সেজন্য দায়ী তাঁর সহকর্মী ও সহযোগীদের অকর্মণ্যতা, অকারণ দলাদলি ও বিরোধ-প্রিয়তা। এই কথা বলাই যথেষ্ট—আজও বিদ্যাসাগরের কর্মকুশলতা বাঙালির পক্ষে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারতীয় জীবনেও তা খুব সুপ্রতুল নয়।

জাতীয় শিক্ষার প্রথম ব্যাখ্যান

কিন্তু বিদ্যাসাগর শুধু দফ্তরের দেবতা ছিলেন না—কেরানী বা শিক্ষক, বা বেয়ারা দপ্তরীদের চাবুক চালিয়ে খাটিয়েই যিনি কাজ করাতে অভ্যস্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দানের প্রধান রূপ আমরা দেখেছি—শিক্ষাদর্শ নির্ণয়ে, শিক্ষানীতি প্রণয়নে এবং শিক্ষা-প্রণালীতে। সমগ্রভাবে দেখলে বুঝি—প্রথম জাতীয় শিক্ষার আদর্শ ও রূপ বিদ্যাসাগরই নির্দেশ করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। পুনরুল্লেখ বাহুল্য নয়—সেই শিক্ষা-ভাবনার প্রাণ এই সত্যে : পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার দান আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনক্ষেত্রে প্রবাহিত করানো চাই। এই 'পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা'র অর্থ নতুন জীবনদৃষ্টি, জীবন-বোধ, পৃথিবীর তা আধুনিকতম সভ্যতা—ইংলণ্ড, ফ্রান্স এমন কি ইউরোপেরও তা একান্ত সম্পদ নয়। রিনাইসেন্স, রিফর্মেশন ও ফরাসী বিপ্লব সুদ্ধ আধুনিক সভ্যতা বিজ্ঞান ও শিল্পবিপ্লবে সমৃদ্ধ হয়ে প্রথমে ইংলণ্ডে উদ্ভূত হয়—তারপর ইউরোপে, আমেরিকায় ও এখন এশিয়ায়, আফ্রিকায় সে সভ্যতা সর্বত্র মূর্ত। বিদ্যাসাগর এই আধুনিকতাকে এ দেশে পুরুষের মতো গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন—সেই আগ্রহে পুরাতন হিন্দু দর্শনকে তিনি মাত্রাতিরিক্ত কঠোর সমালোচনাও করেছিলেন। চটি-চাদর-পরা পণ্ডিত জানিয়ে গিয়েছেন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার রূপ হ্যাট-কোটে নয়। এমন কি, হিন্দু কলেজের ইয়ং

বেঙ্গলের ইংরেজি কপচানোও আধুনিকতা নয়—আধুনিকতার অর্থ উদ্যোগে, পুরুষকারে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পদকে জীবনক্ষেত্রে সার্থকতা দানে।

এইভাবে এই প্রথম নির্দিষ্ট হল আমাদের জাতীয় শিক্ষার কনটেণ্ট বা প্রাণবস্তু—আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান। সেই সঙ্গেই প্রশ্ন ওঠে তার দেহের, অবয়বের (ফর্মের) কথা। বিদ্যাসাগরের জাতীয় শিক্ষার মূলনীতি—জাতীয় (বাংলা) ভাষা ও সাহিত্যের সম্যক উন্নয়ন—এরূপ উন্নয়ন যাতে তা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বাহন হয়ে উঠতে পারে। সে জ্ঞান আহরণ করতে হবে ইংরেজি (ইংরেজিই তখন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার) ভাষা ও সাহিত্য থেকে ; এবং সবল, স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল বাংলা রচনা-রীতি আয়ত্ত করতে হবে সংস্কৃত ভাষার সহায়ে। এই তিন ভাষাই জাতীয় শিক্ষার পক্ষে যথানুরূপ তাই শিক্ষণীয়। অবশ্য বাংলা ভাষা যতই তার নিজস্ব শক্তিতে বিকশিত হবে ততই সংস্কৃতের থেকে ঋণগ্রহণের ঐরূপ প্রয়োজন হ্রাস পাবে ; যেমন, এখনই তা অনেকাংশে বাঙালীর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ইংরেজির দৌত্য তখনো একেবারে অস্বীকার করার উপায় নেই—তবে প্রয়োজন ইংরেজির দাসত্ব অস্বীকার—বাংলায় বাহনত্ব স্বীকার। বলা বাহুল্য, এই হল আজকালকার ভাষায় শিক্ষাক্ষেত্রে 'ত্রি-ভাষার নীতি'র প্রথম ব্যাখ্যান। জাতীয় শিক্ষার রূপ কী, বাহন কী, বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষার ভাষানীতি কী—বিদ্যাসাগরই তা বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে প্রথম ব্যাখ্যা করেন। সেদিন যদি বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার বাহন করে আমরা এই ত্রিভাষিক শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম, তাহলে জাতীয় জীবনে ও শিক্ষাজীবনে একালের ভাষাবিভ্রাটের অভিশাপ ও তর্কের কুজ্ঝটিকা থেকে অব্যাহতি পেতাম।

দ্বিতীয় কথা, বিদ্যাসাগরের এই জাতীয় শিক্ষানীতি শুধু 'ত্রিভাষার নীতি'ই নয়—জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষাপ্রসারের নীতিও। যদি ইংরেজিই শিক্ষার বাহন হয় তাহলে সে শিক্ষা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং তাদের কাছেও সে বিদ্যা থাকবে পুঁথিপড়া এক নিষ্প্রাণ বা বিকৃত বিদ্যা। জাতির উন্নয়ন চাইলে আধুনিক ও সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার যেমন প্রয়োজন, তেমনি জাতির সকল স্তরে শিক্ষার প্রভূততম প্রসারও কাম্য—কোয়ালিটেটিভ ও কোয়ানটিটেটিভ দুরকম প্রসারই প্রয়োজন। পূর্বেই দেখেছি—কেন বিদ্যাসাগর তখনো (১৮৫৯) শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তারের কথা ভাবেননি, সে প্রস্তাব উত্থাপন করেননি,—শত হলেও তা তাঁর সীমাবদ্ধতার প্রমাণ। তাঁর সৃষ্টি সর্বত্রগামী হয়নি, ভবিষ্যদগামীও নয়। কিন্তু সুযোগ পেতেই (১৮৫৪-৫৮) ঝড়ের মতো দুর্বার গতিতে সেই প্রবল পুরুষ গ্রামে গ্রামে নর্মাল স্কুল, গ্রামে গ্রামে বঙ্গবিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে

উদ্যোগী হন—সন্দেহ মাত্র নেই, তা সর্বরকমেই জাতীয় শিক্ষার বিস্তারপ্রচেষ্টা। এ প্রোগ্রাম প্রায় অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। কারণ আমরা জানি, সাম্রাজ্যবাদী সরকার তার বিরোধিতা না করে পারে না। এবং এও জানি, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাবিস্তারের নীতি তখন উনিশ শতকের ভদ্রলোকশ্রেণীরও অনুমোদন লাভ করেনি। তিনি আজ বেঁচে থাকলে দেখতেন—স্বাধীনতার তেতাল্লিশ বৎসরেও তাঁর স্বদেশে বাংলা ভাষা শিক্ষার সর্বস্তরে প্রধান বাহন হয়নি, তাঁর দেশে শতকরা ৭০টি মানুষ এখনও নিরক্ষর। বর্ণপরিচয়ের বিদ্যার সঙ্গেও তাদের পরিচয় হল না।

রচনা নৈপুণ্য

তৃতীয় কথা, স্কুল স্থাপনা থেকে জীবনে প্রয়োজনীয় বিদ্যাকে সকলের পক্ষে সুগম করবার কোনো চেষ্টাই বিদ্যাসাগর বাদ রাখেননি—এ প্রসঙ্গে সেই সত্যও মনে পড়বে। যতই আমরা তাঁর সাহিত্য ও শিক্ষাসাহিত্য রচনার প্রয়াসের দিকে দেখি, ততই অনুভব করতে বাধ্য হই, পাঠ্যপরিকল্পনায় তাঁর বাস্তববোধ বা কমন সেন্স, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ; অন্যদিকে, পাঠ্যরচনারীতিতে তাঁর নিপুণ কুশলতা, ভাষার সরলতা, সহজশ্রী, এমনকি সচলতা। সাহিত্যবিচারের প্রসঙ্গে না গিয়ে একবার 'বর্ণপরিচয়' থেকে 'বোধোদয়' পর্যন্ত তাঁর পাঠ্যপুস্তক কয়টির দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি—কেন তিনি সত্যই শিক্ষা-সাহিত্যের প্রধান গুরু। 'বর্ণপরিচয়ে' বর্ণজ্ঞান থেকে শিশু বা নিরক্ষরকে পদে পদে তিনি হাতে ধরে নিয়ে যান। এভাবে বর্ণবোধের শব্দমালাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুসম্বদ্ধ করা বিদ্যাসাগরেরই কীর্তি—অবশ্য আজ তা বাঙালীর অত্যন্ত সহজ সম্পদ। তিনিই এই বর্ণপরিচয়ের পর একের পর এক বাস্তব জ্ঞানের সোপান পার করে শিশু-শিক্ষার্থীকে উৎসুক ও অভ্যস্ত করেন, গল্পাকারে মানবীয় গুণের সঙ্গে পরিচিত করান, শ্রেষ্ঠ মানুষের কথায় উদ্‌বুদ্ধ করেন। শেষে 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি চিরন্তন রসসম্পদের দুয়ারে শিক্ষার্থীকে পেঁছে দেন। একটি প্রস্তাবেও পারত্রিক কথা নেই। আধুনিক জীবন ; পৃথিবীর জ্ঞান ; বৈজ্ঞানিকদের জীবনসংগ্রাম ; অখ্যাত দরিদ্র মানুষদের শিক্ষায়, পরিশ্রমে, স্বকীয় উদ্যোগে অভ্যুদয় ; ব্যক্তির জয়গানের সঙ্গে বিবেকের উদ্‌বোধন ; পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণনীতির বোধ জন্মানো—এইসব বিদ্যাসাগরের শিক্ষার ভিত্তি। আজও এই ভিত্তি অপরিত্যাজ্য। আমরা একালের দৃষ্টি অনুযায়ী রঙে রসে ছবিতে ছড়ায় সঞ্জীবিত করে এই বাস্তব শিক্ষাকে আরও মনোরঞ্জক করব না কেন? নিশ্চয়ই করব। কিন্তু ছাড়তে পারব না এই ভিত্তি—সেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মন-বুদ্ধি-চেতনাকে উজ্জীবিত করার বিদ্যাসাগরীয় কলাকৌশল ও

শিক্ষা-দৃষ্টান্ত—যে কৌশল পরিণতচিত্ত রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে (ভুল সত্ত্বেও) 'জল পড়ে পাতা নড়ে' এই বাক্য দুটি আশ্রয় করে আদি কবির বিচিত্র ছন্দের প্রথম প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলেছিল। কারণ, বাস্তব জ্ঞান, আর তারও তলাকার গভীরতর ছন্দবোধ—দুই-ই বিদ্যাসাগরের পাঠ প্রণালীতে যথার্থ সমন্বিত।

উপরের আলোচনায় শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগরের অবদানের কথা সাক্ষর জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—কিন্তু ১৯৯০ সালে স্বাধীনতার ৪৩ বৎসর পরেও সৌভাগ্য হল না বলতে পারি—দেশের আপামর সাধারণের সম্মুখে তুলে ধরতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি;—কারণ, অক্ষরজ্ঞান থেকেও দেশের শতকরা প্রায় ৭০ জন মানুষ এখনো বঞ্চিত। আর শিক্ষার ভিত্তি যেখানে এতই সংকীর্ণ সেখানে সাধারণ শিক্ষিতই বা কয়জন? 'বর্ণপরিচয়'-এর প্রয়োজন যদি শতকরা ৭০ জনের এখনো থেকে থাকে, তা হলে 'বোধোদয়'-এর উদ্দিষ্ট প্রয়োজনীয় শিক্ষা, কিংবা 'চরিতাবলী'র বৈজ্ঞানিক জীবনের মূলস্থ শিক্ষা বাকি শতকরা ৩০ জনের মধ্যে কতজনের আজও হয়েছে? আর উচ্চশিক্ষিত কতজন এখনও শুনেছেন—বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ, শিক্ষানীতি, জাতীয় শিক্ষার সেই প্রথম সুসম্বন্ধ ও প্রবল প্রচেষ্টার কথা (দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট)!

আজ থেকে একশ চল্লিশ বৎসর আগে, পরাধীন দেশে, এক আধাসামন্ত ব্যবস্থার মধ্যে প্রশাসনিক ও সামাজিক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও একজন ব্যক্তি প্রায় একক চেষ্টায় জন-শিক্ষা বিস্তারের জন্য যা করেছেন, সর্বোপরি শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে যে secular আধুনিক মনের পরিচয় দিয়েছেন, তা ভাবলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

পরিশেষে, শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগর স্বগ্রামে বালকদের জন্য যে অবৈতনিক বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন (১৮৫৩), সেই বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর লজ সাহেব (২০শে মে, ১৮৫৯), যে মন্তব্য করেছিলেন, তা উদ্ধৃত করে এ পর্বের আলোচনা শেষ করছি—

"এই স্কুলটি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহারই সম্পূর্ণ ব্যয়ে পরিচালিত। এ কথা না বলিলে এই সুবিখ্যাত জনহিতৈষীর প্রতি অবিচার করা হয়; স্কুল-গৃহের জন্য তিনি বেশ উপযোগী স্থানে একখানি সুন্দর বাংলা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ছয়-সাতজন শিক্ষকের বেতন তিনি নিজেই দেন। ছাত্রদের নিকট মাহিনা লওয়া হয় না, বিনা মূল্যে তাহাদের সকল রকম বই দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, পণ্ডিতের নিজের বাড়িতে প্রায় ৩০ জন দরিদ্র ছেলের আহারের ও থাকিবার ব্যবস্থা আছে; দরকার পড়িলে বস্ত্রাদি পর্যন্ত যোগান হয়। অসুখে তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, সকলের সম্বন্ধেই এমন যত্ন লওয়া হয় যেন প্রত্যেকেই পরিবারের একজন।" (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৮ থেকে পুনরুদ্ধৃত)।

৩ 'বহমান কালগঙ্গা' ও বিদ্যাসাগর

"আমাদের দেশের লোকেরা একদিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করে থাকতে পারেননি বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহত্বগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন, সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড় পরিচয়, সেইটিই তাঁর দেশবাসীরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন।"—ঠিক সত্তর বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভা উপলক্ষে এই কথা বলেছিলেন (প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৯)। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল বুঝিয়ে বলা বিদ্যাসাগর তাঁর কালের থেকে অগ্রসর আধুনিক মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত, নির্ভীক ও দৃঢ়চেতা পুরুষ ; ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে নিঃস্পৃহ-উদাসীন। তাঁর সমস্ত চিন্তাচেতনা-কর্মতৎপরতা সমাজ ও মানুষের গুরুত্ব মেনে নিয়েই অগ্রসর হয়েছে। "দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁর অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব"—এবং সেইটিই তাঁর সত্যকার পরিচয়।

বিদ্যাসাগর সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রাখেননি—"বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম।" একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিধবাবিবাহ সমর্থনে যে পত্রটি তিনি লেখেন তার মধ্যে তাঁর কর্মজীবনের ও জীবনদৃষ্টির সেই বিশিষ্ট পরিচয়টি সমুদ্রিত রয়েছে। আমাদের মনেও তা মুদ্রিত করে রাখবার মতো—

> বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে উহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত-স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। আমি দেশাচারের দাস নহি ; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।

বিদ্যাসাগরের সমাজদৃষ্টি

"আমি দেশাচারের দাস নহি। নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব"—এই বোধ ও সংকল্প নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগরের

আত্মসংকল্পে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিত্বের প্রমাণ। কিন্তু এ ব্যক্তিত্ব জ্ঞান-বুদ্ধি-চৈতন্যে প্রবুদ্ধ মানবহৃদয়ের দ্বারা সংগঠিত—একটি ইন্‌টিগ্রেটেড্ পার্সন্যালিটি, জ্ঞানে-প্রেমে কর্মে যা একটি 'অখন্ড মানবতা', 'অক্ষয় পৌরুষ'। নিজের মধ্যে এই সত্য অনুভব করেছেন বলেই বিদ্যাসাগর সমাজের বিধিব্যবস্থাকে চূড়ান্ত বলে মানতে পারেননি। সমাজকে তিনি কখনো অকারণে বা মূঢ়ের মতো আঘাত করতে যাননি—কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ছিল যে, সমাজ অনড়, স্থাণু বস্তু নয় ; এবং, তার চলতি পথে মূঢ়তা ও অন্ধতা জমে ওঠে ; প্রয়োজনমত সেসব ছেঁটে তার পথ সুগম, এবং সমাজের জীবনকে সুস্থ করে তোলাই সমাজধর্ম পালন ; আর এরূপ সুচিন্তিত পথে সমাজসংস্কারই প্রকৃত সমাজসেবা। যারা গতানুগতিকতাকেই মনে করে সমাজ-নীতি, তারা সমাজের এই মর্মবস্তু বা প্রাণসত্যই জানে না। এরূপ লোকের সংখ্যা সকল কালেই বেশি। সমাজ যে কী তারা খতিয়ে বোঝে না ; যে সমাজের মধ্যে জন্মেছে, ভাবে, তা বুঝি চিরদিন এরূপই ছিল, এরূপই থাকবে ; তার নিয়ম-নীতি-আচার-ব্যবহারের কিছুরই পরিবর্তন নেই। নানা কারণে, সমাজ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা আবার ভারতীয় সমাজে প্রায় ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ বলে গণ্য হয়। কালের নিয়মে পৃথিবীতে যত পরিবর্তন ঘটবার ঘটুক, তাতে ভারতীয় সমাজের ও সমাজজীবনের কী যায় আসে। এ সমাজ সনাতন, শাশ্বত ; কালের উত্থান-পতনের সঙ্গে বুদ্‌বুদের মতো অন্য সব গোষ্ঠী ওঠে, তারপর ফেটে যায়—কিন্তু সনাতন সমাজ চিরজীবি ; এরূপই ছিল, এরূপই থাকবে। বিদ্যাসাগরের সমকালে অবশ্য এ ধারণায় ফুটো হয়েছিল, তা আমরা জানি ; কিন্তু ফাটল ধরেও ধরেনি, তা আমরা দেখতে পাই। তিনি নিজে ও তাঁর মতো দু-একজন যুগপুরুষ সমাজের ফুটো ও ফাটল দুই সম্বন্ধেই সচেতন হয়েছিলেন—ফুটো দিয়ে বাইরের পৃথিবীর আলো আকাশ দেখেছিলেন ; ফাটল দিয়ে নয়, একেবারে নতুন দুয়ার বসিয়ে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ভারতীয় সমাজের যোগাযোগ স্থাপনে অগ্রসর হয়েছিলেন। নিজের প্র্যাক্‌টিক্যাল বুদ্ধিতে তিনি যা সাধ্য তাই করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে তিনি চাইছিলেন আধুনিক শিক্ষার প্রসার—আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতার দ্বারা দেশের জাগরণ। অন্যদিকে, সমাজের যেসব গলদ সন্দেহাতীত ; সকলেই যা দেখে, বোঝে, এবং অন্তরে অন্তরে তা গলদ বলে স্বীকারও করে—তাই, তা দূর করতে তাদেরও সম্মতিলাভ সুসম্ভব—সেসব অতিস্পষ্ট গলদগুলি দূর করা, শিক্ষা দিয়ে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীকে যতটা সম্ভব সচেতন করে তোলা ; আর তাদের সাহায্যে সংস্কারের চেষ্টায় সমাজকে নাড়াচাড়া দিয়ে একটু জীইয়ে তোলা। বিদ্যাসাগর প্র্যাক্‌টিক্যাল হলেও এ ক্ষেত্রে বুঝতে পারেন নি—যারা শিক্ষায় সচেতন তারাও সকলে এতটা সক্রিয় হতে উৎসাহী হয় না ; আর

আমাদের সমাজের চিরদিনের যা অভ্যাস তাতে সমাজকর্তারা ও ভদ্রলোক সমাজ সেরূপে পরিবর্তনের প্রয়োজন চোখে দেখলেও মুখে ও কার্যে স্বীকার করে না।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর সমকালীনদের পার্থক্য যে কী, তা এই সামাজিক দৃষ্টি ও সামাজিক কর্মক্ষেত্রে পরিষ্কার হয়ে উঠল। বিদ্যাসাগরের মানবীয় প্রয়াস ও পৌরুষ কোনোটাকেই অবজ্ঞা করবার সাধ্য তাঁদের ছিল না ; তাই গোঁড়ারা প্রত্যক্ষে তাঁকে দিয়েছে আঘাত, করেছে তাঁর সমাজসংস্কারের বিরোধিতা, আর বাদবাকী অপরেরা তাঁর চেষ্টা থেকে দূরে থেকে পরোক্ষে তাঁর দীপ্ত মানবতা বা হিউম্যানিজ্‌মকে চাপা দিতে চেয়েছে 'দয়ার সাগরের অশ্রুসজল পরোপকারধর্মের (হিউম্যানিটেরিয়ানিজ্‌ম্) প্রশংসায়। এই অবস্থাটা রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার করে নির্দেশ করেছেন :

এর থেকে একটি কথার প্রমাণ হয় যে তাঁর দেশের লোক যে যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড় যুগে তাঁর জন্ম যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবীকালকে প্রত্যাখ্যান করে না। যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে ; বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এই জন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।

যারা অতীতের জড় বাধা লংঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে নিয়ে যায় সারথিস্বরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহারথিগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন, আমার মনে এই সত্যটিই সবচেয়ে বড় হয়ে লেগেছে।

'বহমান কালগঙ্গা' ও বিদ্যাসাগর

"স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে"—অনেক সমাজের কালক্রমে এরূপ অবস্থা ঘটে—ঘটাই নিয়ম। কোনো কোনো সমাজ তাই ডোবাতেই ডুবে লুপ্ত হয়ে যায় ; ভারতীয় সমাজ ঠিক তা হয়নি—তার গতিধারা ক্রমশই নিস্তব্ধ হয়, তাই তার অনেক এলাকায় দেখা দিয়েছে স্রোতোহীন বদ্ধ জলাভূমি ; কোথাও-বা ডোবাও হয়েছে। কিন্তু তার বিরাট জীবনযাত্রা মেঘরৌদ্রআকাশের আশ্রয় থেকে একেবারে বঞ্চিত হয়ে পড়েনি। সেই রৌদ্রে-জলে বীজাণু কতকটা নাশ হত, তবে সমাজ গতি হারিয়ে বন্ধ জলাশয়রূপে স্বাস্থ্য ও শক্তি হারাতে হারাতে ক্রমশ মরবার দিকেই এগিয়ে চলেছিল।

প্রায় তিন হাজার বৎসর ধরে ভারতীয় সমাজ সাধারণভাবে গতি হারাতে হারাতে এই অবস্থাতেই এসে পৌঁছেছিল—বাঁচতেও জানে না, মরতেও জানে না।

সেই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল আধুনিক সভ্যতা যখন হুড়মুড় করে তার ঘাড়ে এসে পড়ল—সমুদ্রই যেন এগিয়ে এসে তার বাঁধাপড়া বদ্ধ জলাশয়ের জীবনকে লুঠ করে নিলে। বাইরের থেকে দেখলে তা হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারত জয়। আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক—সকল রকমেই ভারত-সমাজকে লুঠ করে ইংরেজের বাহিত আধুনিক সভ্যতা তার বদ্ধ জীবনযাত্রাকে মুক্ত করছিল, আর জেনে না-জেনে টেনে এনে ভারতীয় সমাজের প্রাণগঙ্গাকে আপনার নতুন খাতে বইবার প্রেরণা দিচ্ছিল। এই প্রেক্ষাপটেই বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব—পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তা আমরা বলেছি; সেই বিশেষ কালগত এলাকার মধ্যে তাঁর জীবন বাহিত, এবং তাঁর জীবনীও সেভাবেই আলোচ্য। তাই, তাঁর সামাজিক কর্মধারা ও চিন্তাভাবনা বুঝবার জন্য বিশেষ করে ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষাপট আমরা এখানে সংক্ষেপে সাধ্যমত নির্দেশ করতে চাই। এটি সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা নয়, এখানে তা সম্ভব নয়, আর আমার বিদ্যায়ও তা সম্ভব নয়। সাধারণ ভারতবাসী হিসাবে তবু সে সমাজজিজ্ঞাসা আমাদের জাগে এবং সাধারণ বিচার-বুদ্ধিতে যেটুকু বুঝতে পারি, তা-ই সামনে তুলে ধরছি। অজস্র তথ্য তার বাইরে রয়ে গেল—সূক্ষ্ম স্থূল বহুবিধ সেসব তত্ত্ব উল্লেখের স্থান নেই। সে সব কারও পক্ষেই পুরোপুরি হিসাব করা সম্ভব হবে না, তা জানার কথা।

প্রাগ্-ইতিহাসকাল বা প্রি-হিস্টোরিক কাল ছাড়িয়ে প্রায়-ইতিহাস বা প্রোটো-হিস্টোরিক কালে এসে আমরা হরপ্পা-মোহেনজো-দড়োর সভ্যতার যুগে পেঁছিই। কমপক্ষে তিন হাজার বছর পূর্বে দেখা দেয় প্রাচীন ভারতীয় সমাজ। সাধারণত তা স্থিতিশীল; তার সেই অপরিবর্তনীয়তা সত্ত্বেও বিরাট উপমহাদেশের দেশে দেশে তা বদলেছে, কালে কালে তা আরও বদলেছে; আর্থিক সামাজিক কত স্তরের কত ধারার মানুষ নিয়ে এ সমাজ—কত জাতি, কত গোষ্ঠী, কত নীতি, কত রীতি, কত আচার, কত বিচার, কত ব্যতিক্রম, কত ব্যতিক্রমের ব্যতিক্রম, কত কঠিন বাস্তব সত্যের স্বীকৃতি, আবার কত সহজ সত্যেরও অস্বীকৃতি!—ভারতীয় সমাজ তো এক প্রাচীন বিপুল অরণ্যানী: স্ববিরোধী সহস্র তথ্যের জঙ্গল। কিন্তু সেই অগণিত বৃক্ষলতাগুল্মের মধ্যে পথ না হারিয়ে একবারের মতো এখানে আমাদের এই অরণ্যানীর সাধারণ সামগ্রিক রূপটাই ধ্যেয় আর তাই স্মরণীয়।

ভারত-সমাজের অবলম্বন

ভারতীয় সমাজের গঠন ও বিকাশের বা বহমানতার পক্ষে স্থির ও স্থায়ী অবলম্বন ছিল কী? সামান্যতম কী আর্থিক ব্যবস্থা, সমাজগঠনের কী মূল রূপ, কী ভাবগত

ধারণা ? অর্থাৎ ইকনমিক্ ব্যবস্হা, সমাজের স্ট্রাক্চার, ও ভাবাদর্শ বা ইডিয়লজি—সংক্ষেপে তাই সমাজের সমাজধর্মের অবলম্বন ও আশ্রয় (কম্পোনেন্টস্)।*

সহজ কথাটা স্বীকার্য—এই উপমহাদেশে যে সমাজ গড়ে উঠেছে তা জাতি-উপজাতি ও নানা মানবগোষ্ঠীকে আপনার মধ্যে ধারণ করতে চেষ্টা করেছে। তার চরিত্র হচ্ছে কম্পোজিট্—সম্মিলিত একটা জীবনধারা। সকলকে মিলিয়ে দিতে না পারুক, যথাসম্ভব মেলাতে চেয়েছে। তাতে এই সমাজের মধ্যে সভ্যতার নানা স্তরের মানুষও স্হান পেয়েছে, থেকে গিয়েছে। প্রায় আদিম স্তরের সংস্কৃতি থেকে যথেষ্ট সমুন্নত স্তরের সভ্যতার নিদর্শন এ সমাজে পাশাপাশি টিকে রয়েছে। অবস্হাবিশেষে স্তর ছাড়িয়ে স্তরান্তরে যে তারা উঠত এমন নিদর্শনও এখানে ওখানে পাওয়া যায়। তথাপি সাধারণ সত্যতা এই—এই সমাজের বিধৃত সভ্যতা অনেকটা স্হির সভ্যতা—স্হিতিকামী সংস্কৃতি (স্টেব্ল্ কালচার্),—পরিবর্তনকামী নয় ; কিন্তু একেবারে স্হাণু বা অচলও নয়। সুপ্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগের শেষ অবধি ভারতীয় সমাজের এই চরিত্র প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। কারণ, দেখি তার মূল আশ্রয় বা অবলম্বন প্রায় অব্যাহত ছিল। যথা :

১। ভারতীয় সমাজের আর্থিক জীবন ছিল প্রধানত কৃষিনির্ভর। চাষের উপকরণ (হাল, গোরু, কোদালি প্রভৃতি) আদিম কৃষি-উপকরণের প্রায় কোনো উন্নতিই সাধিত হয়নি—উৎপাদনবৃদ্ধির তাগিদ ছিল না বলেই নামমাত্র যত্নে উৎপাদন যা তা যথেষ্ট হত। এই অনুন্নত কৃষিসমাজের প্রয়োজনীয় শিল্প-উৎপাদনও ছিল তদনুরূপ—কারিগরি যন্ত্রপাতির উন্নতি নিষ্প্রয়োজন। বিশেষ কারণে আদর ছিল সূক্ষ্ম কাজের, এবং সেই কারুকর্মে লোকসমাজের সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

২। সমাজবিন্যাসের দিক থেকে ভারতীয় সমাজ ছিল (ক) এক চাপের কতকগুলি গ্রামের যোগাযোগে গঠিত স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লিসমাজ (সেল্ফ্-সাফিসিয়েণ্ট ভিলেজ্ কমিউনিটি) ; তারা পরস্পরের প্রয়োজন মেটাত—উৎপন্নের বণ্টন-বিনিময় হয়ে যেত পরস্পরের মধ্যে। অবশ্য শহর না ছিল তা নয়, কিন্তু বিপুল দেশে তা সংখ্যায় স্বল্প ; শহরের প্রয়োজনে বিলাসদ্রব্য উৎপন্ন হত, তা নিয়ে সার্থবাহদল বাণিজ্যে যেত—তাও সুবিদিত। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আর্থিক বিন্যাসে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লিসমাজের ও কৃষিসমাজেরই অব্যাহত প্রাধান্য।

(খ) সমাজশাসনের দিক থেকে তার বর্ণাশ্রমমূলক গঠন—চাতুর্বর্ণ্যবিধৃত শাসন-

* এ বিষয় অন্যত্র ইংরেজীতে আলোচিত হ'য়েছে। দ্রষ্টব্য : **Cultural Confusion of Modern India, Visva Bharati Quarterly, 1971.**

পালনব্যবস্থা ; বর্ণবহির্ভূত গোষ্ঠীদের ('পঞ্চমা') সমাজে স্থান ও অধিকার নেই। অবশ্য দ্রাবিড় দেশে ছাড়া ভারতীয় সমাজ সাধারণত পিতৃতান্ত্রিক, সমগ্র নারীজাতিই সে সমাজে প্রায় অধিকারহীন।

(গ) কিন্তু ভারতীয় সমাজগঠনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—কাস্ট, জন্মগত জাতিভেদ। প্রাচীন অন্য সমাজেও কাস্ট কিছু কিছু না দেখা যায়, তা নয়। কিন্তু ভারতবর্ষে তা যেইরূপ গ্রহণ করেছে পৃথিবীর অন্য কোনো সমাজে তার তুলনা পাওয়া যায় না। শ্রমবিভাগকে অবলম্বন করে বর্ণবিভাগ, সম্ভবত প্রথমে তা যুক্তি-যুক্তই ছিল। ক্রমে বর্ণাশ্রমের বিধান ছাড়িয়ে ভারতীয় সমাজে যে রকম জাতিভেদ বা কাস্ট্ অ্যাজ্ অ্যান্ ইন্স্টিটিউশন্ গড়ে উঠল, তা একেবারে অভিনব। তার আওতাতেই সমাজজীবন পাক খেয়ে চলতে থাকে। অবশ্য এই জাতির (কাস্ট-এর) বাঁধনে বিভিন্ন শ্রেণীকে এ সমাজ একভাবে একত্র বাঁধতে পেরেছিল, তা সত্য। এবং ছোট ছোট দুর্বল কাস্টগুলি নিজ নিজ জাত-পঞ্চায়েতের তাঁবে কর্মক্ষেত্রে কিছুটা বৃত্তিগত ও আর্থিক সহায়তাও লাভ করত—কাস্ট তাদের পালনও করত—এটি একটি বড় কথা।

৩। ভাবগত ধ্যানধারণায় ভারতীয় সমাজধর্মের প্রধান কথা—পুনর্জন্ম ও কর্মবাদ। ভারতীয় দর্শনের এটি এক স্বীকৃত সত্য ও ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনায়ও এটি গোড়ার তত্ত্ব। সমাজ-জীবনে এর ফলাফল দুর্বোধ্য নয়। একজন্মের ফল শুধু আরেক জন্মে বর্তায়, এমন নয় ; জন্ম-জন্মান্তরেও বর্তায় ; এবং সমাজের যেই স্তরে যে জন্মেছে, জন্মেছে পূর্বজন্মের কর্মফলে। এ জন্মে তদনুযায়ী তার যা বিহিত বর্তব্য তা সমাজ-নির্দিষ্ট ; তা পালন করেই কর্মক্ষয় করতে হবে, নতুন জন্মের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করতে হবে। জন্মগত এই স্তর বা অবস্থা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করা শুধু পাপ নয়, নিজের ভবিষ্যৎ জন্মেরও সর্বনাশ করা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—যে যেভাবে জন্মেছ তাই থাকো. না হলে তোমার সর্বনাশ।—এমন নীতিতে ব্যক্তির কোনো মূল্য নেই ; উদ্যোগ, পুরুষকার, আয়োজন,—সবই গৌণ। মানুষের নিজ শক্তি, আশা, স্বাধীনতা, আত্ম-প্রকাশের সকল প্রেরণাকে এভাবে চিরদিনের মতো বাতিল করে ভারতীয় সমাজ চিরস্থায়ী হতে চেয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে তার প্রধান অস্ত্র, জন্মান্তর ও কর্মবাদের ধারণা। সত্য বটে মুসলমান ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম আমাদের ভারতীয় মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের এ শিক্ষা দেয়নি। সেসব ধর্ম অনুযায়ী তাদের আইনকানুনে (পার্সনাল ল) পার্থক্য ছিল। কিন্তু সাধারণ গ্রাম্য মুসলমান পীরপূজা, মোল্লার শাসন ও—'কর্মবাদ' না হোক—'অদৃষ্টবাদে'র ধারণার বশে যে জীবন যাপন করত তাতে ভারতীয় মুসলমান সমাজেও জাতিভেদ ও উদ্যোগহীনতা প্রবল ছিল।

সমাজের স্থায়িত্ব ও স্থাণুত্ব

গোঁড়ামি না করে বলা যায়—পুরুষপরম্পরায় ভারতীয় সমাজ মোটামুটি এই অবস্থা ও ধারণাকে অবলম্বন করেই চলে আসছিল। পরিবর্তন হয়নি, তা নয় ; রাজা-রাজবংশের পতন হয়েছে, নতুন অধ্যাত্মধারণা ('ধর্ম') ও ধর্মমণ্ডলী উদ্‌ভূত হয়েছে, বিলুপ্ত হয়েছে। নতুন শাস্ত্র লেখা হয়েছে, নতুন বিধি প্রণীত হয়েছে ; ভাবনা-ধারণাও বদলেছে ; সূত্র, ভাষ্য, টীকা, খণ্ডনমণ্ডনের আবর্তে দর্শনেও কত বাদ-উপবাদ দেখা দিয়েছে। কিন্তু, আর্থিক জীবনে—উৎপাদনের ব্যবস্থায়—কোনো মৌলিক পরিবর্তন আসেনি—সেই আদ্যিকালের লাঙল ও বলদ ও প্রাথমিক চাষবাসের সেই হাতিয়ার নিয়েই কৃষিকর্ম চলেছে। এককালের বর্ণভেদ নানা রকমের জাতির জঙ্গল বাড়িয়ে অনড়, অচল এক জন্মগত জাতিপ্রথায় (কাস্ট্‌-এ) নিশ্চল হতে চেয়েছে। সামাজিক-উপযোগিতামূলক কায়িক পরিশ্রমকে হেয় করে সমাজের নিষ্কর্মা শ্রেষ্ঠ বর্ণেরা (ব্রাহ্মণাদি) ক্রমেই অবাস্তব ধ্যান-ধারণায়-ভাবনায়-কল্পনায় জমে বসেছে, মেতে উঠেছে ; 'তোট তোট তোটয়' প্রভৃতি আবৃত্তি করে তৈলাধার পাত্র ও পাত্রাধার তৈল নিয়ে গবেষণা চালিয়েছে ; জীবনের সহজ সত্যকে সেই অলীক উল্লাসে নস্যাৎ করতে পেরে কৃতার্থ হয়েছে ; নিষ্ফলা যুক্তি ও অকাজের বুদ্ধির খেলায় এত দূর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে উঠতে পেরেছে যে নৈয়ায়িকের সে কৃতিত্বে এ যুগের লজিকাল পজিটিভিস্ট্‌রাও চমৎকৃত। ঘরে এদিকে অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, জীবনযাত্রার কোনো উন্নতি ঘটছে না, 'সচ্ছন্দ বনজাত শাক' আর নরুনের ফলার মতো লাঙলের ফলায় যা উৎপন্ন হয়, তাই সম্বল। তথাপি গুপ্তযুগের থেকে এক ধরনের সামন্তব্যবস্থা এ সমাজে দেখা দিতে থাকে, শিথিল মন্দ তার গতি। মুসলিম বিজেতাদের ব্যবস্থায় সেই সামন্তব্যবস্থার এক ধরনের বিকাশও হল—সমুদ্র-উপকূলের শহরে বন্দরে সওদাগর-বণিকরাও কিছুটা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, কিন্তু জাতের বাধা, যন্ত্রপাতির নিতান্ত হীন অবস্থা, এসবের জন্য সেই দেশী সওদাগর-বণিকরা সামাজিক বাধাবিঘ্ন সরিয়ে উৎপাদন-ব্যবস্থায় সাহস করে এগিয়ে যেতে চায়নি। তাই দেখতে না-দেখতে আর্মানি, ওলন্দাজ, ফিরিঙ্গি বণিকেরা উদ্যোগী হয়ে ভারতীয় বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রাধান্যলাভ করতে লাগল—আর যুগ-যুগান্তের কর্মবাদে দেশীয় সকল শ্রেণীর মতো বণিকেরাও হয়ে রইল অন্তরে-অন্তরে সংকুচিত, বাইরেও কর্মকুণ্ঠ ; উদ্যোগহীন। ভারতীয় সমাজপদ্ধতি সকল রকমেই অতীতে আবদ্ধ হয়ে রইল—অথচ আধুনিক যুগ য়ুরোপে উদ্‌ভূত ও প্রসারিত হয়ে সাতসমুদ্র পেরিয়ে এদেশে এসে তখন তার অচলায়তনের দুয়ার ভেঙে চুরমার করতে শুরু করেছে।

ইতিহাসের নতুন শক্তি

এই পাশ্চাত্ত্য বিজেতারা মধ্যযুগের বা আরও পূর্ববর্তী রূঢ় আমলের বিজেতা নয়। তারা আধুনিক জীবনযাত্রা, জীবনদৃষ্টি, তার বাস্তব নিত্য-উন্নত উপকরণ ও আর্থিক পদ্ধতির অধিকারী।—প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতীয় সমাজের সাধ্য কি তাদের প্রতিরোধ করে! একমাত্র ভরসা ছিল মার খেয়ে-খেয়ে, মরে-মরে বেঁচে থাকবে। কিন্তু দেখা গেল—সে আশাও মূঢ়তা। ফিরিঙ্গি বণিকেরা হাটে গঞ্জে রূপার মুদ্রায় উৎপন্ন বস্তু কিনে দেশে 'মানি ইকোনমি'র সূত্রপাত করলে, আত্মনির্ভর পল্লিসমাজ ও পল্লি-ইকোনমি তাতে চিড় খেয়ে গেল। কুঠীর বণিকেরা জুলুম জবরদস্তি করে উৎপাদন-বণ্টনের তথা আমদানি-রপ্তানির কর্তা হয়ে উঠল; তারপর রাষ্ট্রশক্তি হাত করতে না-করতে ভারতীয় সমাজের হাজার হাজার বৎসরের সেই মূল আর্থিক অবলম্বনই উৎখাত করতে লাগল। পলাশীর লুঠে নবাব, আমীর-ওমরাহ, শহরের সম্ভ্রান্ত বণিক, মহাজন শুধু ধন ও কর্তৃত্ব খোয়াল না, পলাশীর পরে গ্রামের তাঁতী কারিগর সকলেই সর্বস্বান্ত হতে চলল। এ কথা আজ আর বুঝিয়ে বলতে হয় না— ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনে দেশের কী অবস্থা হল, বিদেশীদের কত দালালগোষ্ঠী সৃষ্টি হল, আবার ১৭৯৩-এর পর থেকে কেমন করে কর্নওয়ালিসী ব্যবস্থায় 'জমিদারি-প্রথা' প্রবর্তিত হল,—ইংরেজবণিকের ছোট তরফ হয়ে যে দেওয়ান-বেনিয়ানরা বাণিজ্যে ঝুঁকেছিল তারা বিলিতী বণিকদের এজেন্সী থেকে এখন সম্পূর্ণ বঞ্চিত হল; পরিবর্তে পেল জমিদারি করবার গৌরব, আর কোম্পানীর কাগজে টাকা লগ্নির সুযোগ। বাণিজ্যিক বা আর্থিক উদ্যোগ-আয়োজনে ধনবানদেরও পথ রইল না। অন্যদিকে কৃষক-প্রজাদের জমির উপর কোনো অধিকার না থাকাতে পচধরা এই জমিদারি-নামক আধা-সামন্ততন্ত্র সমাজে পাকা হয়ে রইল। ইংরেজ শাসনে তবু কিন্তু যা ঘটল তা স্পষ্ট— আধুনিক সভ্যতার ঘাতপ্রতিঘাতে ভারতীয় সমাজের আর নিশ্চল থাকবার উপায় রইল না—কলকাতায় ও তার কাছাকাছি ইংরেজ কেন্দ্রে চক্ষের উপর তারা দেখতে পেল আধুনিক সভ্যতার দুর্জয় রূপ—রাষ্ট্রে, বাণিজ্যে, লুণ্ঠনে, বেপরোয়া শক্তিমান শাসক পুরুষদের দৃপ্ত আবির্ভাব—কী তাদের যুদ্ধশক্তি, সংগঠনশক্তি, নির্মম-কর্মশক্তি, দানবীয় ক্রূরতা-খলতা, এবং সেই সঙ্গেই সৃষ্টিশক্তি, জ্ঞানের পিপাসা : এ দেশের ভাষা, এ দেশের সভ্যতাকে বুঝবার, জানবার, আয়ত্ত করবার অভাবনীয় বহুধাবিস্তৃত সংকল্প।

অব্যবহিত পরিপ্রেক্ষিত

ইতিহাসের এই আধুনিক প্রতিনিধিরাই আবার ইতিহাসের সৃষ্টিমুখী নতুন শক্তির বাহন—নিজেদেরই স্বার্থে ভারতীয় সমাজকে টেনে-হিঁচড়ে এই আধুনিকতার

পথে না দাঁড় করিয়ে তারা পারেনি। মোটামুটি খ্রীষ্টাব্দ ১৭৬৫ থেকে ১৮০০ বা ১৮১৭ পর্যন্ত কালের মধ্যে যা ঘটছিল—আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সেই প্রেক্ষাপটের আভাস দিয়েছি। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের (১৮২০) পূর্বেই বাঙালীর দিক থেকেও তার প্রস্তুতি-পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় ও রামমোহন রায়ের নানামুখী আয়োজনে—ইংরেজের নিজের বিবেচনাতেই সতীদাহ প্রভৃতি যে নির্মম সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে সংস্কার আয়োজন অনুস্যূত হয়েছিল, রামমোহনের নেতৃত্বে সে আন্দোলনে শক্তিসঞ্চার হয়; অপর দিকে রামমোহনের উপনিষদ অনুবাদে, বেদান্ত প্রকাশে, নানা ব্যাপারে পুস্তিকা রচনায়, ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, শিক্ষা-প্রবর্তন প্রভৃতি বহু প্রয়োজনবোধ শিক্ষিত গোষ্ঠীর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের সৌভাগ্য—কলকাতায় তিনি পড়বার জন্য এলেন, আর এলেন তখন যখন হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর পর্ব শুরু হয়েছে, সতীদাহ নিষিদ্ধ হয়েছে (১৮২৯), কলকাতার ভদ্রসমাজ টলটলায়মান—সকল রকম সংস্কারে ডিরোজিওর শিষ্যরা নিরঙ্কুশ। যেসব সমস্যা বিদ্যাসাগর বিশ বৎসর পরে কার্যপটু মানুষের মতো সমাধানে উদ্যোগী হন—তা নিয়ে 'আত্মীয়সভা'র আলোচনায় প্রশ্ন উঠেছে, ইয়ংবেঙ্গলের পত্রপত্রিকায়, 'তত্ত্ববোধিনী'রও সভ্যদের মধ্যে সেসব আলোচিত হচ্ছে। ইতিহাসের এই ঘটনাপঞ্জীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থপঞ্জী ও তাঁর জীবনী মিলিয়ে না পড়লে বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কারের স্থির তাৎপর্য অনুভব করা যায় না। প্র্যাক্টিক্যাল পুরুষ হিসাবে তিনি একদিকে নিজের কলম চালিয়ে প্রমাণ করতে অগ্রসর হয়েছেন তাঁর প্রস্তাবিত সংস্কার (বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহনিরোধ প্রভৃতি) শাস্ত্রসম্মত—এই উদ্দেশ্যে পুস্তক-পুস্তিকা রচনা ওপ্রচার করেছেন, প্রতিষ্ঠাপন্ন পণ্ডিত ও সমাজনেতাদের অনুমোদন সংগ্রহ করে সরকারের নিকট আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন, এবং নিজের একান্ত উদ্যোগে শাসকগোষ্ঠীকে সেরূপ সংস্কার সমর্থন করিয়ে আইন পাস করিয়েছেন। এই হল একদিক। তারপর আইন বিধিবদ্ধ হলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাজ হয়ে ওঠে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই নতুন বিধিকে কার্যকরী করে তা হিন্দুসমাজের দ্বারা সাধারণভাবে গ্রাহ্য করে তোলা। বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে এই শেষ কার্যে তিনি নামলেন—বিদ্যাসাগর-জীবনীর তা সর্বপ্রধান ঘটনা। বিধবাবিবাহ সাধারণভাবে হিন্দুসমাজে 'চল' করার এই বাস্তব চেষ্টা তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায়—একথা আবার উল্লেখ করা অন্যায় হবে না। কারণ, তাতেই বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্বের পরীক্ষা—তাতেই স্পষ্ট এ মানুষ শুধু করুণাসাগর নন, মানবতার বিগ্রহ।

সামাজিক রচনার সাধারণ পরিচয়

বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলন ও তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবনের

জন্য আমাদের প্রধান অবলম্বন তাঁর রচিত প্রবন্ধ, প্রচার পুস্তিকা এবং চিঠিপত্র। সেই সব রচনার একটা তালিকা নিচে দেওয়া হল (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দিষ্ট কালানুযায়ী)—

(১) বাল্যবিবাহের দোষ (১৮৫০)

(২) বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (জানুয়ারি, ১৮৫৫)

(৩) বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব—দ্বিতীয় পুস্তক (অক্টোবর, ১৮৫৫)

(৪) বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার (অগস্ট, ১৮৭১)

(৫) বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার—দ্বিতীয় পুস্তক (এপ্রিল, ১৮৭৩)

(৬) অতি অল্প হইল—কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত (মে, ১৮৭৩)

(৭) আবার অতি অল্প হইল—কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত (সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩)

(৮) ব্রজবিলাস—কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত (১৮৭৬, না, ১৮৮৪ [?])

(৯) বিধবাবিবাহ ও যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা বিষয়িণী—কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ (১৮৭৭, না, ১৮৮০) [?] ; ১৮৮৭ সনে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের নামকরণ হয় 'বিনয়পত্রিকা'।

(১০) রত্নপরীক্ষা—কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য প্রণীত (অগস্ট, ১৮৮৬)

এই দশখানি রচনা কখন কী অবস্থায় লিখিত বা প্রকাশিত হয়েছিল তা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত প্রত্যেকটি লেখার 'বিজ্ঞাপন' বা মুখবন্ধস্বরূপ লেখা-সমূহ থেকে জানা যায়।

এ লেখাগুলির মধ্যে সর্বাধিক সুপরিচিত অবশ্য বিধবাবিবাহসম্বন্ধীয় প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক, এবং বহুবিবাহনিবারণবিষয়ক প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব। "বাল্য-বিবাহের দোষ" 'সর্বশুভকরী'তে প্রকাশিত, লেখকের নাম ছিল না, কিন্তু তা যে বিদ্যাসাগরেরই রচনা তাতে সন্দেহ নেই। তালিকার ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ সংখ্যক পুস্তিকাগুলি বেনামী লেখা—'উপযুক্ত ভাইপো', 'উপযুক্ত ভাইপো-সহচর' প্রভৃতি মজার নামে ও 'তত্ত্বান্বেষী' নামে যে বিদ্যাসাগরই এগুলি লিখেছিলেন, একথা অবিসংবাদিত, সকলেই এবিষয়ে একমত, তাই সে প্রশ্ন তোলা এখন নিরর্থক। এসব লেখার রঙ্গব্যঙ্গের রীতিপদ্ধতি আর সুর দেখলে বোঝা যায়, কেন তা বেনামী রচনা। সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রচারপুস্তিকা সকল দেশেই একটা প্রধান অস্ত্র ; তাতে রঙ্গ ও

ব্যঙ্গের ব্যবহারও সর্বানুমোদিত। তার ব্যবহারে কৃপণ হলে চলে না, তাতে একটা মাত্রা অবশ্য গ্রাহ্য।

সমাজসংস্কারের আবহাওয়া

বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কারকর্মে অবতীর্ণ হবার পূর্বে ত্রিশ বৎসরের ঊর্ধ্বকাল ধরে বাঙলায় সংস্কার-আন্দোলনের পক্ষে ও বিপক্ষে পুস্তিকা-পত্রপত্রিকার প্রচার ও প্রকাশ অব্যাহত চলে আসছিল—রামমোহন রায় থেকেই তার সূচনা। বলা বাহুল্য, এ সংস্কারচেতনার উদ্ভব আমাদের সমাজে অনিবার্য ছিল,—আসলে সাড়ে তিন হাজার বছরের অচল সমাজে তা বহু বহু দিন পূর্বেই প্রয়োজনীয় ছিল, তথাপি ইংরেজ শাসনে ও ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার ঘাতপ্রতিঘাতে এখন এ সমাজ প্রথম সচকিত, জাগ্রত ও ক্রমে প্রবুদ্ধ হয়ে উঠল—অনেক দেরিতে, এক হিসাবে বড় দ্বিধাদ্বন্দ্বে প্রতিহত হয়ে তার যাত্রা।

সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে তাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্বেই সংস্কারের প্রয়োজন-বোধ দেশের শিক্ষিতদের মধ্যে জেগেছিল, সংস্কারের পক্ষে একটি আবহাওয়াও দেখা দিয়েছিল—ধর্মসংস্কারের, সমাজসংস্কারের, শিক্ষাসংস্কারের কয়েকটি প্রধান প্রয়াসও দেখা দেয়। ধর্মসংস্কারের প্রয়াসে রামমোহন রায়ের আত্মীয়সভা (১৮১৫) ও ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৯); সমাজসংস্কারে সতীদাহ নিবর্তক-প্রবর্তকের দুই পক্ষের নানা দিক থেকে তর্কবিতর্ক (১৮১৭—১৮২৯); শিক্ষাসংস্কারে ওকসিডেন্টালিস্ট বনাম ওরিয়েন্টালিস্টদের তর্ক (১৮২৩)—এসবের মুখ্য দৃষ্টান্ত। এর মধ্যে নানা কারণে সতীদাহই সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা সৃষ্টি করে। স্বভাবতই সতীদাহ নিষিদ্ধ করে শাসকশক্তি, আইনভঙ্গ হল দণ্ডনীয়। কাজেই সতীদাহের বিরোধিতায় আইন অমান্য গোঁড়াদের কাছে অভাবনীয়। কার্যত আস্ফালনও ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বোধ হয় তার একটা কারণ, ততক্ষণে (১৮২৯—১৮৩৯) ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহে ধর্মসভার ধর্মরক্ষীরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন এবং বুঝেছেন, ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও কুৎসা উদ্‌গিরণ করাটা বরং নিরাপদ, রাজদণ্ডের ভয় নেই। অন্যদিকে, ইয়ং বেঙ্গলের প্ল্যানপ্রোগ্রাম ছিল না। অবশ্য তাদের দৃষ্টি ব্যাপক ও সজীব ছিল; বিশেষত, রাজনৈতিক অন্যায়কেও তারা চুপ করে মানত না, তাদের বিশেষ বিরোধিতা ছিল সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে—'জ্ঞানান্বেষণ', 'বেঙ্গল সেক্‌টেটর' প্রভৃতি তাদের পত্রপত্রিকায় সংস্কার-আন্দোলনকে জিইয়ে রাখে। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯) ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪১) ইয়ং বেঙ্গলের উগ্রতাকে বর্জন করে সাধারণভাবে এই বিশ-ত্রিশ বৎসরের সংস্কারের আবহাওয়াকে আরও সবল করে তোলে। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি ছিলেন এ সভার সক্রিয় সদস্য।

'সর্বশুভকরী'তে "বাল্যবিবাহের দোষ" বিদ্যাসাগরের প্রথম সামাজিক লেখা। তা আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মূল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সেই লেখাতে পাওয়া যায়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ বিষয়ক পুস্তকও পুনর্মুদ্রিত হয় (১৭৭৬ ফাল্গুন)—সমাজসংস্কার আন্দোলনের পথে এই লেখাই নতুন এক পর্বের সূচনা করে। যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার এই পশ্চাৎপট জানাই এখানে প্রয়োজন—এ সময়ের ইতিহাসের গবেষকরা আজ তা নিজেদের পুস্তকে প্রবন্ধে নানাবিধ গল্প ও তথ্যপূর্ণ উদ্ধৃতি দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছেন (দ্রষ্টব্য, 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ', ১/৫, ৬; ২; 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর')।

বিধবাবিবাহ প্রভৃতি পুস্তকগুলির রচনার উপলক্ষ 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর ব্যক্ত করেছেন। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহবিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে কোথা থেকে প্রথম প্রেরণা লাভ করেন, এ বিষয়ে নানা গল্প প্রচলিত আছে—সেসব গল্প সম্পূর্ণ না হোক, মোটামুটি সত্য হতে পারে। বিধবার নিষ্ঠুর দুর্ভাগ্য তো এমন একটা বিরল ব্যাপার নয়। ভারতীয় সমাজে এমন কোন্ মানুষ জন্মেছে যার কাছে তা অগোচর? বিদ্যাসাগরের কি নিজের চোখ ছিল না, না, তিনি এসব বিষয়ে অনুভূতিহীন ছিলেন—যে কোনো একটি ঘটনায় হঠাৎ তাঁর প্রেরণা জেগেছিল? গতানুগতিকভাবে সেই দেশাচার হিন্দু শিষ্টসমাজ নিঃশব্দে মাথা পেতে নিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যগ্রস্ত আত্মীয়-পরিজনের মনে প্রশ্নটা কোনো সময়েই না জেগে পারেনি—'এর কি প্রতিকার নেই?' সতীদাহ বা সদ্যোবিধবাকে পুড়িয়ে মারা আকবরের নিকট অসহনীয় ঠেকেছিল। মধ্যযুগ শেষ হলে সতীদাহের সংখ্যা কমে; তার বিরুদ্ধে মনোভাবও প্রখর হয়। সতীদাহের বিকল্প ব্যবস্থা বিধবার আমরণ 'ব্রহ্মচর্য'। পুড়িয়ে মারার থেকে তা বেশি 'সভ্য' হলেও তা যে কিছুমাত্র কম যন্ত্রণাদায়ক নয়, একথাটাও লোকে বুঝত—অন্তত বিধবার নিকটতম আত্মীয়-পরিজনরা। আধুনিক একটু হাওয়া লাগতেই প্রাচীন ও মধ্যযুগের এই নিষ্ঠুর প্রথাকে মানুষ চাইত রহিত করতে। রাজা রাজবল্লভ সে চেষ্টা দেখেছিলেন, 'আত্মীয়সভা'য় বিধবার চিরব্রহ্মচর্যের বিরুদ্ধে আপত্তির সুর ওঠে (তখনও সতীদাহ বন্ধ হয়নি)। তারপরেই গোষ্ঠীবদ্ধভাবে ইয়ং বেঙ্গল তাদের পত্র-পত্রিকায় এ প্রথার বিরুদ্ধে লিখতে থাকে, আরও পত্রপত্রিকা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিও এ বিষয়ে সজাগ হয়েছিলেন - এসব কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সমাজে স্ত্রীলোকের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরও আবাল্য সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, নিঃসন্দেহ। বিধবাদের দুর্দশা অবসানের পথ তিনি নিজেও দূর করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন—খুঁজছিলেন শুধু উপযুক্ত কর্মকৌশল—যাতে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করে সমাজে প্রচলিত

করে তোলা যায়। এজন্য শাস্ত্রমন্থনে যে তিনি দিনরাত্রি ক্ষেপণ করেছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তা ছাড়া, যেসব কাহিনী-গল্প বলা হয়, সেসব ঘটনাও তাঁকে আরও বিচলিত ও কৃতসংকল্প করে থাকবে। বিশেষ করে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র বুঝলে মনে হয় মাতা ভগবতী দেবীর মর্মব্যথা ও পিতা ঠাকুরদাসের অনুমোদন ছিল তাঁর এ ব্যাপারে চরম কর্মপ্রেরণা। আর মূল প্রেরণা তাঁর মহাপ্রাণতা ও মানবিক চেতনা।

সমাজসংস্কারে বিদ্যাসাগরের কৌশল

এসব রচনাপাঠের ভূমিকা হিসাবে তথাপি কিছু জানা প্রয়োজন—কী আছে কোন্ পুস্তকে। পাঠকের একটু প্রস্তুতি দরকার। কারণ, বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তক দুখানি (বিশেষ করে দ্বিতীয় পুস্তক) সংস্কৃত শ্লোক ও শাস্ত্রবচন প্রভৃতির ব্যাখ্যায় আগাগোড়া সমাকীর্ণ। বহুবিবাহবিরোধী পুস্তক দুখানিও শাস্ত্রবিচারে ভরতি; সেই সঙ্গে বাঙালী ব্রাহ্মণদের কৌলীন্যবিষয়ক নানা তথ্য ও বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। এরূপ বই কোনো সময়েই সাধারণ পাঠকের পক্ষে দর্শনমাত্র আকর্ষণীয় হয় না। নিশ্চয়ই আমাদের কালের 'রম্য-রচনা'র রস তাতে থাকা অসম্ভব। সংস্কৃত শ্লোক দেখলেই আমরা অনেকেই ভীত হই। তারপরে, বিচারের যে পদ্ধতি বিদ্যাসাগর অনুসরণ করেছেন, তা হচ্ছে প্রাচীন পণ্ডিত-সমাজের গ্রাহ্য ও প্রচলিত পদ্ধতি—আমরা পূর্বে তার উল্লেখ করেছি। এ পদ্ধতি অবলম্বনের কারণ, রামমোহনের মতোই বিদ্যাসাগরও মনে করেছিলেন, পণ্ডিতদেরকে পণ্ডিতদের অস্ত্রেই নিরস্ত করতে হবে, শাস্ত্রের বিচারপদ্ধতিতেই, শাস্ত্রের বচনকে সংস্কার-সমর্থক বলে প্রমাণ করা সম্ভব হবে। বিদ্যাসাগর বুঝতেন, সমাজের ভদ্রশ্রেণী এ রীতিপদ্ধতিকে মান্য করে, এবং এই কৌশলে অগ্রসর হলে সংস্কারমূলক বিচারও ফলপ্রসূ হবে। বিদ্যাসাগরের মত বিচক্ষণ পণ্ডিতও এ বিষয়ে বেশি প্রত্যাশা করেছিলেন, তা তাঁর রচনাসমূহ থেকেই বোঝা যায়। কারণ, তিনি তো জানতেন হিন্দুর কী যে শাস্ত্র, আর কী যে শাস্ত্র নয়, তাও বলা কঠিন, আর হিন্দুশাস্ত্রে কী যে আছে, আর কী যে নেই, তাও নির্ণয় করা অসাধ্য। শাস্ত্রে পরস্পরবিরোধী মতের ও কথার অভাব নেই। কোন্ শাস্ত্র বড়, তার বচনের বিরোধ ঘটলে কীভাবে তার সংগতি করতে হবে, সে বিষয়ে নিয়মনির্দেশক শ্লোকের অভাব নেই, এবং সেসব শ্লোকেও যে শেষপর্যন্ত কিছুই লাভ হয় না, তাও জানা কথা। কারণ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দক্ষিণা পেলে হয়কে নয় করতে ও নয়কে হয় করতে পাদ্রী প্রভুদের থেকে কম পটু ছিলেন না। বাস্তব বুদ্ধিতে বেশ বোঝা যায়—এই হাজার হাজার যোজনের দেশে সর্বত্র এক অবস্থা ও এক ব্যবস্থা কোনোদিনই চিরস্থায়ী ছিল

না। শাস্ত্রে একটা আদর্শ বা শিষ্ট ব্যবস্থা উল্লেখ করে বলেছে—তাই সনাতন। অথচ ইতিহাসে দেখি—তার বিরোধী নানা তথ্য সঞ্চিত রয়েছে—সেসবকে একেবারে চাপা দেওয়া যায়নি। সেই বাস্তবের তাড়নায় এক-এক কালে এক-এক অঞ্চলে নতুন করে শাস্ত্র রচিত হয়েছে, টেনেটুনে পুরনোর ব্যাখ্যা করা চলেছে। তাতে গোলমালটা আরও জটিল হয়েছে। কাজেই স্থানিক বৈষম্য বা লোকাল বৈশিষ্ট্য সমাজে ছিল, জাতি-উপজাতিগত প্রথা-ব্যবহারের বৈষম্যও ছিল। শাস্ত্রে সেসব বলেও শেষ করতে পারেনি—সে চেষ্টাও করেনি। তারপর, একই অঞ্চল চিরকাল একই প্রথা ধরে বসে থাকেনি, তাও প্রত্যক্ষ। কোথা থেকে এল বাংলার কৌলীন্যপ্রথা? কোন্ শাস্ত্রমতে। কালে কালে নানা প্রথা-নিয়মের উদ্ভব হয়েছে, বিলোপ হয়েছে, অথবা তা অবজ্ঞাত হয়েছে। অতএব, শাস্ত্রবিচারে সংস্কারের যুক্তি দুর্লভ হয় না—কিছু না কিছু তার অনুমোদন কোনো না কোনো সংস্কৃত শ্লোকে মিলবে; এবং ব্যাখ্যা দ্বারাও তা মিলছে, দেখানো যায়। অন্যদিক থেকে তেমনি তা অসাধ্য—পরিস্থিতিটা যদি নতুন হয়, তাহলে তার বিচারবিবেচনা পূর্বকালে সম্ভব হবে কী করে? আর পরিস্থিতি যদি পুরাতন কালেরই জের হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধেও তো শাস্ত্রের বচনের অভাব হবে না। যাই হোক, ঐতিহাসিক সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিতে আমরা এখন যা সহজেই বুঝি তাতে এখন আর আমাদের নিকট মনু-পরাশর কেন, বেদ-উপনিষদও অভ্রান্ত নয়। স্মৃতির ব্যবস্থাবলী, পুরাণের প্রমাণাবলী, দেশাচার বা শিষ্টাচার যাই বলি—যুগের প্রয়োজন অনুসারেই তা গ্রহণীয় বা বর্জনীয়, এই আমরা বুঝি। এ যুগের প্রয়োজনের নিরিখ—যা বিদ্যাসাগর শিক্ষানীতির সম্পর্কে আভাসে উল্লেখ করেছেন তা—আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতার মাপকাঠি। যুগধর্মের তাই মূল বুনিয়াদ—বিজ্ঞানসম্মত মানববিদ্যা (সায়েন্টিফিক্ হিউম্যানিজ্‌ম্)। বিদ্যাসাগরের আমলে কথাটা চলিত হয়নি, কিন্তু বিদ্যাসাগরের চিন্তায় ও কর্মে তা অনুস্যূত হচ্ছিল। তবু বিদ্যাসাগরকে প্রকৃত সংস্কারকের মতো বিশেষ করে বুঝতে হয়েছে—তখনকার সমাজের অবস্থা; মনে রাখতে হয়েছে সমাজের প্রভাবশালী অংশের কথা। যেরূপ যুক্তি ও কর্মকৌশলে তাদের সংস্কারমুখী করে তোলা যায় সেরূপ প্রচার-পদ্ধতিই তাকে খুঁজতে হয়েছে। তাদের কাছে তো সদ্‌যুক্তি আসল কথা নয়, যা শাস্ত্রে আছে তাই ধর্ম, তাই যুক্তি। অতএব বিদ্যাসাগরের সংস্কারপদ্ধতি হল এই—"বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম, ইহার মীমাংসা করাই সর্বাগ্রে আবশ্যক"। প্রথমত শাস্ত্রবিচার, পণ্ডিতদের অনুমোদন; দ্বিতীয়ত, প্রভাবসম্পন্ন জমিদার, ধনী মানী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারা সেই শাস্ত্রানুমোদিত সংস্কারের সমর্থন সংগ্রহ, তারপর সরকারের নিকট আবেদনপত্র পেশ করা; এবং তৃতীয়ত,

সরকারকে আইন প্রণয়নে প্রভাবিত করা। বিদ্যাসাগরের সামাজিক রচনাগুলিতে এই কৌশলের প্রাথমিক অধ্যায় দেখতে পাই—ঐতিহ্যগত শাস্ত্রবিচার—শাস্ত্রবচনের ব্যাখ্যা, খণ্ডন, মণ্ডন, আপত্তিনিরসন, এমনকি কুতর্ক ও কূটতর্কের বিরুদ্ধেও যুক্তিতর্ক দিয়ে আলোচনা—সমাজকর্তাদের ধর্ম ও শাস্ত্রবিশ্বাসের দ্বারা সচেতন ও সক্রিয় করে তোলা।

বলাই বাহুল্য এ প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি - এত ব্যর্থ হবে তা বোধহয় বিদ্যাসাগরও বুঝতেন না, আর, এ ধরনের শাস্ত্রবিচার আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের আজ মনে হয় নিরর্থক—তা পাঠেও আমাদের উৎসাহ নেই। তবে বিদ্যাসাগরের যুক্তিধারাটা একবার কষ্ট করে অনুসরণ করলে তাতে এদিনেও কিছু ফললাভ হতে পারে—যেমন বুঝতে পারি সেদিনের বিচারপদ্ধতি কিরূপ ছিল—আমরা তাও প্রায় ভুলে গিয়েছি। বিদ্যাসাগর কী পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য ও সততার সঙ্গে শাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন—এসব গুণও আজ আমাদের বিদ্বানদের মধ্যে যথেষ্ট নয়। এবং নিজের বুদ্ধিকৌশলে কেমন করে তিনি চেয়েছেন প্রাক্তন সমাজচিন্তাকে যতটা সম্ভব যুগোচিত করে তুলতে, —দেখি একই সঙ্গে সদ্‌যুক্তির ও তর্কবুদ্ধির মিলন, আর বুঝি তখনকার অপরিণত বাংলাভাষাকে তিনি কতটা এই কাজে কার্যকরী করে তুলতে পেরেছেন। সাধারণ পাঠককে পুস্তকগুলির মূল যুক্তিধারার খেই ধরিয়ে দেওয়া তাই আবশ্যক। কারণ, একবার তাতে প্রবেশ করলে পাঠক নিজেরাই পড়ে উপকৃত হবেন।

বিধবাবিবাহবিষয়ক রচনা

বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবটিতে আলোচনা জটিল নয়—রচনাটি ছোট পুস্তিকা। প্রথমেই তাতে বলা হয়েছে—শাস্ত্র অনেক, তার মধ্যে কোন্ শাস্ত্র গ্রাহ্য, আর তার বক্তব্যের সদর্থ কী। নারদ, বৌধায়ন প্রভৃতির ধর্মশাস্ত্র ও মনু, পরাশর প্রভৃতিরও স্মৃতিশাস্ত্র প্রধান। কিন্তু এযুগ শাস্ত্রমতে কলিযুগ। সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে মনু-সংহিতা ছিল প্রযোজ্য শাস্ত্র; কলিযুগের মানুষের ক্ষমতা কম—তাই কলিযুগের জন্য প্রযোজ্য পরাশরসংহিতা। "ভগবান্ পরাশর যে সমস্ত ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন, কলি-যুগের লোকদিগকে সেই সকল ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক।" তাহলে যুগ অনুসারে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানও পরিবর্তনীয়? সেই পরাশরসংহিতায় বিধবাদের সম্বন্ধে তিনটি শ্লোক দেখা যায়। তার মধ্যে প্রধানটি 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥' যার অর্থ—"স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।" শ্লোকটির অর্থ পরিষ্কার। এইটিই

বিধবাবিবাহের সপক্ষে মুখ্য শাস্ত্রীয় বচন। অবশ্য, এ শ্লোকের পরের শ্লোকটিতে বলা আছে—বিধবা হবার পর ব্রহ্মচারিণী হয়ে থাকলে সে নারী স্বর্গে যাবে। এবং তৃতীয় শ্লোকটিতে বলা আছে, যে নারী সহমরণে যাবে তার স্বর্গবাস মনুষ্যদেহে যত লোম আছে, ততকাল—সাড়ে তিন কোটি বৎসর। সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝতে পারি—পরাশর বলছেন : বিধবার সহমরণই শ্রেষ্ঠ কর্ম, ব্রহ্মচর্যও পুণ্যকর্ম, তবে কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় বিধবার পুনর্বিবাহও শাস্ত্রবিহিত। এই শেষ বক্তব্যও পরিষ্কার। তাই বলে সেই বিশেষ বক্তব্যটি বাতিল করার জন্য কূটতর্কের অভাব হবে কেন ? বিদ্যাসাগর সেসব নিরস্ত করতে চান, দেখান—পরাশরসংহিতাই মান্য আর তার এই বচনের অন্য কোনোরূপ অর্থ হয় না। সমর্থনে বিদ্যাসাগর দেখালেন—পূর্ব পূর্ব যুগে বিবাহিত বিধবার পুত্রদের বলা হত, 'পৌনর্ভব',—মনুতে বলা হয়েছে। কিন্তু পরাশর পুনর্বিবাহিত বিধবার পুত্রকে পৌনর্ভব বলেননি। অর্থাৎ পরাশরস্মৃতির মতে কলিযুগে সে পুত্র পিতার ঔরসজাত বৈধ পুত্র বলেই গণ্য—পিতৃসম্পত্তিতেও সম্পূর্ণ অধিকারী। এর পরে অবশ্য তর্ক থাকে—পুরাণে বিধবাবিবাহেরও নিষেধ আছে। কিংবা বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসংগত হলেও শিষ্টাচারসম্মত নয়। বিদ্যাসাগর দেখালেন, পুরাণের থেকে স্মৃতিশাস্ত্রের মত বেশি গ্রাহ্য। আর, শিষ্টাচারের শরণ নিতে হয় তখন, যখন শাস্ত্রে কোনো বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে উল্লেখ পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে সেসব কোনোটাই খাটে না। কারণ, উল্লেখ যথেষ্ট আছে। বিশেষ করে শিষ্টাচারের কথা তোলা তো একেবারেই অযৌক্তিক। বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত হওয়ায় সমাজে যে নানা পাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, বিবাহ ছাড়া তার নিরাকরণের আর কোনো উপায় নেই। বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তার যুক্তি দেখিয়ে বিদ্যাসাগর বিনয়বাক্যে সুবিচার প্রার্থনা করলেন।

ফল কী ফললো, আমরা জানি—দেশব্যাপী তুমুল আলোড়ন, আর বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব ও পাণ্ডিত্য, প্রমাণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে নানা কুযুক্তি আর অজস্র কটূক্তি বর্ষিত হল—রামমোহনের ভাগ্যে যা জুটেছিল এসব তার চেয়ে কম নয়।

দ্বিতীয় পুস্তক, বড় পুস্তক—সকল যুক্তিতর্কের, শাস্ত্রের কূটতার্কিকতার বিরুদ্ধে উত্তর, প্রতিপক্ষের বক্তব্য খণ্ডন, নিজের বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা, নৈয়ায়িকসুলভ বিচারপদ্ধতির সহায়ে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানসম্মত সদযুক্তি প্রতিষ্ঠা, আর পরিশেষে আহতহৃদয় পুরুষসিংহের এদেশীয় মন্দভাগ্য মূক স্ত্রীজাতির জন্য বেদনাবিধুর দীর্ঘশ্বাস। পুস্তকের মুখবন্ধে বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন, যে তুমুল তর্ক ও কুৎসার ঝড় উঠেছে তাতে তিনি বুঝেছেন, "উৎসাহবাক্য ও কটূক্তি প্রয়োগ করা এদেশের বিজ্ঞের লক্ষণ।" বিদ্যাসাগর সেদিকে যাবেন না। (ব্যঙ্গে বিদ্যাসাগরের কী অব্যর্থ হাত ছিল তা পরে বহুবিবাহবিরোধী বেনামী পুস্তিকায় তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু এখানে তিনি বোধ

হয় মনে করেছিলেন—সমাজসংস্কারের মুগুর ছাড়াও জীববিশেষকে কথা শোনানো যায়।) বিদ্যাসাগর একটির পর একটি প্রসঙ্গ নিয়ে দ্বিতীয় পুস্তকে বিপক্ষের আপত্তি খণ্ডন করতে অগ্রসর হলেন। প্রথম আপত্তি—পরাশরের শ্লোকটা বিধবার বিষয়ে নয়, বাগদত্তা কন্যার জন্য। (পরেও কেউ কেউ এ ওজর তুলতে ছাড়েন না। দিনের আলোকে মিথ্যা বোঝাতে হলে এরকম ঠুলিই মানুষের চোখে পরাতে হয়।) বিদ্যাসাগর দেখালেন—তা নয়, পরাশরের ভাষ্যে বিবাহিতা কন্যার পুনর্বিবাহের কথাই বলা হয়েছে। "এই নিমিত্ত, ভাষ্যকার মাধবাচার্য, বিধবাবিবাহের বিদ্বেষী হইয়াও, পরাশর বচনকে বিধবাদি বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহবিধায়ক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।"—(বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮)। বহু রকমের যুক্তি তিনি এইজন্য দিলেন। আবার তর্ক—মনুর থেকে পরাশর বড় নন। মনু ও পরাশরের মতের মিল না ঘটলে মনুর কথাই মান্য। বিদ্যাসাগর দেখালেন—পরাশরবচন কলিযুগে প্রযোজ্য বিশিষ্ট ব্যবস্থা। শাস্ত্রেই বলা হয়েছে, মনুর নিয়ম কলিযুগে সব বিষয়ে চলবে না বলেই পরাশরের বচনই কলিযুগে বিশেষ করে মান্য। মাধবাচার্য আদি-পুরাণের দোহাই দিয়ে এই মত অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু মাধবাচার্যের মতের বিরোধীও অনেকে (দ্রষ্টব্য পৃঃ ৫৭)। তাছাড়া, মনুর আরও অনেক নিয়মও তো এখন সমাজে চলে না (দ্রষ্টব্য পৃঃ ৫৯)।

যথা, মনুর মতে—ত্রিশ বৎসরের পুরুষ বিবাহ করবে বারো বৎসরের কন্যা, চব্বিশ বৎসরের পুরুষ আট বৎসরের কন্যা; না হলেই ধর্মভ্রষ্ট হতে হবে। অন্য শাস্ত্রকারদের কারও কারও তা মত নয়। আর কার্যক্ষেত্রে মনুর এই নির্দেশমতো সমাজে বিবাহ হয় না। এরূপই, মনু পুত্রপ্রকরণে (সম্পত্তির উত্তরাধিকারবিষয়ে) ঔরসপুত্র, ক্ষেত্রজ-পুত্র, দত্তকপুত্র প্রভৃতির যা ভাগ বলেছেন তাও কাত্যায়ন বলেন না। এবং মনুর সম্পত্তিবণ্টনের মতও সমাজে এখন চলে না। মনু সত্যযুগের জন্য, কলিযুগের জন্য পরাশর—এই কথা তাতেও বোঝা যায়। এই সঙ্গে বিদ্যাসাগর আরেকটি বিষয়ও আবার জানিয়েছেন—মনুও পুনর্বিবাহিতা বিধবাকে বলেছেন পুনর্ভূ, তার পুত্রকে 'পৌনর্ভব'; এরূপ অন্যান্য শাস্ত্রকাররাও পুনর্ভূর উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ বিধবাদেরও কোনো কোনো বিশেষ অবস্থায় পুনর্বার বিবাহসংস্কার মনু প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন; তাদের সন্তানদের (পৌনর্ভবদের) নিকৃষ্ট বলেননি—মর্যাদায় ন্যূন বলেছেন। পরাশর কিন্তু এরূপ স্ত্রীকে 'পুনর্ভূ' বলেননি, তাদের সন্তানদের 'পৌনর্ভব'ও বলেননি।—বোঝা যায় পরাশরের মতে তারা অন্যান্য স্ত্রীর মতোই স্ত্রী, আর পুত্ররাও পিতার যথারীতি ঔরস পুত্র। এমন কি, পরাশরের ঐ আলোচিত শ্লোকটিও মনুবচন বলেও উদ্ধৃত হয়, তাও দেখা যায়। "স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ

করিবার বিধি কেবল পরাশরের বিধি নহে, মনুরও বিধি হইতেছে। এই নিমিত্তই মাধবাচার্যও পরাশর ভাষ্যে নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনকে মনুবচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। ...অতএব, বিধবার বিবাহ, মনুর মতের বিরুদ্ধ না হইয়া, মনুর মতের অনুযায়ীই হইতেছে" (বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭)।

বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধপক্ষ আরও তর্ক তোলে—বিদ্যাসাগর পরাশর প্রভৃতির নামে যেসব শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন তা পরাশর প্রভৃতির নয়। যার যেমন অভীষ্ট সে তেমন যুক্তিও উদ্ভাবনা করে। তবু বিদ্যাসাগরও তা খণ্ডন করতে অবজ্ঞা করেন নি। তিনি দেখিয়েছেন, পরাশরের বচন কৃত্রিম নয় (ঐ, পৃঃ ৮৩)। প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাসাগর শালীনতা ও অনুভূতির সঙ্গেই বিচার করেছেন, পতিপত্নীর মধ্যে এক-জনের বিয়োগে অপরের শোক ও বেদনা স্বাভাবিক, বিবাহের অধিকার থাকলেও পুনর্বিবাহের সম্ভাবনায় কোনো পক্ষই সেই শোককে লঘু করতে বা উড়িয়ে দিতে পারে না। বিদ্যাসাগর পরাশরবচনের বিরুদ্ধে যত রকমের আপত্তি সব খন্ডন করে সেই পরাশরবচন প্রতিষ্ঠা করে চললেন। যথা, পরাশরবচন বিধবাবিবাহবিধায়ক (ঐ, পৃঃ ৮৭); মহাভারতে দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপন ('নারীর একপতি হইবেক', আদিপর্ব, ১২২ অধ্যায়) বা শ্বেতকেতুর বিধান (পতিপত্নীর পরস্পরকে অতিক্রম মহাপাতক। ঐ)—প্রভৃতি কলিযুগে বিধবাবিবাহের নিষেধবোধক নয় (ঐ, পৃঃ ৯০)। 'বৃহৎপরাশরসংহিতা' নামক গ্রন্থে বিধবাবিবাহ দোষাবহ বলে যা বলা হয়েছে তাতে বড়জোর এই প্রমাণ হয়—বিধবাবিবাহ (পরাশর মতে) বিহিত, তবে দোষাবহ। আসলে এই 'বৃহৎ' সংহিতাটি পরাশরেরই রচনা নয় (ঐ, পৃঃ ৯৭-১০৫), ইত্যাদি, ইত্যাদি। ২৪টি অধ্যায়ে চলেছে এভাবে নানা শাস্ত্রবচন ও কূটতর্কের উত্তর, শাস্ত্র দিয়ে সদযুক্তির সাহায্যে শাস্ত্রবিরোধী বচন খণ্ডন।

এসব সূত্রে প্রাচীন সমাজের নানা তথ্য জানা যায়, এবং তাদের বিচারপদ্ধতি একদিকে কত সূক্ষ্ম, অন্যদিকে জীবন সম্বন্ধে কত অন্ধ, তাও দেখা যায়। আবার দেখি, কী তুচ্ছ বা ভুয়ো বিষয় নিয়েই না প্রাচীন সমাজকর্তাদের মাথাব্যথা। এসব পড়ে বিদ্যাসাগর যাদের বলেছেন 'টিকিদাস ভট্টাচার্য' তাদের মনবুদ্ধিরও স্বরূপ দেখতে পাই। দেখি, ১৮৫০-এর সময়েও ভারতীয় সমাজ কী ভাবে 'অচলায়তন' আঁকড়ে থাকতে চাইছে। বুঝি, বিদ্যাসাগরের সংস্কারচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রধান বাধা ধর্ম নয়, শাস্ত্র নয়, দেশাচার।

বিদ্যাসাগরও তা জানেন। 'উপসংহারে' বিদ্যাসাগরের মুখে তাই আর্তধ্বনি শুনি—"ধন্য রে দেশাচার ! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা ! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস ! তুই

ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্মের মর্ম ভেদ করিয়াছিস, হিতাহিতের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস।" (ঐ, পৃঃ ১৬৩)। 'শাস্ত্র' 'ভারতবর্ষ', 'ভারতবর্ষীয় মানবগণ' সকলের উদ্দেশে বিদ্যাসাগর যে প্রাণস্পর্শী নিবেদন জানিয়েছন—তা বাংলা-ভাষারও এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিদ্যাসাগর পুস্তকের শেষ বাক্যে আপনার অন্তরের সকল ব্যথার উৎস উন্মুক্ত করে দিয়েছেন—"হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।" বিদ্যাসাগরের অন্তর আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত।

এই মানবীয় বেদনা ও চেতনা বিদ্যাসাগরের সংস্কারপ্রয়াসের মূল উৎস। তবে বিলাপে নিঃশেষিত হওয়ার মতো পুরুষ বিদ্যাসাগর নন। তাই, এর পরে এসব রচনা ছাড়াও যে কর্মস্রোতে বিদ্যাসাগর পৌরুষ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তা এসব রচনার থেকেও বেশি গুরুতর—লেখা, প্রচার শুধু তাঁর পক্ষে কাজের ভূমিকা—সে কাজ বিধবাবিবাহ আইন পাস করানো (Act XV of 1856, ২৬শে জুলাই বিধিবন্ধ); তারপর বিধবাবিবাহ প্রচলনে দিনের পর দিন বিদ্যাসাগরের তনুমনধন নিয়ে সাধনা—১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে জীবনের প্রায় শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি যে পুরস্কার লাভ করেছেন, এখানে সেসব ঘটনা, রটনা, পক্ষ-বিপক্ষের পদ্য, ছড়া, কটূক্তি, বক্রোক্তি প্রভৃতির উল্লেখ বা উদ্ধৃতির স্থান নেই—কিন্তু বাঙালীর সমাজজীবনের তা এক দুরপনেয় কলঙ্কের অধ্যায়।

বলা হয়, সেই জাতীয় অক্ষমতায়, শঠতায় ও প্রত অংণায় বিদ্যাসাগরের নাকি 'মানুষে বিশ্বাস' ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল। তার সাময়িক প্রম রদিগে ষ দিককার দু-একটি লেখায় আভাসিত হয়েছে। কিন্তু সে বিরাগ কতটা সাময়িক বা 'তৎকালীন', কতটা সত্যই হৃদয়গত—সে বিচার আমরা পরে করব। এখানে একটা কথা শুধু আমরা স্মরণ করব, বিদ্যাসাগরের সংকল্পচ্যুতি ঘটেনি; অজেয় পৌরুষ অবনত হয়নি। সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি সংস্কারপ্রয়াস ত্যাগ করেননি; এমনকি, বহুবিবাহ রহিত করার জন্য যে আন্দোলন আরম্ভ করেও (২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৫৫) সিপাহী বিদ্রোহের জন্য কিছুকাল বন্ধ থাকে, তাও সময় পেতেই আবার আরম্ভ করলেন—বিধবাবিবাহ প্রচলনের কঠিন বাস্তব অভিজ্ঞতা তখন তাঁর যথেষ্ট লাভ হয়েছে; তথাপি তিনি বহুবিবাহ রহিত করার জন্য প্রচারে, পুস্তিকা রচনায়, আন্দোলনে, আইন প্রবর্তনের চেষ্টায় সমান তেজ নিয়ে অগ্রবর্তী। সেই প্রয়াসের সাক্ষ্যসমূহ এখনও স্মরণীয়।

বহুবিবাহ রহিত করা বিষয়ক রচনা—আয়োজন

বহুবিবাহ রহিত করার জন্য যে পুস্তিকাসমূহ বিদ্যাসাগর রচনা করেন তার প্রত্যেকটির

বিজ্ঞাপন বা মুখবন্ধ থেকে তার উপলক্ষ জানা যায়। যুক্তি ও বিচারে ঐতিহ্যগত পদ্ধতি এসব রচনায়ও পরিত্যক্ত হয়নি। কিন্তু মনে হয়, বিদ্যাসাগর নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন—আসলে ধর্ম ও শাস্ত্রমতের প্রমাণ কার্যত সমাজসংস্কারে গ্রাহ্য হয় না—গতানুগতিকতা এমনই এই সমাজের মজ্জাগত। তবে সেই শাস্ত্রীয় যুক্তিবিচারের অস্ত্রকে অবজ্ঞা করাও সঙ্গত নয়। এসব রচনার সংস্কৃত শ্লোকগুলিতে ভয় পাবার কারণ নেই; এগুলির গুরুত্ব শাস্ত্রীয় নয়। বিদ্যাসাগরের লেখাও ন্যায় ও ব্যাকরণ প্রভৃতি নানা যুক্তি দিয়ে সাজানো হলেও তা জটিল নয়—রঙ্গেব্যঙ্গে তা একটু এখানে সহজগ্রাহ্য।

"বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না—এতদ্বিষয়ক বিচার"—এ বিষয়ের প্রথম পুস্তক ১৮৭১ সালে, এবং 'দ্বিতীয় পুস্তক' ১৮৭২ সালে প্রচারিত হয়। বলা বাহুল্য, এই বিশেষ কুপ্রথার মূল হল বল্লালী আমলে উদ্ভূত কৌলীন্যপ্রথা, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে যা একটা অপকৃষ্ট রূপ ধারণ করেছিল—সে সামাজিক ইতিহাস ঐ পুস্তকেও আমরা দেখতে পাই। এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর স্বয়ং আইন প্রবর্তনের জন্য আবেদন (২৭ ডিসেম্বর, ১৮৫৫) করবার আগেই এই সংস্কারচেষ্টা দেখা দিয়েছিল। সমাজসংস্কারের আবহাওয়া আগেই তৈরি হচ্ছিল—তা আমরা দেখেছি। এই বিশেষ দিকেও দৃষ্টি পড়েছিল। অন্তত, ১৮৪২-এ 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত এ বিষয়ে লেখেন। এ বিষয়ে তিনিই অগ্রণী। 'সমাজোন্নতিবিষয়ণী সুহৃদ্ সমিতি'র কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি এ চেষ্টায় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হন (১৮৫৪)। কিশোরীচাঁদ মিত্রই প্রথম বহুবিবাহের প্রতিরোধ আইন প্রণয়নের জন্য আবেদন করেন (১৮৫৫)। আর সেই বৎসরেই বিদ্যাসাগরেরও ওরূপ আবেদন। এইসব আবেদনে একাধিক রাজা-মহারাজা তথা গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ কয়েক হাজার লোকের স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়েছিল। সংস্কারবিরোধীরাও চুপ করে থাকেনি। সে পর্যন্ত আন্দোলনের ইতিহাস এই। তারপর তাতে বাধা সিপাহী বিদ্রোহ। পরে ছোটলাট সিসিল বীডনের সময় (১৮৬৬) আবার নতুন করে চেষ্টা হয়। আবেদনেও হাজার হাজার লোকের স্বাক্ষর ছিল, বিরোধীরাও সংখ্যায় সেরূপ। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পরে ভারত সরকার সমাজ-সংস্কারে উৎসাহ দেওয়া আর মোটেই সুবিবেচনা মনে করেনি (সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থই বা তাতে কী ?), বাংলা সরকার তবু সাতজনের একটি কমিটি করেন, পাঁচজন দেশীয় লোক—বিদ্যাসাগর তাঁদের একজন। কমিটি মত দিলেন—এ কুপ্রথা আপনা-আপনি উঠে যাবে—আইন করা যুক্তিসংগত নয়। বিদ্যাসাগর অবশ্য এই মতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন—তিনি বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য আইন চান। কিন্তু তখনকার মতো আন্দোলন এখানেই বন্ধ হল। বলাবাহুল্য, স্বাধীনতার পরে হিন্দু আইন পাস না

হতে হিন্দুসমাজে বহুবিবাহ বেআইনী হয়নি। অবশ্য ১৮৭০ সালে কলকাতার সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা আবার বহুবিবাহ শাস্ত্রসংগত নয়, এবং তা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত বলে আন্দোলনে অগ্রসর হন। (বিদ্যাসাগরের দুটি বেনামী পুস্তিকা তখনকার —১৮৬৯-৭০।) তখনই অন্যদিকে রচিত হল বিদ্যাসাগরের স্বনামে প্রথম পুস্তক, এবং আরম্ভ হল এই প্রচারের পর্ব।

বিদ্যাসাগরের বক্তব্যধারা

বহুবিবাহরহিতকরণবিষয়ক পুস্তক দুটির সারসংকলন এখানে সম্ভব নয়, আমরা তা বলেছি—'প্রথমখানাও ছোট নয়, দ্বিতীয় পুস্তক বেশ বড়।' মূল ভাবনা যে স্ত্রীজাতির দুঃখ লাঘব করা, সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধে তা স্পষ্ট করে প্রকাশ করেই বিচার আরম্ভ হয়েছে। এদেশীয় স্ত্রীলোকদের অশেষযন্ত্রণাদায়ক নানা প্রথার মধ্যে বহুবিবাহপ্রথাকে তিনি সে সময় 'সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর' বলে স্থির করেছেন, এবং প্রমাণ করতে অগ্রসর হয়েছেন যে, 'রাজশাসন ব্যতিরেকে' তা রহিত করার উপায় নেই। সেরূপ আইন করার বিরুদ্ধে যা আপত্তি, বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তকে এক-এক করে সেগুলির নিরসন করতে থাকেন। প্রথম আপত্তি—বিবাহ অবশ্যপালনীয় সংসারধর্ম। 'অধিবেদন' বা বহুবিবাহ (অবশ্য পুরুষের বহুবিবাহই আলোচ্য) কি অবশ্যকর্তব্য, না, বিশেষ অবস্থায় সংসারধর্মের জন্যই তা অনুমোদিত? বিদ্যাসাগর বলতে চেয়েছেন, "যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না" (বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৮)। দ্বিতীয় আপত্তি—বহুবিবাহ নিবারিত হলে কুলীনব্রাহ্মণদের জাতিপাত ও ধর্মলোপ ঘটবে। বিদ্যাসাগর দেখালেন—কৌলীন্যপ্রথা কতদিনকার, আর কী ছিল তার চেষ্টা, আবার কী হয়েছে তার পরিণতি। এটি বাঙালী সমাজের একটি যুক্তিসংগত ইতিহাসবিচার—ব্যাপারটা শেষ অবধি দেখলে লজ্জায় অধোবদন হতে হয়। তৃতীয় আপত্তি—'ভঙ্গকুলীন'দের সর্বনাশ। অর্থাৎ, ব্যবসা মাটি। বিদ্যাসাগরের যুক্তি বাস্তব তথ্যেই সুস্পষ্ট—আর সে সাক্ষ্য সমাজের গলিত দশারই সাক্ষ্য। চতুর্থ আপত্তি—না, এসব অত্যাচার এখন নিবৃত্ত হচ্ছে, কাজেই আইন নিষ্প্রয়োজন। উত্তরে বিদ্যাসাগর আবার তথ্যের অবতারণা করলেন—শুধু হুগলি জেলা আর জনাই গ্রামের থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে নামধামসুদ্ধ তালিকা দিলেন বহুবিবাহবিশারদ কিছু কুলীন ব্রাহ্মণের (ঐ, পৃঃ ২০১-৮)—অন্য জেলার তথ্যও তখন প্রকাশিত হচ্ছিল, কোথাও কোথাও তা আরও কুৎসিত। (প্রসঙ্গত জ্ঞাতব্য—বঙ্কিমচন্দ্র চিরদিনই বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আইনের ও বহুবিবাহনিরোধক প্রস্তাবের বিরোধী ; তিনি

'বিবিধ প্রসঙ্গে'র দ্বিতীয় প্রবন্ধে এ তালিকা 'প্রমাদশূন্য' নয় বলে অভিযোগ করেছেন—তালিকায় মৃত ব্যক্তির নাম আছে, কিছু কিছু নাম মেলেও না। তা সত্য হলেও কী পরিমাণে সত্য—কোন্ কোন্ নামের বিষয়ে? মোট কটি নামের সম্পর্কে? বঙ্কিমচন্দ্রের সনাতনী মনোভাব যাই হোক, এ বিষয়ে যুক্তিনিষ্ঠা বা তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় তিনি দেননি।) প্রথম পুস্তকের দুটি ক্রোড়পত্রও উল্লেখযোগ্য—দ্বিতীয় ক্রোড়পত্রে তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও 'সোমপ্রকাশে'র দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের (অপ্রত্যাশিত) আপত্তির উত্তর দেওয়া হয়।

বিদ্যাসাগর গবর্নমেণ্টের সাহায্যে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নে কোনো বাধা মানবেন না—"আমাদের ক্ষমতা কোথায়? ক্ষমতা থাকিলে ঈদৃশ বিষয়ে গবর্নমেণ্টের নিকট যাওয়া কদাচ উচিত ও আবশ্যক হইত না। আমরা নিজেরাই সমাজের সংগঠনকার্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম।" অনেকের মতো এই পদ্ধতিতেই 'সোমপ্রকাশ'-এর আপত্তি। স্বাধীনতার পরে কিন্তু আইন দ্বারাই বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছে—'আপনা-আপনি উঠে যাচ্ছে', এ যুক্তিতে তখন আর কুলোয়নি।

১৮৭১-এ কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই পুস্তিকা আবার তীব্র প্রতিবাদ জ্বালিয়ে তুলল—আবার সেই যুক্তি-অযুক্তি-কুযুক্তির রাশি রাশি ধোঁয়া। হয়তো তাতেই বিদ্যাসাগরেরও জিদ জ্বলে উঠল—১৮৭২-এ প্রকাশিত হল দ্বিতীয় পুস্তক—১৭৭৮-এর 'রত্নপরীক্ষা' পর্যন্ত তা নিবল না। তার পূর্বেই বিদ্যাসাগর দীর্ঘভোগ্য রোগ-পীড়ায় কর্মক্ষেত্র থেকে বিদায় নিচ্ছেন।

বহুবিবাহনিবারক 'দ্বিতীয় পুস্তকে' (১৮৭৩) প্রধান লক্ষ্য পূর্বকথিত প্রতিবাদের উত্তরদান। মুখবন্ধে উপলক্ষ প্রভৃতি বিজ্ঞাপিত। মোট পাঁচজন প্রতিবাদীর বক্তব্যের উত্তর বিদ্যাসাগর দিয়েছেন। প্রথমেই সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক তারানাথ বাচস্পতির আপত্তির উত্তর। বাচস্পতির পুস্তিকা সংস্কৃতে লেখা। তিনি সেদিনের প্রসিদ্ধ একজন পণ্ডিত—'বাচস্পত্যাভিধান' এখনো সম্মানিত, বহু গ্রন্থের লেখক, এবং (পুত্র জীবানন্দ বিদ্যাসাগরকে সহকারী করে) সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদক এবং গহনার দোকান প্রভৃতি নানা ব্যবসায়ের ব্যবসায়ী। বিদ্যাসাগরই তাঁকে প্রথম সংস্কৃত কলেজে আনান—তার আগে তিনি কাপড়ের ব্যবসায়ের পথে পদার্পণ করেন; তাতে কলকাতায় তাঁর ব্যবসায়ে বেশি সুযোগও লাভ হয়। যখন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তখন বাচস্পতিকে দেখা যায় বিদ্যাসাগরের মতের সমর্থক। কিন্তু দেখা গেল, বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করলে তিনি মত পালটালেন। তারানাথ বাচস্পতির পাণ্ডিত্য অপেক্ষা ব্যবসায়িক মনোভাব ও স্বার্থবুদ্ধি কম প্রবল ছিল না। সেজন্যই অনুমান করা হয়—তাঁর মত পরিবর্তনের পিছনে তাই ছিল প্রধান কারণ।

বাচস্পতির বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষণ করতে বিদ্যাসাগরেরও তাই বাধত না। কিন্তু 'অতি অল্প হইল' প্রভৃতি বেনামী পুস্তিকাতেই তিনি সেই বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। স্বনামে লেখা এই দ্বিতীয় পুস্তকে তিনি মাঝে মাঝে পরিহাসে পর্যুদস্ত করেছেন—এই পর্যন্ত ; সেই পরিহাসে, এবং যুক্তিতেও ধার আছে ; তবে বেনামী পুঁথির ঝাঁঝ ও বেপরোয়া উপহাস তাতে নেই। 'দ্বিতীয় পুস্তকের' প্রথম দশটি পরিচ্ছেদ বাচস্পতির সংস্কৃত-পুস্তিকানিবন্ধ আপত্তির খন্ডন। শাস্ত্রীয় যুক্তির দিক থেকে তাঁর প্রতিপক্ষেরা নতুন কথা সামান্যই বলেছেন। দুর্জয় পন্ডিত হলেও বাচস্পতি বরং হাস্যকর তর্ক এবং বিদ্যাসাগরের প্রতি উপহাসেই আসর মাত করতে চেয়েছিলেন এবং ব্যাকরণের পন্ডিত হলেও তাঁর সংস্কৃত লেখায় ভ্রমপ্রমাদও ছিল। এমন তর্কও তিনি তুলেছিলেন—এই মানুষের নামটাই বড়, সাধারণ তাতেই প্রভাবিত হত। বিদ্যাসাগরও তাই ছেড়ে দেননি—বাচস্পতির ভাগ্যে সমুচিত লাঞ্ছনালাভই ঘটেছে। বরিশালনিবাসী রাজকুমার ন্যায়রত্নের পুস্তিকার ('প্রেরিত তেঁতুল') উত্তরে বিদ্যাসাগরের বেগ পাবার কারণ ছিল না, উত্তরও ('ন্যায়রত্ন প্রকরণ') দীর্ঘ নয়। ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন কিছু আপত্তি উত্থাপন করেন, কিন্তু তিনি অসংযতভাষী নন ; বিদ্যাসাগরের উত্তরও ('স্মৃতিরত্নপ্রকরণ') যুক্তিপূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন।

বিদ্যাসাগরের আরেকজন প্রতিবাদী ছিলেন এক বিখ্যাত পন্ডিত—সত্যব্রত সামশ্রমী ; বেদ-বেদান্তের পন্ডিত। তাঁরও যুক্তিতে নতুনত্ব ছিল না। তর্কে (চতুর্থ আপত্তি) ছিল উদ্ভটতা—যা চলে আসছে, তা যখন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নয় (আগেই তা ধরে নিলেন), তখন তা-ই শাস্ত্রসম্মত।

তা ছাড়া, সামশ্রমী দ্রুপদের উক্তি তুলে বলেছেন—পুরুষ বহুপত্নী গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু নারী বহুপতি গ্রহণ করতে পারে না। অথচ পরক্ষণেই আছে যুধিষ্ঠিরের উত্তর—সামশ্রমী তা চেপে যান। যুধিষ্ঠির দেখিয়েছেন, পুরাণে নারীর বহুপতি-গ্রহণেরও দৃষ্টান্ত আছে ; আর দ্রৌপদী যে পঞ্চপতিই গ্রহণ করেন, তাও সুবিদিত। সামশ্রমীর পান্ডিত্য থাকলেও তাই যুক্তিতে শিথিলতা ছিল, অপকৌশল অবলম্বনের প্রবৃত্তিও ছিল প্রবল। কবিরাজ গঙ্গাধর রায় কবিরত্নের বৈদ্যশাস্ত্রে দখল থাকলেও ধর্মশাস্ত্রে দখল কাঁচা—বিদ্যাসাগর তা প্রতিপাদন করলেন শেষ আপত্তিতে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপসংহার স্পষ্ট—কেবল দুইটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রে 'অধিবেদন' (একাধিক পত্নীগ্রহণ) অনুমোদিত ; না হলে, "শাস্ত্রানুসারে, পূর্বপরিণীতা সবর্ণা সহধর্মিণীর জীবদ্দশায় পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার অধিকার নাই।" (ঐ, পৃঃ ৪১৪)।

সামাজিক রচনায় এই চারখানাই যুক্তিপ্রধান রচনা। বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ উপলক্ষ করে তাতে শাস্ত্রমন্থন হয়েছে ; তাই পাঠ শ্রমসাধ্য। বিদ্যাসাগরের বিচার-শক্তির ও শাস্ত্রবোধের অম্লান শ্রেষ্ঠতা তাতে প্রতিপন্ন হয়েছে। ও দুই বিষয়ের অন্য পুস্তিকাগুলিতে আর নতুন আপত্তিও ছিল না, নতুন বিচারপূর্ণ আপত্তি খণ্ডনের চেষ্টাও তাই বিশেষ নেই। বিচারভিত্তিক হলেও প্রচার-প্রাধান্যই সেসবের মূল বৈশিষ্ট্য, আর সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বিদ্যাসাগর অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন রঙ্গ, এবং তদপেক্ষাও বেশি কঠিন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। এজন্য 'অতি অল্প হইল', "আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজবিলাস', 'রত্নপরীক্ষা' প্রভৃতিতে তিনি স্বনাম প্রচ্ছন্ন রেখে বেনামী রচনার কৌশল গ্রহণ করেছেন। এসব রচনা যে বিদ্যাসাগরেরই, তা সমকালীনরা (কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) জানতেন, আর তার প্রমাণও সুনিশ্চিত। এরূপ বেনামী রচনায় বেপরোয়া হতে বাধা কম ; আর লেখা জমিয়ে তুলতেও সুবিধা বেশি—বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের পক্ষে। কারণ, তাঁর কৌতুকবোধ—কৌতুকবোধ না থাকলে এ জাতীয় রচনা প্রায়ই ব্যর্থ হয়। সমকালীন সকলে এ বিষয়ে একমত—বিদ্যাসাগরের মতো স্বভাবত কৌতুকপরায়ণ লোক আর দ্বিতীয় ছিল না।—সকলকেই তিনি হাসিরঙ্গে জমিয়ে রাখতেন। এ বিষয়ে এত গল্প প্রচলিত আছে যে, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়দের সাক্ষ্য স্মরণ করাই যথেষ্ট। বিদ্যাসাগরের চরিত্রবিচারে তাঁর হাস্যপ্রবণতা প্রাসঙ্গিক, কিন্তু এই পুস্তিকাগুলি পাঠকালে বারেবারেই আমরা বুঝতে পারি—বিদ্যাসাগরের সেই প্রতিভাই এই লেখাগুলির প্রধান আকর্ষণ। একই কালের কত সাধারণ সহজ উক্তি, প্রবাদ, প্রবচন, গল্প, কাহিনী, উপাখ্যান,—এমনকি, সেদিনের গ্রাম্য রসিকতায়ও তিনি মুখর।

সংস্কার আন্দোলন বাদানুবাদ ছাড়া চলে না—আপনা থেকেই তা সাময়িক তর্কযুদ্ধ বাধিয়ে দেয়—রামমোহন রায়ের সময় থেকেই তাই 'পলেমিক' লেখা বাংলায় দেখা দেয়। অনেকের হাতে তা গালিগালাজে মাত্র পর্যবসিত হত। রামমোহনের লেখা তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত—কিন্তু তাঁর ভাষা তখনও লঘুগতি নয়। বাংলা 'পলেমিক' রচনায় রামমোহন অপেক্ষাও বিদ্যাসাগর বেশি তৎপর, বেশি পটু। সমাজসংস্কারে এই দুর্বার অস্ত্র প্রয়োগ করতে তিনি তাই বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি—এটি আমাদেরই সৌভাগ্য। সমাজসংস্কারের দিক থেকে ফল যাই হোক, এই রঙ্গকৌতুকের আকর্ষণেই সকল কালের পাঠক এসব পুস্তক-পুস্তিকা পাঠে প্রবৃত্ত হতে পারে। তাই ভাবতে বাধ্য হই—বিদ্যাসাগর যদি আরও এরূপ লেখা লিখতেন! স্বীকার করতে বাধা নেই, এদিনের রুচিতে আমরা তার কোনো কোনো গল্প ও বিদ্রূপকে একেবারে নির্দোষ বলব

না—(বঙ্কিমের তাই ছিল অভিযোগ, আর সে অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নয়।) তবে সেসব ব্যঙ্গও সেদিনের আসরের সমুপযোগী ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষত দিগ্‌গজ পণ্ডিতদের, মর্মঘাতী বাণ অপেক্ষা চর্মঘাতী বাণেই, ঘায়েল করা সম্ভব।

সংস্কার-প্রয়াসের নানা দিক

সামাজিক রচনা, পুস্তিকা, আবেদনপত্র,—এসবের মধ্য দিয়ে সমাজসংস্কারের সপক্ষে তৎকালীন জনমত গঠনই ছিল বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য। সেদিক থেকে রামমোহনের আন্দোলনপদ্ধতিকে তিনি আরও প্রসারিত করেন—শিক্ষাদীক্ষার প্রসারে সে সুযোগও তখন (১৮৫০-এর পর থেকে) কিছুটা বেশি হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের তাই পূর্বাপরই এই বোধ ছিল—আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা প্রসারে সমাজে আধুনিক দৃষ্টি প্রসার লাভ করবে। আধুনিক যুগদৃষ্টি প্রসারের ও সমাজসংস্কারের তা হবে মূল কৌশল বা স্ট্রাটিজি। প্রচারপুস্তিকাদি উপস্থিত সাময়িক কৌশল (ট্যাক্‌টিক্‌স)। কিন্তু শিক্ষা মূল কৌশল। বিশেষ করে, আবার তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য স্ত্রীশিক্ষা বড় কৌশল। তাই সমগ্রভাবে দেখলে, বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার-চেষ্টার মধ্যে এইসব সামাজিক রচনা, আবেদনপত্র প্রভৃতি উদ্যোগের একাংশরূপে গণ্য। তাঁর শিক্ষাবিস্তার, বিশেষত স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার—নানা স্কুল, মেট্রোপলিটান কলেজ, সেই সঙ্গে ওয়ার্ড ইন্‌স্‌টিটিউশনের পরিদর্শনকর্ম, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, বীডন স্কুল কমিটির সম্পাদকরূপে দীর্ঘদিন প্রাণমনে কার্যতৎপরতা—এসব সংস্কার-প্রয়াসের আরেক অংশ। (চন্দ্রমুখী বসু প্রভৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্ব রোগশয্যায়ও বিদ্যাসাগরের প্রধান এক সান্ত্বনা হয়েছিল।) তৃতীয় একটি অংশও ছিল—আরও পরোক্ষ—তা হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফণ্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাঙালী পরিবারের আর্থিক উন্নয়নের যৎসামান্য প্রয়াস। একদিক থেকে তা এদেশে সমবায়িক ধরনের পারিবারিক নিরাপত্তার এক আয়োজন—সমাজসংস্কারের একটি সুস্থ প্রয়াস। অবশ্য, সহকর্মীদের অকর্মণ্যতায় বিদ্যাসাগর তিন বৎসর পরে (১৮৭৬) এই ফণ্ডের পরিচালকপদ ত্যাগ করেন—বৈষয়িক অকর্মণ্যতা তাঁর অসহ্য ছিল। কিন্তু সকল আয়োজনের উপরে প্রাধান্য লাভ করে বাস্তব কর্মধারা—আইন পরিবর্তনের দ্বারা সংস্কারের চেষ্টা ; এবং সেরূপ আইন (যেমন, বিধবাবিবাহ আইন) বিধিবন্ধ হলে সমাজের অন্যান্য অনুষ্ঠান অনুযায়ী সংস্কারকে (যেমন বিধবাবিবাহ) সমাজের মধ্যে প্রচলনের চেষ্টা। এখানেই কর্মী-পুরুষ বিদ্যাসাগরের আসল পরীক্ষা। আমরা জানি—কী দীর্ঘ প্রাণক্ষয়ী হয়েছিল সে পরীক্ষা—সেই 'সর্বপ্রধান সৎকর্মের' ইতিহাস—বাঙালীর জাতীয় আত্মপ্রবঞ্চনার একটা অধ্যায় ; আবার বাঙালীর নবজাগ্রত

মনুষ্যত্ববোধেরও একক-উদ্‌যাপিত মহৎ ব্রতের এক অধ্যায়। এখনকার দিনে সে আয়োজনের অন্তর্নিহিত এই সত্যও আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি—বাঙালী বুদ্ধিমান জাতি, কিন্তু তার দুর্বুদ্ধি প্রায়ই তার সুবুদ্ধির অপেক্ষাও বেশি।

কথাটা তাই স্বীকার করতেই হবে—তখনকার মতো দুর্বুদ্ধিরই জয় হয়েছে, সুবুদ্ধির সহায় ছিল কম; বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের প্রয়াস তাই তখন কার্যক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল। বহুবিবাহ বন্ধ করবার আইনই পাস করানো গেল না, বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হলেও বাঙালী সমাজ যেন জেদ করেই তা অচল করে রাখতে চাইল। অথচ মহারাষ্ট্র দেশে, পাঞ্জাবে বিধবাবিবাহ তখন থেকেই প্রচলিত হয়ে গেল। তারা প্র্যাকটিকাল জাতি—বাঁচবার মতো বুদ্ধি তাদের বেশি। সম্ভবত এই অভিজ্ঞতার ফলেই 'সহবাস-সম্মতি' আইনের প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে যে অভিমত জানান তাতে হতাশার লক্ষণ দেখি। তিনি জানান—ওরূপ বিষয়ে ধর্মের প্রথামত আইন পাস করে সংস্কারচেষ্টাই সমীচীন।* নিশ্চয়ই সমাজসংস্কারব্যাপারে নিজের প্রবল পদ্ধতি যে কার্যত অচল হয়েছে, তা তিনি বুঝেছেন। অবশ্য সমাজসংস্কার যে তাই বলে নিষ্প্রয়োজন, তা কখনো মানেননি—এমনকি, এই শেষ অভিমতপত্রেও নয়, তাঁর উইলেও বিধবাবিবাহের প্রচলনে সাহায্যদানের ব্যবস্থা স্পষ্ট করেই করা ছিল।

বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের মূল্যায়ন

আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবনকে আমরা যখন দেখছি—তখন তাঁর সমাজসংস্কারের প্রয়াসকে খতিয়ে দেখলে কী দেখতে পাই? অবশ্য এভাবে সেই কর্মকাণ্ডকে দেখার পক্ষে আমাদের সুযোগ দিয়েছে কাল স্বয়ং। ১৮৫৬ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত এতগুলি বছর তো মিথ্যা নয়—আমরা এদেশে ঘুমুতে চাইলেও আধুনিক যুগ সমস্ত পৃথিবীকে যে মহাকর্ষণে টেনে নিয়ে চলেছে, সেই টানে, পৃথিবীর সকলের সঙ্গে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ভারতবর্ষের আমাদেরও এগিয়ে যেতে হয়েছে। আধুনিক যুগধর্ম আমরা এখনো সচেতনভাবে গ্রহণ করছি কিনা সন্দেহ; কিন্তু সে 'কম্বলি' আমাদের ছাড়ছে না; ছাড়বে না,—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

* I should like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to child-wives, without in any way conflicting with the religious usuage. I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his wife has had her first menses........such a law would not only serve the interests of humanity........but so far from interfering with religious usuage, enforce a rule laid down in the Sastras.

তাই, আজ আমাদের নিকটে বহুবিবাহ আর সমস্যা নয়, সেরূপ আইনও পাস হয়েছে বটে। বরং আর্থিক কারণে বিবাহই সমস্যা। তেমনি বিধবাবিবাহও আজ বিশেষ জীবন্ত প্রশ্ন নয়—শিক্ষাদীক্ষা ও আর্থিক পরিস্থিতির পরিবর্তনে তার সমাধান না হোক, এক ধরনের মীমাংসা হয়ে যাচ্ছে; সমাজ তার প্রচলনে বাধা দেয় না—সাধ্যও নেই। বিধবাবিবাহ এখন অনেকটা ব্যক্তির বাস্তব সুযোগ-সামর্থ্য ও আপন ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। তাই আমাদের দৃষ্টিতে একালে মনে হয় বিদ্যাসাগরের মতো মহাপ্রাণ মানুষ কী তুচ্ছ সমস্যা নিয়েই নিজের অতুলনীয় শক্তিকে ক্ষয় করেছিলেন!

সত্যই, মূলত বিধবাবিবাহ সমস্যাটার কী ছিল মূল্য? প্রথমত, বিধবাবিবাহ ভারতীয় হিন্দুসম্প্রদায়ের সমস্যামাত্র—বিরাট ভারতীয় সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের সমস্যা নয়। দ্বিতীয়ত, সকল গোষ্ঠীর হিন্দুরও তা সমস্যা নয়। উচ্চবর্ণের ও সম্পন্ন হিন্দু গোষ্ঠীরই মধ্যে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল; নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে তা প্রচলিত ছিল। তবে অবস্থাপন্ন নিম্নবর্ণের মানুষ শিষ্টসমাজে গণনীয় হবার জন্য নিজেদের মধ্যে বিধবাবিবাহ বন্ধ করত।—ভারতীয় মুসলমানরাও কিছু কিছু এরূপ ধারণায় দূষিত হচ্ছিল—তাও ঠিক। তথাপি, সমগ্র ভারতীয় সমাজে শতকরা কয়জন এই উচ্চবর্ণ ও তার অনুকারী গোষ্ঠী? বড় জোর শতকরা বিশ জন।

সংখ্যার দিক থেকে দেখলে তো বহুবিবাহসমস্যা আরও তুচ্ছ। সমগ্র ভারতে নয়, বাংলার—বিশেষ করে আবার বাঙালী ব্রাহ্মণ সমাজেরও রাঢ়ীয় কুলীনদের—মধ্যেই তা ছিল সীমাবদ্ধ। তা হলে শতকরা কতজনের তা সমস্যা ছিল?

এই সংখ্যা ও পরিমাণের দিক থেকে দেখলে প্রশ্ন মনে জাগে, বিদ্যাসাগরের মতো বাস্তববুদ্ধির মানুষ এই তুচ্ছ ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়লেন কী করে? তার উত্তর—প্রথমত, ব্যাপারটা শুধু সংখ্যাগত হিসাবের জিনিস নয়, গুণগত হিসাবেরও জিনিস। সেখানে অপরিমেয় তার গুরুত্ব। হাজার হাজার বৎসর ধরে ভারতীয় সমাজ সাধারণভাবে বিধবাদের ব্রহ্মচর্যে ও নানা নির্মম নিয়মে-আচারে জীবনব্যাপী আবদ্ধ করে যন্ত্রণা দিয়ে এসেছে? এপাপের কি তুলনা হয়? শুধু সংখ্যা দিয়ে তার বিচার সংগত নয়। দ্বিতীয়ত, চোখের উপর যে কোনো জ্ঞানবুদ্ধিযুক্ত এ যুগের মানুষ এই কঠিন ও কুৎসিত দেশাচার দেখে চুপ করে থাকলে কি আমরা ভাবতে পারি তাঁর মনুষ্যত্ব বলে কিছু আছে? সত্যই মানবতাবোধ জাগলে—আধুনিক যুগে তা জাগবেই—এ পাপ অসহ্য হয়ে ওঠে; এই মানবতাবোধই ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে প্রবল ভাবে জেগেছিল। আর, সেই মানবতাবোধ আবার প্রবলতর হয়ে উঠেছিল বিদ্যাসাগরের হৃদয়ধর্মের জন্য—মহানুভবতায়, করুণায়, মমতায়। বিশেষ করে—স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁর অন্তরব্যাপী অপরিসীম মমতায়, শ্রদ্ধায়।—আধুনিক যুগ ও আধুনিক মানবতা-

বোধের এক প্রধান লক্ষণ তো স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি—মধ্যযুগে যার বিশেষ সাক্ষাৎও পাওয়া যায় না—আধুনিক যুগধর্মে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পরিবেশে তা ক্রমোন্মেষিত হয়।

ঐভাবে দেখলে বিদ্যাসাগরের এই সমাজসংস্কারচেষ্টায় আমরা এযুগের দৃষ্টিতেও যে ডাইমেনশন্ বা আকার দেখতে পাই, তাতে সে চেষ্টাকে কিছুতেই তুচ্ছ বলা চলে না। যদি কোনো পুরুষকে স্ত্রীজাতির যথার্থ হিতৈষী ও স্ত্রীজাতির উন্নয়নকামী বলে পরিচয় অকুণ্ঠ মনে দেওয়া যায়, তবে ভারতবর্ষে বিদ্যাসাগর তার মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁর পূর্বে রামমোহন এবং তাঁর পরে রবীন্দ্রনাথ এরূপই নমস্য।

নারীর উন্নয়ন : তার তাৎপর্য

পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যসমাজের ইতিহাস এ পর্যন্ত পুরুষ-শাসিত সমাজের ইতিহাস এবং অল্পাধিক নারীর অধিকারহীনতার ইতিহাস, আমরা তা বলেছি। পুরুষ-আধিপত্যে সেখানে নারী কোথাও এক-আধটুকু সুবিবেচনা লাভ করে, কোথাও তা করে না। অধিকারহীন শুধু নয়, ('ন স্বাতন্ত্র্যমর্হতি নারী'—এ উক্তি এদেশেও 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ' এই উক্তির থেকে কার্যত সত্য ছিল) সম্পত্তি-হীন, এবং স্বভাবতই নানাভাবে ব্যাহত, উৎপীড়িত, পুত্রোৎপাদক জীব এবং সংসারের ভারবাহী দাসী! নৃবিজ্ঞানের সে সাক্ষ্য মনে রাখলে শুধু একমাত্র ভারতীয় সমাজকে এজন্য দোষ দেওয়া যায় না। বরং ভারতীয় সমাজে দ্রবিড়ভাষী জাতিদের মধ্যে (বিশেষত কেরলীদের সমাজে) নারীর কিছু বাস্তব অধিকার আছে। অন্যত্র নারীর অবস্থা (শুধু বিধবার নয়) দুরপনেয় কলঙ্কজনক ও বেদনাদায়ক। এরূপ সমাজে বিদ্যাসাগরের স্ত্রী-জাতীর প্রতি শ্রদ্ধা ও তাদের সপক্ষে একক সংগ্রাম—অপরিমেয় বিস্ময়। মানবতার তা এক উজ্জ্বলতম প্রস্ফুরণ। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলেই বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার-চেষ্টার প্রকৃত তাৎপর্য আমরা আধুনিক যুগের মানদণ্ডেও উপলব্ধি করতে পারি।

ভারতীয় সমাজের মূল দাবি

এই তাৎপর্য সম্পূর্ণ স্বীকার করেই আমরা কয়েকটি কথা তবু স্মরণ করব। খুব সংক্ষেপে তা এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ তা এত মৌলিক প্রশ্ন যে এ প্রসঙ্গে তার বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। প্রথম কথাটা এই—ভারতীয় সমাজের নিজস্ব কলঙ্ক শুধু নারীর প্রতি অবিচার নয়, তারও বেশি—অধিকাংশ মানুষকে (নরনারী-নির্বিশেষে) শূদ্র বা অস্পৃশ্য বলে যুগযুগান্তর ধরে পশুবৎ পীড়ন করা। মনুষ্যত্বের এত বড় অপমান আর হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগর তার বিরুদ্ধে যথার্থরূপে সক্রিয় হন

নি।—তিনি ব্যক্তিগতভাবে আপনার মমতা ও প্রীতি দিয়ে সেই সাঁওতাল সাধারণ মানুষের সেবা করেছেন, তা ঠিক। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সংগ্রামের উদ্যোগ করেননি।

দ্বিতীয় কথা—অথবা তাই আসল কথা—আমরা গোড়াতেই দেখেছি, ভারতীয় সমাজের ধারা কোন খাতে কোথায় এসে ঠেকেছিল। আমরা সেখানে দেখেছি, ঊনবিংশ শতকের প্রধান প্রয়োজন ছিল—ভারতীয় সমাজের আধুনিকতা-সাধন, আধুনিক যুগ-ধর্মে সমাজের নবরূপায়ণ, আত্মার নতুন স্ফুরণ। তার অর্থ যে কী, বারে বারে তা বলা নিষ্প্রয়োজন—যুক্তির মুক্তি (র‍্যাশনালিজম্), ব্যক্তির মুক্তি (রাইট্স্ অব ম্যান-এর) প্রতিষ্ঠা, তারই মধ্যে নারীর ও নিম্নবর্ণের প্রতিষ্ঠা অন্তর্ভুক্ত একথা না বললেও চলে ; জাতির মুক্তি (ন্যাশনালিজ্মের উন্মেষ) ইত্যাদি।—কোনোটাই কোনোটির অপেক্ষা গৌণ নয়, সকলের সমন্বিত উন্মেষেই ভারতীয় সমাজের যুগান্তর সম্ভব। সেরূপ যুগান্তরই ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজের মূল দাবি।

বাংলাদেশে তার আবার আরো একটা বিশেষ দাবি ছিল—যে জমিদারিতন্ত্রে কর্নওয়ালিস বাংলাদেশকে আধা-মধ্যযুগের ব্যবস্থায় অভিশাপগ্রস্ত করেন, সেই জমিদারিতন্ত্রের অভিশাপমোচন। এটাই ছিল বাঙালী জীবনের মূল সমস্যা—এই প্রজাসাধারণের অধিকার লাভের সমস্যা ও জাতীয় মুক্তির সমস্যা, এই যুগদাবি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর নিস্পৃহ ছিলেন বলব না, কিন্তু মনে হয়—অত্যন্ত ভেবেচিন্তেই নিষ্ক্রিয় ছিলেন। তার কারণ কী, নিশ্চিত করে বলা যায় না, তবে অনুমান করা যায়—প্রথমত, তাঁর বিশ্বাস ছিল আধুনিক শিক্ষার দ্বারাই আধুনিক যুগের ভিত্তি রচনা করতে হবে। (শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগর অধ্যায়ে আমরা তা দেখেছি) ; দ্বিতীয়ত, বাস্তববুদ্ধির মানুষ হিসাবে তিনি দেখেছিলেন সামাজিক নেতৃত্ব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত (উচ্চবর্ণ) ও প্রভাব-শালী বিত্তবানদের হাতে, ঐতিহ্যগতভাবে ও স্বাভাবিকভাবে তারাই অন্য জনসাধারণের চালক, অন্যেরা তাদের মুখাপেক্ষী। কাজেই, নতুন শিক্ষাদীক্ষাও বাস্তবত এই পরিচালক শ্রেণীর মধ্যেই প্রথম প্রচলন প্রয়োজন ; আর তা সম্ভবও। শিক্ষার প্রভাবে এই সমাজনেতৃত্বকে সচেতন ও সক্রিয় করে তুলতে পারলে সমাজের অন্য অংশও সঙ্গে সঙ্গে সচল হয়ে উঠবে। তাই বিদ্যাসাগর বিশেষ করে এই উচ্চবর্ণ মধ্যবিত্ত ও বিত্তবানদের উপরই প্রধান ভরসা রেখেছিলেন। সেজন্যই সম্ভবত রাজনৈতিক চেষ্টা বা প্রজা-আন্দোলন-চেষ্টাতেও তিনি জড়িত হতে চাননি। শিবনাথ শাস্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন—প্রয়োজন হলে ভারতের যে কোনো রাজা-মহারাজার নাকের উপর তিনি এই চটিসুদ্ধ পায়ের লাথি মারতে পারেন। শাস্ত্রীমহাশয় বলেছেন—সত্যই এ কথা বলবার মতো চরিত্রবল তাঁর ছিল। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের যেটুকু জাগরণ তিনি

লক্ষ্য করেছিলেন, তাতে সেই শ্রেণীর উপরই তিনি ভরসা করে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন। নিজের সমাজসংস্কার চেষ্টাতেই তিনি বুঝেছিলেন—যা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট চিঠিতে লিখেছেনও—'বড়লোক' ও 'ধনীলোক'দের উপর ভরসা রেখে তিনি প্রতারিত হয়েছেন। হওয়াই অনিবার্য। এ শ্রেণী তো সমাজসংস্কার প্রভৃতি চায় না, তারা চায় ইংরেজের ব্যবস্থা ও ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা নিয়ে নিজ নিজ ব্যক্তিগত উন্নতি, বড়জোর সেই সঙ্গে পারিবারিক উন্নতি ;—জাতীয় উন্নতিও তাদের কাছে তখনো কথার কথা। বিশেষত বাঙালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত স্বার্থ জামিদারিপ্রথার সঙ্গেও তখন পর্যন্ত জড়িত ছিল। ইংরেজি শিক্ষা ও আধুনিক ধারণা না গ্রহণ করে তারা পারেনি, কিন্তু জীবনকে আধুনিক রীতিপদ্ধতিতে গড়তে তারা কার্যত উদ্যোগী ছিল না। এই দ্বিধা (ডাইকটমি), এই মানসিক দ্বিমুখিতা (অ্যামবিভ্যালেন্স) বাঙালী শিক্ষিতের শ্রেণীচরিত্রের প্রধান লক্ষণ। তাতেই নিরাশ হয়ে বিদ্যাসাগর ক্রমে মানুষের উপর অকুণ্ঠিত বিশ্বাস হারাতে বাধ্য হচ্ছিলেন। সম্পূর্ণ যে হারাননি, তার কারণ—এই 'বড়লোক' ও 'ধনীলোক'দের এলাকা ছাড়িয়ে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গলাভে বরাবরই ছিলেন স্বাভাবিকভাবে তৎপর। বিশেষ করে, কারমাটাড়ে নির্ভেজাল সাঁওতাল নরনারীর সঙ্গলাভ করে তিনি বুঝতেন—না, সবার উপরে মানুষ সত্য। সত্যই মানুষ সত্য। 'বড়লোক' ও 'ধনীলোক' সকল, শিক্ষিত মধ্যবিত্তও মানবিকগুণে সুপ্রতিষ্ঠ নয়।

বিদ্যাসাগরের সমাজদৃষ্টির সীমাবদ্ধতা

বিদ্যাসাগরের কালে কি বিদ্যাসাগরের পক্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই সীমাবদ্ধ দৃষ্টি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না? না, এমন মনে করারও হেতু নেই। ১৭৯৩-এর ব্যবস্থায় অধিকারহীন প্রজাদের যে কী দুর্দশা, তা বীরসিংহের ঠাকুরদাসের পুত্রের পক্ষে না জানার কথা নয়। (বিদ্যাসাগর নিজে ভূসম্পত্তির অধিকার চাননি। বর্ধমানের মহারাজা বীরসিংহের পত্তন তাঁকে দিতে চাইলেও বিদ্যাসাগর তাতে সম্মত হননি। প্রতিবেশীদের থেকে খাজনা আদায় করে মুনাফা তোলা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না।) তাছাড়া, রামমোহনের সময় থেকেই (১৮৩৩-এর সনদ 'বদলের সময় থেকে) বাংলাদেশে প্রজাস্বত্বের প্রশ্ন ও প্রজার দুর্দশার প্রশ্ন প্রকট হয়ে উঠেছে। ১৮৫৪-র সনদ বদলের পূর্বে কতকটা মিশনারিদের প্রচারে প্রজাস্বত্বের প্রশ্ন গুরুতর হয়ে ওঠে। তখন জমিদার-সভাও তাতে মন দেন। আর, প্রজার নামমাত্র অধিকার স্বীকার করে একটা আইনও তখন পাস হয়। কিন্তু তাতে সমস্যার বিন্দুমাত্র সমাধান হয়নি—জমিদার ও মধ্যস্বত্ববানদের শোষণ একচুলও কমে না। ফলে প্রজার অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি

পায়। সেই সময়েরও পূর্ব থেকে বিদ্যাসাগরের সুহৃদ্‌ অক্ষয়কুমার দত্ত প্রজার সপক্ষে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করছেন—বিদ্যাসাগর তা অন্তত নিশ্চয়ই দেখেছেন; অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তার আলোচনাও হয়েছে নিঃসন্দেহ। তা ছাড়া, এ সময়েই প্যারীচাঁদ মিত্র ও কিশোরীচাঁদ মিত্র ইংরেজিতে পরিষ্কারভাবে জমিদারিপ্রথার সমালোচনা করছিলেন। কিশোরীচাঁদ বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের সপক্ষ। এঁদের মতামতও বিদ্যাসাগরের জানার কথা। এর পরে আসে ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে নীল বিদ্রোহ। তারপরে বাংলার বহু জেলায় চলে প্রজা-অসন্তোষ (১৮৭২ সালের পাবনার প্রজাবিদ্রোহ তার একটা দৃষ্টান্ত মাত্র)। ১৮৮৪ সালে নতুন প্রজাস্বত্বের আইন পাস হলেও সে পর্যন্ত বাঙালী সমাজের প্রধান সমস্যা তো এই সমস্যা—সামন্ততন্ত্রকে উৎখাতের সমস্যা। বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত তা নিয়ে মাথা ঘামান—যদিও তাঁর না ছিল সাহস, না ছিল সেই পৌরুষ। অথচ বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ও শিক্ষা-বিস্তারের বাইরে অগ্রসর হলেন না। দু হাতে দুঃখী-দরিদ্রের সাহায্যে নিজের অর্জিত অর্থ বিলিয়ে দিতে অবশ্য আর কেউ এদেশে তাঁর জুড়ি ছিল না। কাজেই ব্যক্তিস্বার্থ তাঁকে অন্ধ করত না, পারিবারিক স্বার্থও না। 'বড়লোক' তথা 'ধনীলোকে'র শ্রেণীর স্বরূপ কী তা তিনি বোঝেননি? যাই করুন—এইখানে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতার কথা মানতে হবে। মানতেই হবে—বিদ্যাসাগর ভারতীয় সমাজের যা মূল দাবি তা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে পারেননি, সেদিকে উদ্যোগ দেখাননি। হয়তো প্র্যাক্‌টিক্যাল মানুষ হিসাবে মনে করেছেন, এই প্রজার অধিকারের সমস্যা অনেক বড় সমস্যা—দীর্ঘকাল শিক্ষাদীক্ষার শেষে, বহুবিধ আয়োজনের পরে, তার জন্য সংগ্রাম সাধ্য হবে। ততক্ষণ তাঁর কালে যা সাধ্য, এবং তিনি নিজ অভিজ্ঞতায় যাতে প্রতিনিয়ত পীড়িত হয়েছেন, চোখের উপর দেখা স্ত্রীসমাজের এই দুর্ভাগ্য—সেইসব উপস্থিত কুপ্রথারই অবসান করতে অগ্রসর হয়েছেন।

মানবিক হৃদয়বত্তার সাক্ষ্য

শেষে আবার স্মরণ করি—স্ত্রীজাতির অধিকারের সংগ্রামও কিন্তু মানবাধিকার (রাইট্‌স্‌ অব ম্যান) অর্জনকল্পে সংগ্রামের মুখ্য এক রূপ। সে বিষয়ে বিদ্যাসাগর সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান অপেক্ষা অধিক পরিচালিত হয়েছেন তাঁর হৃদয়বত্তার দ্বারা—অভিজ্ঞতালব্ধ আন্তরিক আবেগের দ্বারা, তা বোধ হয় সত্য। তিনি শুধু বুদ্ধিচালিত, যুক্তিচালিত মানবতাবাদী নন—যেমন প্রধানত ছিলেন (যদিও পরমার্থবিশ্বাসী) রামমোহন। তিনি সেই সঙ্গে সুস্থ হৃদয়ধর্মে উদ্‌বুদ্ধ, প্রাণধর্মে প্রবল মানবতাবাদী। এইখানেই—এই সমাজসংস্কারের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই—সেই মানুষ দেহেমনে ক্ষয়

হতে হতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যান—অজেয় পৌরুষ নিয়ে, অক্ষয় মনুষ্যত্ব নিয়ে। দয়ার সাগর নিশ্চয়ই, বিদ্যারও সাগর তা তো বিধবাবিবাহ প্রচলন বা বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ক প্রবন্ধমালার মধ্যেও দেখি ; কিন্তু এই সমাজসংস্কারকর্মক্ষেত্রে আরও আমরা দেখি—সীমাবদ্ধ দৃষ্টি সত্ত্বেও মানুষ বিদ্যাসাগরকে—আধুনিক মানবতার যিনি অগ্রদূত।

সমাজসংস্কারের মূল্যায়নেও তাই বুঝি—কাল এগিয়ে যাচ্ছে—আরও এগিয়ে যাক। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে কাল পিছনে ফেলে আসেনি—তিনি সামনেই আছেন, সঙ্গেই থাকবেন—মানুষ বিদ্যাসাগর।

৪ 'বাঙলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী'

"বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার পরেও পারে নাই।"—('বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান') বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি দিয়েই আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার সাহিত্যিক মূল্যবিচারের সূত্রপাত করছি—রবীন্দ্রনাথের ('বিদ্যাসাগর-চরিত'এর) কথা দিয়ে নয়। তার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষেত্রে যে উদার উক্তি করেছেন, বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ববিচারে সর্বত্র সেরূপ উদার মনোভাবের পরিচয় দেননি। বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক মতবাদে ছিলেন বিদ্যাসাগরের বিরোধী; এবং বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকৃতিত্ববিচারেও সময়ে সময়ে কুণ্ঠিত হতেন। তার একটি কারণ—উপরের উদ্ধৃত অংশের ঠিক পূর্বেই ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন—"ইহাদের [বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের] ভাষা সংস্কৃতানুরাগিণী হইলেও তত দুর্বোধ্য নহে।" অতএব মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য এই—সংস্কৃতানুরাগিণী ভাষার মধ্যে "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর।" সেই বিশেষ রীতির ভাষায় বিদ্যাসাগরের পূর্বে বা পরে আর কেউ বাংলা গদ্য লিখতে পারেননি। বিদ্যাসাগরের পরে বঙ্কিম নিশ্চয়ই বাংলা ভাষাকে আরও সচ্ছন্দ ও সুমধুর শ্রী দান করেছেন, কিন্তু বঙ্কিমের ভাষা 'সংস্কৃতানুরাগিণী' ভাষা নয়—অন্তত বঙ্কিম তাই মনে করতেন।

'বিদ্যাসাগরী বাঙলা'

'সংস্কৃতানুরাগিণী' বাংলা ভাষার প্রতি বঙ্কিমের আপত্তি ছিল, সে আপত্তি নিশ্চয়ই শিল্পসংগত এবং যুক্তিসংগত।* কিন্তু সাহিত্যজীবনের প্রারম্ভে বঙ্কিমের ভাষাও কম সংস্কৃতানুরাগিণী ছিল না। এ কথা সত্য। বঙ্কিম সেই মোহ বা ভ্রান্তি

*একবার (বাছাই না করে) বঙ্কিমের একখানা বই ও বিদ্যাসাগরের একখানা বই থেকে সমান পরিমাণ মুদ্রিত অংশ ('এম') নেওয়া হয়। তারপর দুটি থেকে সংস্কৃত শব্দ গনা হল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা রিপোর্ট করেছেন, "আমার সেইটুকুতে ৫৫টা সংস্কৃত কথা ছিল, আর বঙ্কিমের ৬৫টা—আমি সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করিয়াছি, আর উনি অসংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।" কিন্তু কোন্ বিশেষ দুখানা বই নেওয়া হয়েছিল, তা না জানলে এ প্রমাণ সত্য

শীঘ্রই কাটিয়ে ওঠেন। বাংলা ভাষার মূল প্রকৃতি তিনি তখন উপলব্ধি করেছেন। এযুগের আমরাও মনে করি—বাঙলা ভাষার একটা নিজস্ব প্রাণধর্ম বা 'জিনিয়াস' আছে। তাতে সংস্কৃতের ভার কতকটা সহনীয় বটে, কিন্তু সকল রকমের 'অনুরাগের' অত্যাচার তার অসহ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমোদিত ভাষাবিষয়ক আদর্শ ও নীতি তিনি সুস্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন (দ্রষ্টব্য: 'বাঙ্গালার নব্য লেখকগণের প্রতি', ১২৯১, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য়; 'বাঙ্গালা ভাষা (লিখিবার ভাষা)', ১২৮৫, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য়)। বাঙালী কেন, বোধ হয় সকল লেখকের পক্ষেই তাঁর উপদেশ শিরোধার্য। বঙ্কিমের 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'বিবিধ প্রবন্ধে'র প্রবন্ধসমূহ এই নীতির ও বাংলা ভাষার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ পরবর্তী লেখকেরা সেই সত্যকে আরও সুপ্রমাণিত করে দিয়ে যান। সে ভাষা আধুনিক চলতি ভাষারই সগোত্র। আজ 'বিদ্যাসাগরী ভাষা' বাঙালী সাধারণের পক্ষে একটা অচল ভাষারীতি বলে পরিচিত। বঙ্কিমের আমল থেকেই এই ধারণার সৃষ্টি হতে থাকে। কারণ, আসলে বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের নিকট স্বীকৃতিলাভ করেননি। এ কথা সত্য, বিষয়ের দিক থেকে বঙ্কিম প্রথম-প্রথম বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলতেন, He is only a primer maker—বিদ্যাসাগর ছেলেদের বই লিখেছেন—এইমাত্র। এ কথাও বলতেন, বিদ্যাসাগর বড় বড় সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করে বাংলা ভাষার ধাতটা গোড়ায় খারাপ করে গেছেন (দ্রষ্টব্য: বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্যায়)। 'সীতার বনবাস'কে বঙ্কিম বলেছিলেন, 'কান্নার জোলাপ'। এসব উক্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ সুবিচার করতে পারেননি—এমনকি বাংলা গদ্যের বিকাশধারার বিচারে বিচক্ষণতারও পরিচয় দেননি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে সাধারণের ধারণাও এইরূপই। সে ধারণা একেবারে অমূলক নয়। 'বিদ্যাসাগরী বাংলা' বলতে আমরা এখনো প্রশংসা বোঝাই না। এজন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যকে উড়িয়ে না দিয়ে আমরা বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক মূল্য বুঝে দেখতে চাই। না হলে, রবীন্দ্রনাথের অধিকতর সদর্থক ও সার্থক বিশ্লেষণ দিয়েই আমরা এ ভূমিকার সূত্রপাত করতাম। বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের দান ও বঙ্কিমচন্দ্রের দান—দুয়েরই মূল্য রবীন্দ্রনাথ আপন প্রতিভাবলে

হলেও অবিসংবাদিত বলে গ্রহণীয় নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এর পরে যা রিপোর্ট করেছেন তা বেশি অর্থপূর্ণ: "দেখিলাম বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু বিচলিত হইয়াছেন। কথাটা চাপা দিবার জন্য আমি বলিলাম—চলিত ভাষায় বই লেখা কি আপনার মত নয়? তিনি বলিলেন—ভাষাটা মার্জিত হওয়া চাই।"—কিন্তু চলিতভাষার অর্থ কি অমার্জিত ভাষা? আসলে, বিদ্যাসাগরের ভাষা-আদর্শ ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা-আদর্শ একটু পৃথক ছিল। এঁরা কেউ একে অপরের আদর্শ পছন্দ করতেন না। তা সত্ত্বেও দুয়েরই লেখার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি শ্রেষ্ঠ।

স্থিররূপে উপলব্ধি করেছিলেন, আর অন্তরের আবেগ ও সাহিত্যবুদ্ধির স্থির প্রয়োগে দুয়েরই মূল্য চিরদিনের জন্য নির্দেশ করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বিদ্যাসাগরের দুই প্রত্যক্ষ কীর্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—একটি বাংলা গদ্যে পাঠের সৌকর্যার্থে কমা, সেমিকোলোন প্রভৃতির প্রবর্তন। দ্বিতীয়টি সূক্ষ্মতর—বাংলা গদ্যের ছন্দ সৃষ্টি, অথবা যেভাবে বাঙালীর কণ্ঠ অর্থগত ও স্বরগত নিয়মে বাক্যকে ভাগ করে নেয়—সেই সেন্সগ্রুপ ব্রেথ্‌গ্রুপকে সমন্বিত করে বাংলা কথার প্রাণছন্দকে সৃষ্টি করা। একটি স্থূল, অপরটি সূক্ষ্ম, কিন্তু দুই-ই বিদ্যাসাগরের শিল্পচেতনার প্রমাণ।

'প্রথম যথার্থ শিল্পী'

"বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাঙ্গালায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাঙ্গালা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।"—রবীন্দ্রনাথের এই কথাটির মধ্যে সমগ্র বিদ্যাসাগর সাহিত্যের মূল সত্য নিহিত আছে, আমরা আজ তা মনে করি। যেমন, বিদ্যাসাগরের রচনার সাহিত্যিক মূল্য বুঝতে হলে বাংলা গদ্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান মনে রাখা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, এই কথাও বুঝতে হবে—বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার "প্রথম যথার্থ শিল্পী" অর্থাৎ শুধু লেখক নন, প্রচারক নন, শিক্ষাগুরু নন; সেসবের দায়িত্ব মেনে নিয়েও—তার সীমা অতিক্রম করে, বিদ্যাসাগর সাহিত্যশিল্পী।

বাংলা গদ্যের পটভূমি

বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের স্থান বুঝতে হলে তাই বাংলা গদ্যের ঐতিহাসিক পৃষ্ঠভূমি একটু মনে রাখতে হয়। বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও বাংলা গদ্যের ইতিহাসের ধারা অনুশীলন করেই তা লাভ করা প্রয়োজন। (এজন্য সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থও পাঠ করা দরকার। সংক্ষেপে লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা'র দ্বিতীয় খণ্ডেও তা পাওয়া যায়।) কিন্তু সে জন্য আহোমরাজকে লেখা কোচ্‌বিহারের মহারাজা নরনারায়ণের পত্র (খ্রী ১৫৫৫) থেকে আরম্ভ করে পুরাতন বাংলা চিঠিপত্র-দলিল-দস্তাবেজের গদ্য, নিবন্ধাদির গদ্য, গল্পের গদ্য, পর্তুগীসদের প্রভাবে লেখা (দোম আন্তোনিও, ও মানোয়েল দ্য আস্‌সুম্প্‌সাম্‌-এর) বাংলা গদ্য, ইংরেজের (নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড প্রমুখদের) আয়োজন পেরিয়ে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের (১৮০০ খ্রী) যুগে পৌঁছনো—এই ভূমিকার সীমাবদ্ধ পৃষ্ঠার মধ্যে তা সম্ভব নয়, জরুরীও নয়।

এমনকি, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আমল থেকে (১৮০১, রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', কেরির 'কথোপকথন') একেবারে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব ('বেতাল পঞ্চবিংশতি'—১৮৪৭, সাহিত্যশিল্পের অসামান্য নিদর্শন 'শকুন্তলা'—১৮৫৩)—এই প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপ্ত বাংলা গদ্যের (পুস্তক, পুস্তিকা, সংবাদপত্র, উপাখ্যান, কাহিনী প্রভৃতির) ধারাবাহিক পরিচয় থেকেও সেই কারণেই ক্ষান্ত থাকতে হচ্ছে। তথাপি—পরিপ্রেক্ষিতবোধের জন্য বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী প্রধান দু-চারজনের দানের কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন; তাঁরাই বাংলা গদ্যের পথিকৃৎ। সেদিক থেকে আমাদের পক্ষে প্রধানত স্মরণীয়—কেরি, মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতির দান; সেই সঙ্গে বাংলা সংবাদপত্রের দান।

উইলিয়ম কেরির 'কথোপকথন' (১৮০১) অসামান্য বস্তু। বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন স্তরের বাঙালীর শিষ্ট আলাপ থেকে মেয়েলি কোঁদল ('কঁদল') পর্যন্ত নানা রীতির কথিত বাংলার নিদর্শন তাতে পাওয়া যায়। অবশ্য ক্রিয়াপদ প্রভৃতিতে 'সাধু' ভাষার রূপ কিছু কিছু আছে। মূলত তবু তা চলতি বাংলাই।

দৃষ্টান্ত হিসাবে 'ভদ্রলোকে-ভদ্রলোকে' কথোপকথনের একটি ক্ষুদ্র অংশ নিই।

"তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্ররা কেমন আছেন।

"তাঁহারা মহারাজা চক্রবর্তী—তাঁহাদের সহিত কার কথা তাঁহার প্রতিযোগিতার লোক আমার দেশে নাই।

"এবার কোম্পানীর কায পাইয়া মহা ধনঢ্য হইয়াছে তাঁহারদের সমান ধনী লোক আমার দেশে চাকরি করিয়া হইতে পারেন নাই।

"কেবলি ধন নহে বিষয়ও অনেক করিয়াছে। আজ নাগাদ কমবেশী লাকো টাকার জমিদারী করিয়াছে।

"সমস্তই ভাগ্যের বশীভূত দেখ দিকি তাঁহারা কি ছিলেন এখন বা কি হইয়াছেন। এ আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে।"

এ নিশ্চয়ই খাঁটি বাংলা। কেরি বৈজ্ঞানিকসুলভ দৃষ্টিতে 'কাজের বাংলা' খুঁজে নিয়েছেন। তবে সাহিত্যশিল্পের বাংলা এ নয়।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকেই কেউ কেউ প্রথম গদ্যশিল্পী বলে গণ্য করেন—রামমোহনের সম্বন্ধে কারও কারও বাড়াবাড়ির উত্তরে মৃত্যুঞ্জয়কে নিয়ে বাড়াবাড়ি চলে। তাঁর দিনের পণ্ডিতদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় গদ্যগুরু; নানা ধরনের লিপিকৌশল (tour de force) দেখাতে ওস্তাদ। রামমোহনের সে চেষ্টা একেবারেই ছিল না—থাকবার কথাও নয়। কিন্তু বাংলা ভাষার মূল রূপ রামমোহন আয়ত্ত করেছিলেন। বিচার ও আলোচনার গদ্যই তিনি তৈরি করতে চেয়েছিলেন—আমরা তা পরে দেখব।

মৃত্যুঞ্জয়ের লেখায় স্বভাবতই বিষয়বৈচিত্র্য আছে, তদনুযায়ী ভাষারও বৈচিত্র্য আছে—বিশেষ করে 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় (রচিত ১৮১৩ [?], প্রকাশিত ১৮৩৩) সে অবকাশ বেশ ছিল। তাতে আমরা অন্তত তিন রকম গদ্যরীতির নমুনা পাই (দ্রষ্টব্য : লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা', ২য় খণ্ড)—জটিল, অসার্থক দৃষ্টান্তও আছে প্রচুর। একদিকে সংস্কৃতানুরাগী সাধুভাষা যার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ভাষারও আত্মীয়তা দেখা যায় (—কিন্তু বঙ্কিমেরই কি নেই ?) ; মাঝখানে, সরল স্বচ্ছন্দ সাধুভাষা (বেশি নয়) ; অন্যদিকে প্রায় কথ্য ভাষা—যা কেরির 'কথোপকথনে'র কথা মনে করিয়ে দেয়। সংক্ষিপ্ততম উদ্‌ধৃতি দৃষ্টান্তস্বরূপ দেওয়া যাক :

> 'দণ্ডকারণ্যে প্রাচীননদীতীরে এক তপস্বী তপস্যা করেন বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য তপঃ করিয়াও তপঃসিদ্ধিভাগী হয় না। দৈবৎ ঐ তপোধনের তপোবনেতে এক দিবস নারদ মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।' ইত্যাদি

সংস্কৃতপ্রধান হলেও ভালো রচনা। তারপর,

> 'যে সিংহাসনে কোটি কোটি লক্ষ স্বর্ণদাতারা বসিতেন, সে সিংহাসনে মুষ্টিমাত্র শিক্ষার্থী বসিল। যে সিংহাসনে বিবিধ প্রকার রত্নালঙ্কারধারীরা বসিতেন, সে সিংহাসনে জন্মবিভূষিত সর্বাঙ্গ কুযোগী বসিল।' ইত্যাদি।

শিল্প বটে, কিন্তু বাক্যাড়ম্বরপ্রধান শিল্প। বরং তার অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই ধরনের লেখা—বাগ্‌বাহুল্যহীন আখ্যানের ভাষা :

> 'একস্থানে অনেক বক বসিয়াছিল অকস্মাৎ সেইস্থানে মানসসরোবরনিবাসী এক রাজহংস আসিয়া উপস্থিত হইল।' ইত্যাদি।

সর্বশেষে—আরও সহজ, যদিও এরূপ নিদর্শন বিরল :

> 'মোরা চাষবাসের ফসল পাব রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছর শুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো ছেলেপিলাগুলি পুষিব।' ইত্যাদি।

এই কথ্যরীতির ক্ষেত্রেই আমরা পাই খাঁটি বাংলা, তবে শিল্পমাত্রা তাতে বিশেষ মান্য হয়নি। মৃত্যুঞ্জয়ের শিল্পকৌশল স্বীকার্য। কিন্তু অনেক কারণেই তাঁর শিল্পবোধ খণ্ডিত, এবং শিল্পরীতিও ব্যাহত। মৃত্যুঞ্জয় নানারূপ ভাষার পরীক্ষা করেছেন—সিদ্ধান্তে পেঁছতে পারেননি। বিষয়ের দিক থেকে বৈচিত্র্য থাকলেও রীতিস্থিরত্ব নেই। আর বিচার-যুক্তিতে তিনি (রামমোহনের তুলনায়) কুযুক্তিপরায়ণ, অশালীন, কটূক্তিবিলাসী। ভাষারীতিতে কৌশল থাকলেও পূর্বাপর স্থিরগতি ও স্বাচ্ছন্দ্য নেই—ভাষার কোনো আদর্শ সম্বন্ধে তিনি কৃতনিশ্চয় হতে পারেননি, অথচ টানটা সংস্কৃতপ্রাধান্যের দিকে—পণ্ডিতের পক্ষে তা অস্বাভাবিক নয়।

রামমোহনের বাংলা গদ্য সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকরে' (১৮৫৪ সালে) যা বলা

হয়েছে, তা মোটের উপর যথার্থ : "দেওয়ানজী ('রাজা' উপাধিটা বিলাতযাত্রার কিছু পূর্বে প্রাপ্ত ; তার পূর্বে বাঙালী সমাজে ডিগ্‌বির দেওয়ানের 'দেওয়ানজী'ই ছিল সম্মানসূচক উপাধি—লেখক) জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন। তাহাতে কোনো বিচার ও বিবাদ-ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাব সকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত ; এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।" অর্থাৎ রামমোহন শিল্পী নন—বিচারকুশল তার্কিক। গদ্যসাহিত্যসৃষ্টি তাঁর কল্পনায়ও ছিল না। রামমোহনের বিচারপদ্ধতিও লক্ষণীয়—তা সংস্কৃত শাস্ত্রবিচারের ঐতিহ্যানুযায়ী মধ্যযুগের স্কুলম্যান-এর পদ্ধতি। (বিদ্যাসাগরও এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন।) কারণ, পণ্ডিতদের ঐতিহ্যগত পদ্ধতির তখনও সমাজে প্রতিষ্ঠা ছিল। এ পদ্ধতির গুণ আছে ; দোষও আমাদের নিকট স্পষ্ট। যুক্তিতর্কের আধুনিক রীতির প্রচলনে সেই পণ্ডিতী পদ্ধতি এখন প্রায় বাতিল। রামমোহন 'জলের ন্যায়' বাংলা লিখতেন, এ কথা তাঁর সমকালীনদের সঙ্গে তুলনায় সত্য হতে পারে, এখন তা স্বীকার করা কঠিন। যা হোক, রামামোহনের ভাষারও যা প্রধান প্রধান গুণ তা স্মরণীয় : রামমোহন প্রথম থেকেই (বেদান্তগ্রন্থের অনুবাদ, ১৮১৫) বাংলা বাক্যের মূল প্রকৃতি ধরতে পেরেছিলেন। বাংলা গদ্যভাষার 'অন্বয়'—কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া প্রভৃতির বাক্যমধ্যে যথাযথ স্থান—তিনি তখনই স্থিরভাবে নির্দেশ করেছেন। তাঁর ব্যাকরণও ভাষাবোধের চমৎকার প্রমাণ। দ্বিতীয়ত রামমোহন বক্তব্যকে সরল করার জন্যই লিখতেন—শব্দ বা বাক্যের খেলা দেখাবার ইচ্ছায় নয়। তৃতীয়ত, তার্কিক রামমোহন বিপক্ষের বিরুদ্ধে কটূক্তি প্রয়োগ করেননি, এবং অপরের কটূক্তিকে যুক্তির দ্বারা নিরসন করেছেন। তাতে মাঝে মাঝে স্মিত হাস্যরেখাও দেখা যায়। 'প্রবর্তক-নিবর্তক সংবাদে' স্ত্রীজাতির গুণাবলীর সমর্থনে রামমোহন শুধু অভুদ্ত উদার দৃষ্টির পরিচয় দেননি—সে লেখাতে রীতিমত আন্তরিকতার স্পর্শও আছে। না হলে, রামমোহনের লেখায় রসবোধের বিশেষ আর প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনায় এসব গুণের (তার সঙ্গে রসবোধেরও) সমাবেশ ঘটেছে—তাতেই বিদ্যাসাগর গদ্যশিল্পী।

রামমোহনের সময়কার তাঁর প্রতিপক্ষ 'নববাবুবিলাসে'র ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু গদ্যসাহিত্য রচনা করেছিলেন। সেদিক থেকে টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্রের) 'আলালের ঘরের দুলালে'র গুরুত্বই সর্বাধিক। তা চমৎকার লেখা। কিন্তু বর্তমান বিশেষ প্রসঙ্গে তা গৌণ। সেই কারণে, সাংবাদিক লেখকদের কথাও এখানে নিষ্প্রয়োজন—কাজের বাংলা গদ্য গড়তে তাঁরাই সর্বাপেক্ষা বেশি সাহায্য করেছেন, এ কথা তবু ভোলা উচিত নয়। তার মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বাংলা গদ্যই

অধিক উল্লেখযোগ্য। স্বয়ং বিদ্যাসাগর ছিলেন সে পত্রিকার সঙ্গে জড়িত। নানা কারণেই, অক্ষয়কুমার দত্ত তখন 'তত্ত্ববোধিনী'র সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য লেখক—যদিও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসুও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় বাংলা গদ্যে আরও সজীবতা সঞ্চার করছিলেন। অক্ষয়কুমারের গদ্যগ্রন্থগুলি এখন আদৃত নয়। 'বাহ্যবস্তুর সঙ্গে মানববস্তুর সম্বন্ধবিচার' (১৮৫২-৫৩), ও বিশেষ করে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১৮৭০-১৮৮৩) বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায়, লিপিকুশলতায় বাংলা ভাষার চিরকালের সম্পদ। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের সাধারণভাবে যা ত্রুটি তাও স্বীকার্য—তাঁর ভাষায় সরসতা কম, তা বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের ভাষা, এবং অনেকটা বিশুষ্ক যুক্তিবাদের ভাষা। এখানেই বিদ্যাসাগরের গল্পরচনার সার্থকতা—তাও যুক্তিবাদী লেখা, কিন্তু সরস; এবং প্রয়োজনমত রসাভিষিক্ত। তা বুদ্ধিকে জীইয়ে তোলে, প্রাণকে সজীব করে। বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্য তাই আত্ম-আবিষ্কার করল।

বাংলা গদ্যের এই ক্রমবিকাশ ও ক্রমপ্রতিষ্ঠার ধারায় কাউকে 'জনক' বলা বোধ হয় সংগত নয়। সংগত হলে, বিদ্যাসাগরকেই তা বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁকে 'বাঙ্গালা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী' বলাই বরং সর্ব রকমে সুসংগত।

বিষয়বিভাগ ও ভাষার বৈশিষ্ট্য

সেই সাহিত্যশিল্পপ্রসঙ্গে প্রবেশ করবার পূর্বে আমরা বিশেষ করে একবার স্মরণ করতে বলি—বিদ্যাসাগরের রচনাসমূহের কথা। রচনাপঞ্জীতে সেসবের কালানুক্রমিক প্রকাশধারা উল্লিখিত হয়েছে। তার প্রধান প্রধান বিভাগও আমরা লক্ষ্য করেছি—যথা, শিক্ষাবিষয়ক রচনা, সমাজসংস্কারমূলক রচনা, এবং সাহিত্য ও বিবিধ রচনা। এই তিন বিভাগের কোনো বিভাগই যে অবজ্ঞেয় নয়, তাও আমরা জানি। সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকা অনিবার্য। উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ অনুযায়ী প্রকাশেরও থাকে বিশিষ্ট রীতিপদ্ধতি। এক কথায়, বিষয় ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভাষার রূপ গড়ে তোলাই সার্থক শিল্পীর কাজ। বিদ্যাসাগর সে অর্থে যে যথার্থ শিল্পী ছিলেন—এ কথা আমরা তাঁর শিক্ষাবিষয়ক ও সমাজবিষয়ক রচনার আলোচনায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায়) বুঝতে পেরেছি। আবার, বিশদ করে বলার, বা সেসব লেখার ভাষাশিল্পের বৈশিষ্ট্য আবার ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই। যতটুকু প্রয়োজন শিল্প-আলোচনাতেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

সাধারণভাবে প্রথম কথা আমরা জানি—সাহিত্যসৃষ্টি বিদ্যাসাগরের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না—সে উদ্দেশ্য একেবারে অনুপস্থিত ছিল, তাও নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ছিল গৌণ উদ্দেশ্য, সহায়ক পদ্ধতি। তিনি জানতেন—প্রাঞ্জল, মার্জিত

বাংলা না হলে পাঠ্যপুস্তকও অপাঠ্য। অবশ্য, 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রভৃতিতে সাহিত্যরচনাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, বলা উচিত। অন্যত্র মুখ্য উদ্দেশ্য কী? প্রথমত, শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক ধরা যাক। এক্ষেত্রে মুখ্য উদ্দেশ্য কোনো একটি শিক্ষণীয় বিষয় বিশুদ্ধ মার্জিত ভাষায় উপস্থাপিত করা; সেখানে প্রথম দ্রষ্টব্য হল বিষয়ের দিক; দ্বিতীয়, পাঠার্থীর বয়স ও বুদ্ধির মান। এই দুই দিকের দাবি অনুসারে ভাষার রূপ স্থির করতে হয়। ছাত্রপাঠ্য পুস্তকরচনায় তাই হল মুখ্য শিল্প। তারই মধ্যে বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে এজন্য গল্প ও কৌতুকের সমাবেশ করেছেন, তাতে লেখা সরস হয়ে উঠেছে। 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা' থেকে 'আখ্যানমঞ্জরী'র পাঠগুলিতে দেখা যায় বিষয়ানুযায়ী ভাষার নানারূপ বৈশিষ্ট্য ও নানা রীতির দৃষ্টান্ত। সেখানে আমরা বৈচিত্র্যও দেখতে পাই, এইটিও লক্ষণীয়। এগুলিকে ভাবে বা ভাষায় প্রাইমারি রীডার বলা নিশ্চয়ই সুবিচার নয়—যদিও এগুলি সাহিত্যরচনা নয়। আবার ঠিক বিদ্যাসাগরী ভাষাও নয়।

বিদ্যাসাগরের রচনার দ্বিতীয় বিভাগ সমাজসংস্কারমূলক রচনা—তার দুটি ভাগ: প্রচারমূলক-বিচারপ্রধান লেখা, এবং বেনামীতে প্রচারভিত্তিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লেখা। এই প্রথম ভাগটায় লেখকদের ভাষা বিচারে-যুক্তিতে কতকটা কণ্টকিত হবার কথা, রামমোহনের হয়েছে, বিদ্যাসাগরের লেখায়ও কোথাও কোথাও সেরূপ হয়েছে। তবু সেসব রচনা সফল হয়েছে তার কারণ, বিদ্যাসাগরের এসব বুদ্ধিগ্রাহ্য রচনাও নীরস নয়—যুক্তির দীপ্তি, চিন্তার সর্বব্যাপী শৃঙ্খলাবোধ, রুচির ও ভাষার মার্জিত সংযম, উদ্দেশ্যের গাম্ভীর্য (seriousness)—এজাতীয় লেখার সার্থকতা এসবে—সাহিত্য-কলায় নয়, রসসৃষ্টিতেও নয়। বিদ্যাসাগরের প্রতিপক্ষদের লেখার সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে তাঁর লেখা সুপাঠ্য হয়েছে। প্রতিপক্ষদের নিশ্চয়ই যুক্তির ও পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল না—অভাব ছিল গাম্ভীর্যের ও রচনাশক্তির।

আবেগের স্পর্শ লাগাতে এই বুদ্ধিগ্রাহ্য লেখাও যে কত অমোঘ হয়ে ওঠে তাও বিধবাবিবাহবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহারে আমরা দেখছি। কিন্তু এইগুলিই সব নয়। প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত জিনিসও যে রসবস্তুতে পরিণত করা যায় তার প্রধান দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগরের বেনামী লেখাগুলি—কৌতুক-ব্যঙ্গে মুখর উল্লাসিত বিদ্যাসাগরের কণ্ঠস্বর যেন সেসবে শুনতে পাওয়া যায়। কোথায় তবে সংস্কৃতানুরাগী ভাষারীতি? কোথায় তাতে 'বিদ্যাসাগরী' ভাষা? এ যে সরস, সতেজ চলতি ভাষার আদি সংস্করণ!

এর পরেই তৃতীয় বিভাগের, বিশেষ করে সাহিত্য বিভাগের কথা ওঠে। কিন্তু তাতে প্রবেশের পূর্বে আরও দুটি বিশিষ্ট ধারার কথাও মনে রাখতে হয়—যেমন, 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩)। চিন্তার স্বচ্ছতায়,

বুদ্ধির ও বিদ্যার স্থির আয়োজনে এবং ভাষার মার্জিত শ্রীতে এ কি বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রথম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয় ? এ প্রবন্ধ-সাহিত্যের শিল্প-সার্থকতা ঐখানেই—বিষয়ের সুনিপুণ ব্যবস্থাপনায়, যুক্তির সফল সমাবেশে, আর ভাষার প্রাঞ্জলতায়, উপাদেয়তায়।

বিদ্যাসাগর-সংকলিত ও সম্পাদিত 'ঋজুপাঠ' থেকে 'মেঘদূত', 'উত্তরচরিত', 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্', 'হর্ষচরিত' প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন',—এবং অন্য কোনো কোনো গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'—ঠিক এ গোষ্ঠীর রচনা নয় বটে, কিন্তু ওসবও এরূপ নিবন্ধসাহিত্যজাতীয় রচনা, প্রায়ই বৈজ্ঞানিক সমালোচনাদৃষ্টির তা সুদৃষ্টান্ত। এসব ছাড়াও, বিবিধ বিভাগে বহুবিধ রচনাই আছে—যথা, 'নিষ্কৃতিলাভ-প্রয়াস' (১৮৮৮)। আসলে সাহিত্যরচনা অপেক্ষাও অন্য কারণে তাদের গুরুত্ব। তবে তার গুণ সহজবোধ্যতা—তথাকথিত 'বিদ্যাসাগরী' ভাষায় তা ব্যর্থ হত।

সাহিত্য-বিভাগের গ্রন্থ

সাহিত্যবিভাগীয় যেসব রচনা সাহিত্য হিসাবেই বিশিষ্ট, রচনাসংগ্রহের এই তৃতীয় খণ্ডে তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেসবের নাম করাই এখানে যথেষ্ট—'বাসুদেব চরিত'-কে তার মধ্যে গণনা না করলে (১) 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) ; (২) 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩) ; (৩) 'শকুন্তলা' (ডিসেম্বর, ১৮৫৪) ; (৪) 'সীতার বনবাস' (১৮৬০) ; (৫) 'ভ্রান্তিবিলাস' (ডিসেম্বর, ১৮৬৯) ; (৬) 'বিদ্যাসাগর চরিত' (সেপ্টেম্বর, ১৮৯১) ; এবং (৭) 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' ('সাহিত্য', ১৮৯২)—এই কয়খানাই এই শাখায় প্রধান। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত রচনা এর মধ্যে গণ্য নয়। 'মহাভারত' (উপক্রমণিকা ভাগ—জানুয়ারি, ১৮৬০) এই সঙ্গে গণনীয় না হলেও তা অনুবাদশিল্পের দৃষ্টান্ত। (বামনাখ্যানম্-এর সে গুরুত্ব সামান্য।) বাংলা গদ্যরীতির দিক থেকে 'মহাভারত'কে রচনাসংগ্রহের সাহিত্য-বিভাগেই অন্তর্ভুক্ত করা চলে। 'অনুবাদ' সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা হচ্ছে। আপাতত আমাদের বক্তব্য এই—সাহিত্যরচনার উল্লিখিত প্রতিটি গ্রন্থের স্বতন্ত্র ও বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, প্রতিটি লেখারই উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই 'বিজ্ঞাপনে' ব্যক্ত করেছেন—সেই 'বিজ্ঞাপন'গুলিই মূলত ভূমিকা। সেসবের পরিপূরক প্রতিটি গ্রন্থের সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য যোগ করা যেতে পারে (শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গবেষকের ও সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে ইদানীং তা সার্থকভাবে করেছেন)। অবশ্য বিদ্যাসাগরের মূল রচনা সকলেরই পরিচিত, তা তথাপি পাঠ্য—বিশদ করে একথা বলা অনাবশ্যক। এসব লেখার শিল্পগত

উৎকর্ষের কথা স্বতঃই তখন অনুভব করা যায়। উদ্‌ধৃতি না দিলে যেমন প্রমাণ সুনিশ্চিত হয় না, উদ্‌ধৃতি দেওয়াও তাই বাহুল্য। বিশেষ করে উদ্‌ধৃতি দিতে গেলে আর শেষও পাওয়া যায় না।

'বেতালপঞ্চবিংশতি'র প্রথম সংস্করণ (১৮৪৭) পাওয়া যায় না। সে সংস্করণে নাকি অনেক ত্রুটি ছিল; দ্বিতীয় ও পরবর্তী সংস্করণে ভাষার দুরূহতা অনেকটা দূর করা হয়েছে। তাতেও এই প্রথম দিকের রচনায় অনেক দোষ রয়ে গিয়েছে। সেসব সত্ত্বেও সাহিত্যের গদ্যের জন্ম 'বেতালপঞ্চবিংশতি'তে লক্ষ্য করা যায়—গম্ভীর ভাব, বর্ণনার রমণীয়তা, এমনকি স্বচ্ছন্দ কথ্যভাষার বাগ্‌ভঙ্গি—এসবও এ প্রাথমিক প্রয়াসে দেখা যায়। 'বিদ্যাসাগরী ভাষা' বলতে আমরা বুঝি সংস্কৃতপ্রাধান্য, দুরূহ শব্দের প্রয়োগ, ভাবগাম্ভীর্য অপেক্ষাও শব্দের গুরুগাম্ভীর্য। 'বেতালে' নিশ্চয়ই তা প্রচুর, কিন্তু সে ভাষার প্রধান ও কতকাংশে একমাত্র আধার 'বেতাল'। আরেকটা কথাও স্মরণীয়। বিদ্যাসাগর এরূপ সংস্কৃত আখ্যানকাব্যের সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন না। গল্পের একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে, তবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য হিন্দী 'পচ্চিসী'র অনুবাদ চাই; কারণ বোধ হয় সাহেব ছাত্রদের কাছে গল্পের জন্য তা আকর্ষণীয় হবার কথা। কিন্তু এসব গল্প সামাজিক নীতি ও রুচির যে সাক্ষ্য বহন করে, তাতে স্পষ্ট—এসব জাতির অবক্ষয়ের যুগের সাহিত্য। তবু বিদ্যাসাগর হিন্দী 'বেতালপচ্চিসী'র অনেক কিছু বাদ দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের অন্যান্য অনুবাদ-গ্রন্থের মতোই এ গ্রন্থও 'অনুবাদ'—অর্থাৎ অনুবাদ নয়—মূলের অনুসরণ মাত্র।

'বেতালে'র পরেই লেখা হয় 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৮)—তাও 'অনুবাদ' ও শিক্ষার্থীদের জন্যই তাও রচিত। এখানে এ গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু যোগ করা প্রয়োজন। প্রথমত, ভাষার কথা। 'বেতালে'র সেই 'বিদ্যাসাগরী ভাষা'র প্রাথমিক পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। যথার্থ বিবরণপ্রধান বাংলার এ নমুনা একেবারে নতুন ও মোটের উপর উপাদেয়। এই ভাষার গুণেই গল্পপ্রধান 'বেতালে'র অপেক্ষাও 'বাঙ্গালার ইতিহাস' বেশি চিত্তাকর্ষক। সত্যকারের স্বচ্ছন্দগতি বাংলা ভাষার সন্ধান বিদ্যাসাগর পেয়েছেন। এখানে তা প্রথম দিয়েছেন—হয়তো সাংবাদিকদের বাংলা গদ্যে তার পথ তৈরি হয়ে উঠছিল। বিদ্যাসাগরের পরবর্তী নিবন্ধাদিতে এ রীতির উৎকর্ষ আরও দেখা যাবে। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' সম্বন্ধে দ্বিতীয় লক্ষণীয় কথা—বিদ্যাসাগরের ইতিহাস-বোধ। তিনি প্রধানত মার্শম্যান ও অন্যান্য ইংরেজ লেখকদের তথ্যাদি অনুসরণ করেছেন। তার বাইরের তথ্য সম্ভবত তাঁর পক্ষে দুষ্প্রাপ্য ছিল, আর পাঠ্যপুস্তকে সেরূপ গবেষণা ও বিতর্কমূলক বিষয়ের অবতারণা সাধ্য হলেও—অনুমোদিত হত না। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগর দুজনাই দেশের ইতিহাসের গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন;

বঙ্কিম তা নিয়ে অনেক বেশি ভাবিত হয়েছেন, বিদ্যাসাগরেরও ভাবনা ছিল। আমরা জানি, ভারতের ইতিহাস লেখার জন্য তিনি বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করে প্রস্তুত হচ্ছিলেন; কিন্তু রোগকবলে পড়ে তা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তৃতীয় কথা, বিদ্যাসাগর ইংরেজ রাজত্বের গুণ দেখেছেন—অর্থাৎ তখনো সাম্রাজ্যবাদকে চিনতে পারেননি—নিশ্চয়ই এ তাঁর দৃষ্টির সীমাবদ্ধতার প্রমাণ। শেষ ত্রুটি বিদ্যাসাগর নবাব সিরাজদ্দৌলাকে 'নৃশংস রাক্ষস' ধরে নিয়েছেন। এ ত্রুটি সম্পূর্ণ ত্রুটি নয়। সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার যুগে আমাদের চোখে সিরাজদ্দৌলা যতটা নিষ্পাপ হয়ে উঠেছেন, আসলে মোটেই তিনি তা ছিলেন না। আসলে সিরাজ ছিলেন নির্বোধ, কোপনস্বভাব, সময়ে সময়ে নৃশংসও। তবে তখনো তিনি বালকমাত্র ছিলেন—তাও স্মরণীয়।

নিবন্ধজাতীয় প্রথম পুস্তক অবশ্য 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩)—বেথুন সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতার তা বর্ধিত রূপ। এটি অবশ্য সাহিত্যের কালানুক্রমিক ইতিহাস নয়—সংস্কৃত সাহিত্যের সার-পরিচয়, বাংলা ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম আলোচনা। কালানুক্রমে আলোচনা না করে, 'শ্রাব্যকাব্য' ও 'দৃশ্যকাব্য' রূপে ভাগ করে, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য ইত্যাদি রূপগত ধারায় আবার তা বিদ্যাসাগর ভাগ করেছেন। অন্য দিকে, দৃশ্যকাব্যকে কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, শূদ্রক ইত্যাদি স্রষ্টার নামে চিহ্নিত করেছেন। পুরাণ, স্মৃতি, দর্শন সম্বন্ধে কিন্তু তিনি কিছু বলতে অনিচ্ছুক। তাঁর মূল আদর্শ হয়তো ম্যাক্স্মুলার, হেমান উইলসন প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের প্রত্নতাত্ত্বিক ধারণা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত। তবে তাঁর সমালোচনাদৃষ্টি নিজস্ব। তাই দেখি—কালিদাস প্রভৃতির রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের প্রশংসাও যেমন এ বক্তৃতায় অকুণ্ঠিত, তেমনি ঐতিহ্যগত আলঙ্কারিক কাব্যসমালোচনাও তাতে অগ্রাহ্য (নৈষধচরিত, ভট্টিকাব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর বিরূপতা স্পষ্ট)। বোঝা যায়, নবজাগরণের যুগে বাঙালী মনে সাহিত্যের নতুন আদর্শ ও সমালোচনার নতুন আদর্শ বীজাকারে উপ্ত হচ্ছে। এর পরে বঙ্কিমের হাতে তা অংকুরিত হবে। বিদ্যাসাগরের রচনাটি সুখপাঠ্য, এর চেয়ে বেশি বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন।

'শকুন্তলা' (১৮৫৪) গদ্যশিল্পে বিদ্যাসাগরের অনবদ্য সৃষ্টি সম্ভবত এমন শিক্ষিত বাঙালী নেই যিনি তার মাধুর্য উপভোগ করেননি। হয়তো তাঁরা জানেন—কালিদাসকে বিদ্যাসাগর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলে মনে করতেন, সেক্স্পীয়রকেও কালিদাসের উপরে স্থান দিতে তাঁর দ্বিধা ছিল। (বিদ্যাসাগরের এই মত সর্বগ্রাহ্য না হবারই কথা।) কিন্তু বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'র বিশেষ তাৎপর্য কি? এ যে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর দ্বারা প্রভাবিত হলেও 'অনুবাদ' নয়, তা স্পষ্ট। অনুবাদ কী

করে হতে পারে ? দৃশ্যকাব্য পরিণত হয়েছে শ্রাব্যকাব্যে—নাটক হয়েছে উপাখ্যান—এ কথা বলাই যথেষ্ট হত। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা—কীভাবে বিদ্যাসাগর তা কালের রুচি ও আপন সাহিত্যিক মাত্রাবোধের সাহায্যে রূপান্তরিত করেছেন। মূল আখ্যান বহু পুরাতন—কালিদাসও সে অর্থে মূলস্রষ্টা নন—সেই অর্থে শেক্‌স্‌পীয়রও মূলস্রষ্টা নন। 'শকুন্তলা'য় বিদ্যাসাগর যা সাধন করেছেন আমাদের কালে তা অত্যন্ত সার্থকভাবে আলোচনা করেছেন বাংলাদেশের রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর মুখলেসুর রহমান (দ্রষ্টব্য : 'বিদ্যাসাগর', সম্পাদক গোলাম মুরশিদ, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রকাশিত প্রথম ভারতীয় সংস্করণ)। 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' (প্রায় ৩০ পৃষ্ঠার) প্রবন্ধে তিনি মূল সংস্কৃতের থেকে কোথায় বিদ্যাসাগর ভাষান্তরণকালে কী কী পার্থক্য করেছেন, তা পরপর উদ্‌ধৃতি দিয়ে দিয়ে তুলে ধরেছেন। কেন যে সে পার্থক্য, তার পরে তা আর বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন—মূলে শকুন্তলা ও সখীদ্বয়ের অন্তরঙ্গ ঈষৎযুবতীসুলভ চপল আলাপ, রাজার তা শুনতে শুনতে রূপলোলুপ স্বগতোক্তি, পরেও প্রকাশ্য সংলাপে রাজার তদ্রূপ শব্দযোজন—এসবের পার্শ্বে বিদ্যাসাগরের ওসব স্থলের সারানুবাদ দেখলে বোঝা যায়—যুগরুচির পরিবর্তন বিদ্যাসাগর মান্য করেছেন। সংক্ষেপে, "রসের রাজা কালিদাসের রচনার সঙ্গে এখানে বিদ্যাসাগর যে আধুনিক মনোভাব, পরিমাণবোধ আর স্বাভাবিকতার সমন্বয়-সাধন করেছেন একমাত্র সৃজনধর্মী লেখকের পক্ষেই তা সম্ভব।" (পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ)।—আর বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' সত্যই সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, মোটের উপর কালিদাসের গল্পের কাঠামোই বিদ্যাসাগর গ্রহণ করেছেন, এবং তা অনুসরণ করেছেন।—এ কথাও ঠিক যে, কালিদাসের সংস্কৃতের পদমাধুর্যের বাংলা ভাষায় দু-এক স্থলে সুসম্পূর্ণ প্রকাশদান বিদ্যাসাগরেরও পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু বাংলা ভাষায় প্রণয়-উপাখ্যানের রচনায়ও কত শালীনতা, কত মাধুর্য সঞ্চার করা যায়, 'শকুন্তলা'র পূর্বে কে তা জানত ? সবসুদ্ধ সন্দেহ নেই—বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' সত্যই সৃষ্টি—আর কালিদাসের প্রতি ভক্তের যোগ্য অর্ঘ্য। না হলে কালিদাসও বাঙালীর মাথায়ই থাকতেন—বাঙালীর আপনার হয়ে উঠতে পারতেন না।

'সীতার বনবাস' (১৮৬০) এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য। 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর ভবভূতির 'উত্তরচরিত'কে তিনি কীভাবে প্রয়োজনবোধে বিভক্ত করে নিয়েছেন তা জানিয়েছেন। ক্রমে ক্রমে ঘটনাকে বিদ্যাসাগর কিভাবে বিবর্তিত করেছেন—'উত্তরচরিতে'র ও মূল রামায়ণের ধারা অনুসরণ করে ও না করে এগিয়ে চলেছেন—এসব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। (দ্রষ্টব্য : মুখলেসুর রহমানের উক্ত প্রবন্ধ।) ভাষাসৌন্দর্যের দিক থেকে কিন্তু মানতে হবে, 'শকুন্তলা'র থেকে 'সীতার বনবাসে' তা অধিকতর পরিণতিলাভ করেনি—

বরং একটু বেশী ভারী হয়ে উঠেছে। সমাসবদ্ধ বড় বড় শব্দ ও নাতিপরিচিত সংস্কৃত শব্দ 'সীতার বনবাসে' দেখা যায়। তা সহনীয় হয়েছে বাক্যের ভারসাম্যের গুণে—সেই বিদ্যাসাগরী গদ্যছন্দ সৃষ্টিতে, না হলে এ ত্রুটি গুরুতর হত। করুণরসের সঙ্গে এরূপ শব্দপ্রয়োগে বৈষম্য যে ঘটে তাও সত্য। তবু করুণরসই 'সীতার বনবাসে' প্রধান। এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'সীতার বনবাস'কে সে জন্যই বলা হয়েছিল 'কান্নার জোলাপ'। কিন্তু যে বিশেষ দৃষ্টির জন্য তা বলা সম্ভব, তাও কিন্তু বক্রদৃষ্টি। না হলে 'সীতার বনবাস' শুধু সহজ দৃষ্টিকে অশ্রুসজল করত না। করুণরসই তাই সর্বস্ব নয়। এক-একবার সজল চক্ষের কোণে দেখা যায় একছটা কৌতুকের আভাস, দেখা যায় নিসর্গ-বর্ণনার অপূর্ব রোমাণ্টিক সাফল্য, এবং সমাপ্তিতে ট্রাজিডির ঘনায়মান ছায়ায় সীতার সকরুণ অথচ মর্যাদাসচেতন আত্মাহুতি—এসব সেই অশ্রুসজল দৃষ্টিকে আনন্দে সম্ভ্রমে গাম্ভীর্যদানও করত। অন্তত এ কথা ঠিক, 'সীতার বনবাস' না হলে 'উত্তরচরিতে'র মহিমা ও বৈশিষ্ট্য বোধের পথ বাঙালী খুঁজে পেত না। 'সংস্কৃতানুরাগী ভাষা' যে কী অপূর্ব মহিমা ও রস সঞ্চার করতে পারে আজও "এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি" প্রভৃতির বর্ণনাপাঠে আমরা তা এখনো পুলকিত চিত্তে উপলব্ধি করতে পারি—ভাবে ও ভাষায়, ক্লাসিকে ও রোমাণ্টিকে, অপূর্ব এক সুসংগতি ঘটেছে এসব বর্ণনাস্থলে।

'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯), 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাসে'র মতোই মুখ্যত সাহিত্য-ধর্মের রচনা। 'শকুন্তলা'র মূলরস স্নিগ্ধ মাধুর্য, 'সীতার বনবাসে'র করুণা, 'ভ্রান্তি-বিলাসে' কৌতুকরস। যে সময়ে 'ভ্রান্তিবিলাস' রচিত, তখন সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর সমাজকর্তাদের শত্রুতায় নানাভাবে বিপন্ন, ধনী ও মানীদের প্রতিশ্রুতিভঙ্গে ঋণজালে জড়িত, বিধবাবিবাহে অগ্রসর নানা প্রবঞ্চকের জ্বালায় প্রাণেমনে দগ্ধ-বিদগ্ধ—বিদ্যাসাগরের প্রয়াসে তখন ব্যর্থতার মেঘভার চেপে আসছে, তাঁর জীবনে পড়েছে মানুষের ব্যবহারে সন্দেহ-সংশয়-হতাশার ছায়া। এমনি সময়ে এমন লঘু হাস্যের রচনায় বিদ্যাসাগর হাত দিলেন কেন? অনেকে এরূপ প্রশ্ন করেন। তাঁরা জানেন না—এরূপ সময়েই সুস্থ হৃদয় আপন 'অজ্ঞাতেই' আপনাকে সুস্থিত রাখতে চায় হাস্যকৌতুকের রসায়নে। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মধ্যে কৌতুক-রসিক মানুষটি কখনো মরতে চায়নি; এই বিরোধ-বিপাকের মধ্যেই সে স্বভাবধর্মে আপনাকে প্রকাশিত করল।

শেক্‌স্‌পীয়রের 'দি কমিডি অব্‌ এরর্‌স্‌' নামক কৌতুকনাট্যের উপাখ্যানভাগ বাংলা কথায় 'ভ্রান্তিবিলাস' (ডিসেম্বর, ১৮৬৯) নাম দিয়ে বিদ্যাসাগর সংকলিত করেন। উদ্দেশ্য—তাতে "লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে।" কালিদাস ছিলেন তাঁর

প্রিয়তম লেখক ; কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের প্রতিও বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধার অভাব ছিল না —একথা আমরা জানি। এ নাটক শেক্‌স্‌পীয়রের প্রথম দিকের (১৫৯৩?) রচনা ; প্রাচীন রোমের নাট্যকার প্লোটাস্ (টিটায়ান ম্যাকিয়ান প্লোটাস, খ্রীষ্টপূর্ব ২৫৪—১৮৪)-এর 'মেনাক্‌সি' নামক লাতিন কৌতুকনাট্যের কাহিনী এর মূল, তখনো শেক্‌স্‌পীয়র হাত পাকাচ্ছেন। শেক্‌স্‌পীয়রের প্রতিভার অতি সামান্য স্পর্শই তাতে আছে। শেক্‌স্‌পীয়রের প্রধান কোনো ট্রাজিডি কিংবা প্রধান কোনো কমিডি অবলম্বন না করে বিদ্যাসাগর কেন এই অকিঞ্চিৎকর লঘু নাটকটি বাংলায় সংকলন করলেন, তা একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন। তার উত্তর দেখেছি—"চিত্তরঞ্জন হইতে পারে"। রঙ্গকৌতুকের সাহায্যে লোকরঞ্জনের এত চেষ্টা কিন্তু বিদ্যাসাগরের আত্ম-রঞ্জনের চেষ্টাও। আমাদের দুঃখ তবু থেকে যায়—যদি বিদ্যাসাগর শেক্‌স্‌পীয়রের কোনো একখানা প্রধান নাটকের সংকলন করতেন। কারণ, তুচ্ছ বিষয় সত্ত্বেও 'ভ্রান্তিবিলাস' সত্যই উপাদেয় রচনা। বিষয় অকিঞ্চিৎকর ও কৃত্রিম, তবে মজাদার ব্যাপার। দু-জোড়া যমজ মানুষকে নিয়ে ঘরে বাইরে তাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে ভ্রান্তির সঞ্চার, একজনকে তার অন্য ভ্রাতা মনে করে ভুলের পর ভুল, হাসাহাসি-মারামারির ধূম ; সে ভুল নিরসনের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর মীমাংসা ও সমাপ্তি। বলা বাহুল্য, এ কাহিনীর কৌতুক চরিত্র-আশ্রিত নয়, বিশেষ করে কৌতুক-কথার মারপ্যাঁচ, অর্থাৎ অনেকটাই ভাষা-আশ্রিত। তবে ঘটনা বা সিচুয়েশনেই আসল প্রাণ। এক ভাইকে আর ভাই বলে ভুল করে সকলের যে উদ্ভট, জটিল থেকে জটিলতর ঘটনায় জড়িয়ে পড়া—প্রহসনপ্রায় হাসি-হল্লোড়ের তা অনিবার্য কারণ—সেই নাট্যঘটনাবলি এখানে উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে উপাখ্যানরূপে।

'শকুন্তলা'র মতোই মূল দৃশ্যকাব্যকে বিদ্যাসাগর এখানেও শ্রাব্য ও পাঠ্য কাব্যে রূপান্তরিত করেছেন—আর তাতে 'মৌলিকতা'র প্রকাশ যদি না ঘটে থাকে তা হলে বলা যায়, শেক্‌স্‌পীয়রের কমিডির সেই মৌলিকতা ততোধিক কম। বিদ্যাসাগর শেক্‌স্‌পীয়রের লেখার 'অনুবাদ' করেননি, অনুসরণ করেছেন ; মূলের দীর্ঘ সংলাপ ও অশ্লীল অংশ (আধুনিক রুচিতে অগ্রাহ্য বলে) কোথাও কোথাও বাদ গিয়েছে। এদেশীয় পাঠকের কথা মনে রেখে বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্ত্য বিষয়কে যথাসম্ভব দিয়েছেন এদেশীয় স্থান-কাল-পাত্রের নাম ও পরিচ্ছদ। তাই স্থান ও পাত্রপাত্রীরা দেশীয় নাম পেয়েছে ; যেমন, সিরাকিউস হয়েছে 'হেমকূট', ইফিসাস—'জয়স্থল', অ্যান্টিফোলাস —'চিরঞ্জীব', ড্রোমিও—'কিঙ্কর', এড্রিয়ানা—'চন্দ্রপ্রভা' ইত্যাদি। কাহিনীও সংগতি রেখে হয়েছে দেশীয় ভাষ্যে যথাসম্ভব ভারতীয়, কাল্পনিক প্রাচীন যুগের কথা—ঠিক সমসাময়িক বাংলা দেশের নয়। পাশ্চাত্ত্য নাম-ধাম ভারতীয় পাঠকের কাছে বিদেশীয়

বা বিজাতীয় থেকে যায় ; আর যতটা তা বিজাতীয় থাকে ততটা দেশীয় পাঠকের তা চিত্তরঞ্জনেও বাধা হয়। এরূপ ভাষ্যরচনায় সৃষ্টিকৌশল না লাগলেও বুদ্ধিকৌশল প্রয়োজন, সংগতিবোধ প্রয়োজন, মাত্রাবোধও প্রয়োজন। তা ছাড়া, বাক্যের যে চাতুর্য এরূপ শেক্‌স্‌পীয়রীয় (ও তৎকালীন পাশ্চাত্ত্য) কমিডির প্রধান একটা ধর্ম, বাংলা ভাষ্যে তাকে সংগতি রেখে ভাষান্তরিত করা একটা বিশেষ সমস্যা ; ভাব ও ভাষার উপরে, সুসংগত আধিপত্যের বলেই তা সাধ্য। প্রহসনজাতীয় এই বেপরোয়া হাসিরঙ্গের বিষয়কে সম্পূর্ণ কথ্য ভাষার সহায়ে প্রকাশ করাই এখন সমীচীন। সেই কথ্য বাংলায় তা না সাজিয়ে সাধুভাষায়ও কতটা সার্থক করে তোলা যায় বিদ্যাসাগর তার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এখানে সাধুভাষা কথ্যভাষার মতোই বেশ চলন্ত। বিদ্যাসাগর এসব দিকে অপরিমিত সাফল্যের পরিচয় রেখেছেন। মূলের দু-একটুকু বাক্‌চাতুরী উদ্‌ধৃত করে বিদ্যাসাগরের ভাষ্য পাশে রাখলে উপলব্ধি করা যায় কী অদ্ভুত শক্তিতে বিদ্যাসাগর ভাব ও ভাষার মেজাজ রক্ষা করেছেন।

'ভ্রান্তিবিলাস' সত্যই চিত্তরঞ্জন করে। এ উপাখ্যান হয়তো বাংলা কথাসাহিত্যের বিকাশেও সাহায্য করে থাকবে ; কারণ, বাংলা উপন্যাস তখনো সত্যই গড়ে ওঠে নি—তার সূচনা মাত্র হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) ও 'মৃণালিনী' (১৮৬৯)—এই তিনখানা গ্রন্থ তখন রচিত হয়েছে। এগুলি 'ভ্রান্তিবিলাসে'র মতো উদ্ভট কাহিনী নয়, ঐতিহাসিক রোমান্‌স্‌। সে হিসাবে উপন্যাসেরই স্বজাতীয়। 'ভ্রান্তিবিলাস'কে কিন্তু তা বলা চলে না—তাকে কৌতুকরসের উপাখ্যান বলাই যথেষ্ট। আসল কথা, এখানে বিদ্যাসাগরের যে রূপ আমরা দেখি তা আনন্দদায়ক—শিক্ষাগুরু নন, প্রচারপ্রাণ সংস্কারক নন, এমনকি বেনামী ব্যঙ্গরচনার বিদ্রূপবিলাসী, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লেখকও নন। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আজও সত্য ; " 'ভ্রান্তিবিলাসে' তিনি [বিদ্যাসাগর] পাঠকের বন্ধুর পর্যায়ে নেমে এসেছেন। এখানে তাঁর চিত্ত বিশুদ্ধ শিল্পীর ভূমিকাই গ্রহণ করেছে।" এই ভূমিকায় বিদ্যাসাগরকে আমরা এমন করে আর পাই না। শুধু গদ্য-শিল্পী নন, এখানে তিনি সর্বরকমেই চিত্তরঞ্জনকারী শিল্পী।

এইখানেই বিদ্যাসাগরের অনুবাদ-প্রসঙ্গও তাই উল্লেখ করে শেষ করা যাক। প্রথম থেকেই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত থেকেও অনুবাদ করেছেন, ইংরেজি থেকেও অনুবাদ করেছেন, তা আমরা জানি। বেতালও অনুবাদ নয়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস'ও নয়—ভাষান্তর এবং কতকটা ভাষ্যান্তর। সেই প্রথম রচনাসমূহেও আমরা দেখেছি (জীবন-চরিত, ১৮৪৯ ; 'চরিতাবলী', ১৮৫৬) বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন—ইংরেজি (পাশ্চাত্ত্য-ভাষার) মূলরচনাকে বাংলায় ভাষান্তরিত করা, ভারতীয় (বিশেষ করে সংস্কৃত-

ভাষার) রচনার সেরূপ ভাষান্তরসাধনের অপেক্ষা অনেক বেশি জটিল ও দুঃসাধ্য কাজ। মনুষ্যস্বভাব এক হলেও ইউরোপের ও ভারতের, দু জগতের জীবনযাত্রায় অনেক পার্থক্য ; ভাবে ও ভাষায় দূরত্ব অনেক সময়ে দুস্তর। পাশ্চাত্য রচনার বাংলায় আক্ষরিক অনুবাদ তো নিশ্চয় অসম্ভব। মূলের ভাব রক্ষা করে আমাদের নিজ নিজ ভাষায় ও নিজ বাচনভঙ্গিতে পাশ্চাত্য বিষয়ের অনুসরণই সম্ভব। 'বাঙ্গলার ইতিহাসে' তিনি তা সার্থকভাবে সম্পন্ন করেন। এরূপ বিষয়ের 'অনুবাদে' মৌলিক সৃষ্টিশক্তির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সাহিত্য-অনুবাদে যথেষ্ট রসবোধের ও রীতিবোধের প্রয়োজন, আর, রস ও রীতি সৃষ্টিশক্তিরই দুটি প্রধান উপাদান। পাঠ্যপুস্তকের ব্যাপারে বিদেশীয় বিষয়কে বিদ্যাসাগর মার্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন। 'ভ্রান্তিবিলাসে'র মতো সাহিত্যগ্রন্থে তিনি সেই সঙ্গে দিতে চেয়েছেন রসসম্পৃক্ত রূপ— 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাসে'ও সেই রূপই (সংস্কৃত নাটক প্রভৃতি অবলম্বনে) তিনি দান করেছেন। এসবকে অনুবাদ না বলে, 'অবলম্বন' বা 'অনুসরণ' বলাই শ্রেয় ; 'মৌলিক' না বললেও সৃষ্টিসরস বলতেই হবে।

বিদ্যাসাগরের অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে বিশিষ্ট উল্লেখের যোগ্য 'মহাভারত' (উপক্রমণিকাভাগ) [জানুয়ারি, ১৮৬০]—'বামনোপাখ্যান' প্রভৃতি বিশেষ গণনীয় কর্ম নয়। তা 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাসে'র মত অনুসরণে রচিত নয়। 'মহাভারতে' বিদ্যাসাগর ক্লাসিক সংস্কৃতের বাংলা অনুবাদের আদর্শ স্থাপন করেছেন। মূলকে ভাবের দিক থেকে কিছুমাত্র পরিবর্তিত না করে তিনি ক্লাসিক-গুণান্বিত বাংলা ভাষায় তা অনূদিত করেছেন। সদর্থে এ ভাষাকেই বলা যায় সত্যকার 'বিদ্যাসাগরী ভাষা'—যাতে সংস্কৃত শব্দের যোগে বাংলা ভাষায় ক্লাসিক ও রোমাণ্টিক ভাব সঞ্চারিত করা সম্ভব হয়—মূলের গাম্ভীর্য, স্থির মহিমা প্রতিফলিত করা যায়। এখনো পৌরাণিক বিষয় সম্বন্ধে রচনায় আমরা এই ক্লাসিক ভাষারীতির শরণ নিই। অত্যন্ত ভুল করেই সংস্কৃত শব্দের ঘনঘটাবহুল (সংস্কৃতানুরাগিণী), কৃত্রিম বাংলা রচনারীতিকে বলা হয় 'বিদ্যাসাগরী ভাষা'। বিদ্যাসাগরের ভাষা 'বেতালে' ছাড়া কোথাও তা নয়—রচনার উদ্দেশ্য ও বিষয়ানুযায়ী 'বিদ্যাসাগরী ভাষা'র বিচিত্ররূপ। যদিও প্রায়ই আধুনিক বাংলার তুলনায় তাতে সংস্কৃত শব্দ অধিক। সুস্পষ্ট ধারণা না থাকাতে সংস্কৃত শব্দের কৃত্রিম আড়ম্বর দেখলেই মনে করা হত তা 'বিদ্যাসাগরী ভাষা'।

'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাসে' বিদ্যাসাগরকে প্রধানত সাহিত্য-শিল্পীরূপে আমরা দেখি। এ তিনের বাইরে বিদ্যাসাগরের বিশেষ ধরনের গদ্যশিল্পী-রূপের যে পরিচয়, তা পাঠ্যপুস্তকে ও প্রবন্ধরচনায় নিহিত। বিশেষ করে তার

অসামান্য পরিচয় বেনামী ব্যঙ্গরচনায়—তা অসামান্য। কিন্তু সাহিত্যশিল্প হিসাবেও বিদ্যাসাগরের অন্তত আরও দুটি লেখা আছে—তাঁর মৃত্যুর পরে পুত্র নারায়ণচন্দ্র প্রকাশিত (১৮৯১) অসম্পূর্ণ 'বিদ্যাসাগর-চরিত (স্বরচিত)', এবং দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য'-পত্রে (বঙ্গাব্দ ১২৯৮) প্রকাশিত 'প্রভাবতীসম্ভাষণ'। একটি আত্মচরিত, অন্যটি শোকোচ্ছ্বাস। দুটিরই বিষয় ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত বিষয়ে আরও দু-একটি লেখাও আছে; তবে তা অন্য ধরনের। 'নিষ্কৃতি-লাভপ্রয়াস' (১৮৮৮) বিদ্যাসাগর প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন; অন্যটি 'অপূর্ব ইতিহাস' নামে পুস্তিকা, নিষ্কৃতিলাভের আরেকটি প্রয়াস (১৮৮৫)—সেইরূপ কোনো অপবাদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য লিখিত। (পূর্বে এ লেখা প্রচারিত হয়নি; মনে হয়, কারও কারও মনোব্যথার কারণ হতে পারে বলে এখনো পুনঃপ্রকাশিত হয় না। পুস্তিকাটি অধ্যাপক বিজিত সেনের নিকট পাওয়া যায়।) অধ্যাপক সুকুমার সেন 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (৩।৪ সংখ্যা, ১৩৬৭ সাল) এ পুস্তিকার উপলক্ষ ও উদ্দেশ্য বিবৃত করেছেন। বিদ্যাসাগরজীবনীর পক্ষে লেখা দুটির গুরুত্বযথেষ্ট—বিশেষত 'নিষ্কৃতিলাভ-প্রয়াসে'র। বিদ্যাসাগরের প্রিয় বন্ধু মদনমোহন তর্কালংকারের জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ অন্যায়ভাবে বিদ্যাসাগরের উপর মদনমোহনের কোনো কোনো লেখা আত্মসাৎ করার অভিযোগ করেছিলেন। অভিযোগ অপ্রমাণিত হলেও ওরূপ কুৎসা যোগেন্দ্রনাথ চালিয়ে যান প্রায় পনেরো-যোলা বৎসর। শেষ অবধি, বিদ্যাসাগর আর সহ্য করলেন না। 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস' যোগেন্দ্রনাথের সেই কুৎসার উত্তর ('নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস'-এর 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য।) তথ্যগত যাথার্থ্যেই এ ধরনের রচনার আসল মূল্য, অন্যরূপ শিল্পকুশলতা বরং তাতে বর্জনীয়। তথ্যনিষ্ঠা বিদ্যাসাগরের স্বাভাবিক গুণ, এসব রচনাও তার প্রমাণ। তাতে রসসম্পদ মানায় না, সুপাঠ্য হলেই তা 'সরস'। ব্যক্তিগত বিষয়ের রচনার মধ্যে শিল্পগত মূল্য 'প্রভাবতীসম্ভাষণে'র এবং 'বিদ্যাসাগর চরিতে'র বেশি। দুইটিতে বিদ্যাসাগরের দুই শিল্পীরূপ দেখা যায়—একটি আবেগবাহী শিল্পের, অন্যটি তথ্যসম্পদপুষ্ট শিল্পের।

বিদ্যাসাগর অসংখ্য কাজে সদা ব্যস্ত ছিলেন; তার উপর শেষজীবনে ছিলেন পীড়াগ্রস্ত। তাই বহুলোকের আগ্রহ সত্ত্বেও নিজের কর্মবহুল জীবনের কথা লিখে যেতে পারেননি। মাত্র দুটি পরিচ্ছেদ তিনি লিখেছিলেন—পিতৃমাতৃকুলের কথা, ও পাঠ্যার্থে নিজের কলকাতায় আগমন পর্যন্ত বাল্যজীবনের কথা। ছাত্রজীবন, বিধবাবিবাহ আন্দোলন পর্যন্ত কর্মজীবনের প্রারম্ভও তাঁর আত্মচরিতে লাভ করা গেল না, এই খেদ রবীন্দ্রনাথের মতো সমস্ত বাঙালীরই থাকবে। তা আরও থাকে, যে দুই পরিচ্ছেদ বিদ্যাসাগর লিখে গিয়েছেন তা পাঠে। বিস্তারিত আলোচনা

নিষ্প্রয়োজন ; শুধু এই কয়টি কথা বলাই যথেষ্ট—আত্মচরিত রচনা অতি কঠিন কর্ম ; তা এক ধরনের নিরাসক্ত শিল্পসাধনা। অবশ্য, মধ্যযুগের বাঙালী কবিরা মোটের উপর সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়ে যেতেন; কারও কারও সেই বিবরণ মূল্যবান। যথার্থ আত্মজীবনী বাংলায় তথাপি বেশি নেই। একটা কারণ বাঙালী ভাবপ্রবণ, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে আপনার অভিজ্ঞতাকে বিচার করা ও বর্ণনা করা তার পক্ষে কঠিন কর্ম। বোধ হয় এ যুগে বিদ্যাসাগরই তার মধ্যে প্রথম ব্যতিক্রম—যদিও জীবনের অতি সামান্য অংশমাত্র তিনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। সেই সামান্যাংশ বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। তা আত্মচরিতকারদের আদর্শস্থানীয় এক রচনা বলতে আমরা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নই। একটা কালের চিত্র 'বিদ্যাসাগর চরিতে'র সংক্ষিপ্ত অবয়বের মধ্য দিয়েও ফুটে উঠেছে, আর পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে অসামান্য কয়েকটি পুরুষ ও নারী-চরিত্র—পিতামহ দুর্জয় পুরুষ রামজয়, পিতা পরিশ্রমী স্থিরবুদ্ধি ঠাকুরদাস, মাতামহ তর্কবাগীশ, স্নেহময়ী রাইমণি প্রভৃতি অবিস্মরণীয় ব্যক্তিচরিত্র। আর তার ফাঁকে ফাঁকে উদ্দেশ পাই তথ্যনিষ্ঠ কৌতুকবোধের সঙ্গে মানবীয় মমতায় ভরা বিদ্যাসাগর মানুষটির। মাত্র বিশ-পঁচিশ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র লেখার মধ্যে যে সম্ভাবনা পরিষ্কার দেখা যায়, তা নিয়ে আজ দুঃখ করা ছাড়া উপায় নেই। 'বিদ্যাসাগর চরিত' অসম্পূর্ণ—বাংলা সাহিত্য এক অপূর্ব আত্মজীবনী থেকে বঞ্চিত থেকে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র এক অপূর্ব আভাস আমরা এই দুই পরিচ্ছেদের লেখাটুকুর মধ্যে পাই—এই কথা বলা সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না। এবং উপহাস্যাস্পদ হতে হলেও দৃঢ়কণ্ঠেই বলব—গদ্যশিল্পী হিসাবে বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ রচনা এই 'বিদ্যাসাগর চরিত'—তা 'শকুন্তলা'দির মতো রসসম্পৃক্ত নয়, কিন্তু সরস ; স্বচ্ছন্দগতি প্রাঞ্জল ভাষা-রীতিতে, কৌতুকে, জীবনরসবোধে, আন্তরিকতায় শান্ত সমুজ্জ্বল।

'প্রভাবতীসম্ভাষণে' বিদ্যাসাগরের সেই আন্তরিক বেদনা ও আবেগ আরও একগ্রাম ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছে। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন বৎসরের মেয়েটির মৃত্যু বিদ্যসাগরের শোকের কারণ। বিদ্যাসাগরের বিশুদ্ধ সংস্কৃতাশ্রিত ভাষারীতিতে তা বিধৃত। সে ভাষা মুখের ভাষা নয়, কিন্তু মনের ভাষা—শোকাহত বিদ্যাসাগরের তা স্বভাষা। 'সম্ভাষণে'র প্রতি বাক্য গভীরশোকাভিভূত হৃদয়ের এক-একটি মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস—শোকোচ্ছ্বাস হলেও তাতে কৃত্রিমতার লেশও নেই। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় আরেকটি জিনিসও নেই—শিল্পীর ভাবসংযম। 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' এইজন্যই শ্রেষ্ঠশিল্পের মাত্রায় বাঁধা শিল্পরচনা নয়—স্বতঃস্ফূর্ত পবিত্র একটি মানসকুসুম। এত পবিত্র এই হৃদয়বেদনা যে শিল্পরূপে তার বিচারও অসমীচীন।

শিক্ষাপ্রয়াসে বিদ্যাসাগর সামান্যই সাফল্যলাভ করেছিলেন—অথচ এখনো তাঁর

শিক্ষানীতি অচল নয়। সমাজসংস্কারে বিদ্যাসাগরের সাফল্য আরও সামান্য—আর তাঁর প্রয়াসও আজ মনে হয় মূলত বড় কিছু ছিল না। কিন্তু যে সাহিত্যকর্মে বিদ্যাসাগর বিশেষ আত্মনিয়োগ করতে পারেননি, আজ আমরা দেখছি সেখানেই তাঁর সাফল্য অবিসংবাদিত এবং শাশ্বত। সাহিত্যস্রষ্টা বিদ্যাসাগর কালের উপর চিরজয়ী। সন্দেহমাত্র নেই, বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ—বাঙালী লেখকমাত্র সকলেই তাঁর অনুগামী। তাঁর সেই সাহিত্যকীর্তির যথার্থ স্বরূপ আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতে উল্লেখ করাই শ্রেয়ঃ মনে করি। ('বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' প্রকাশিত বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকাংশও সেই সঙ্গে স্মরণীয়)।

> তাঁহার [বিদ্যাসাগরের] প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনও সাহিত্যসম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননী-রূপে মানব সভ্যত্যর ধাতৃগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়…তবেই তাঁহার এই কীর্তি তাহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।….
>
> বিদ্যাসাগর বাঙ্গালাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাঙ্গলায় গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাঙ্গালা-গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যভাষার উচ্ছৃংখল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাব প্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।
>
> বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা লেখায় সর্বপ্রথমে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি ছেদচিহ্নগুলি প্রচলিত করেন। বাস্তবিক একাকার সমভূম বাঙ্গালা রচনার মধ্যে এই ছেদ আনয়ন একটা নবযুগের প্রবর্তন। এতদ্দ্বারা, যাহা জড় ছিল তাহা গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে।….
>
> বাঙ্গালা ভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাঙ্গালা-গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা-গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।

গ্রাম্য পান্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্বে বাঙ্গালা-গদ্যের সে অবস্থা ছিল তাই আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃজনক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।" "বিদ্যাসাগর-চরিত"—'সাধনা', ভাদ্র ১৩০২)।

৫ 'তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন'

"বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারম্বার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালী বড়লোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে—তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্যে তাঁহারই কৃত কীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে।"

বিদ্যাসাগর-চরিত—রবীন্দ্রনাথ,
১৩০২ ভাদ্র

বাংলা ভাষার প্রথম শিল্পী যে বিদ্যাসাগর, তা আমরা দেখেছি। সেই সঙ্গেই দেখছি—তাঁর চূড়ান্ত পরিচয় তাঁর অজেয় পৌরুষে, অখন্ড মানবতায়। সবার উপরে মানুষ বিদ্যাসাগর সত্য। সর্বব্যাপারেই তা দেখতে পেয়েছি—যথা, বাস্তব কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষায়, সমাজ সংস্কারে। পূর্বযুগের ও এযুগের স্মৃতিকথার সুবিজ্ঞ লেখকগণ ও সুযোগ্য জীবনীকাররাও সেদিকের সাক্ষ্য সঞ্চয় করেছেন। সেদিকে দ্বিতীয় সাক্ষ্য—বিদ্যাসাগরের রচনাবলী, এবং তাঁর কিছু পত্রাদি, দলিলপত্র। বঙ্গসাহিত্যেরও এসব স্থির সম্পদ, এবং বাঙালীর জাতীয় সম্পদ। এছাড়াও আরও সাক্ষ্য আছে—তা সঞ্চিত হয়ে উঠেছে বিদ্যাসাগরের জাতির মনে—লোকমানসে, কল্পনায়, ভাবনায়। তাতে বোঝা যায়, সব ছাড়িয়ে মানুষ বিদ্যাসাগরের 'ইমেজ'-ই তাঁর জাতির মনে জীবন্ত। শিক্ষাগুরু, সমাজগুরু, সাহিত্যগুরু অপেক্ষা—এমনকি 'বিদ্যার সাগর', 'দয়ার সাগর' অপেক্ষাও—মানবতার আদর্শরূপেই দেশবাসী তাঁকে তখনো অনুভব করেছিল। তাই তাঁর জীবনের তথ্যকেও তারা রূপ-রসে প্রাণবন্ত করে তুলেছে, বস্তুগত তথ্য (অ্যাকচুয়ালিটি) তাতেই হয়ে উঠেছে সজীব বাস্তব (রিয়ালিটি)—অর্থাৎ প্রকৃত সত্য (ট্রুথ)। বিদ্যাসাগরের নামে যত গল্প, যত কাহিনী চলিত, তেমন আর কারও নামে নেই। তার কারণ, লোকসমাজ এভাবেই লোকপুরুষকে (পীপল্‌স্ হিরোকে) আপনার মতো করে নির্মাণ করে। সেইসব লোকপ্রিয় গল্পকাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু কাল্পনিক, কিছু কিছু তথ্যাভিত্তিক কিন্তু অতিরঞ্জিত, কিছু কিছু আবার তথ্যগত সত্য, এবং

সেই সঙ্গে বাস্তবের অন্তর্নিহিত সত্য। এ কথা ঠিক, 'নীলদর্পণে'র অভিনয়ে বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু মঞ্চে নারীনিগ্রহের দৃশ্যে নিজ ক্রোধকে বাঙালীসাধারণ কি কল্পনার সাহায্যে প্রকাশ করেছে?—চিরদিনের নারীসুহৃদ, অখণ্ড পৌরুষের বিগ্রহ বিদ্যাসাগরকে কল্পনা করলে দর্শক—কল্পনা করলে সেই বিদ্যাসাগরী চটি তিনি ছুঁড়ে মারছেন মঞ্চস্থ পাশব অত্যাচারীর দিকে। বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কারও কথা তারা কল্পনা করতে পারে না, আর বিদ্যাসাগরকেও এই মানবিক মহৎ ক্রোধের অধিকারী ছাড়া অন্যরূপ দর্শকরূপে তারা ভাবতে পারে না। শুধু বিদ্যাসাগরের দানের নয়, তাঁর সুকোমল হৃদয়বত্তার, মহানুভবতার, স্বাভাবিক ঔদার্যে'র, এমনকি, হাস্যকৌতুকের কত রকমের গল্প তাই বাঙালী সমাজে গড়ে উঠেছে। সেসবের মধ্যে বস্তুগত সত্য সব সময়ে নেই, কিন্তু আছে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'আরও সত্য'। বিদ্যাসাগর বাঙালীসাধারণের প্রাণে এরূপ ছোটবড় মানবীয় গুণের প্রতীক। বাইরে যখন সমাজ তাঁকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত তখনো দেশের জনসমাজ অন্তরে অন্তরে তাঁর সেই মানবরূপকে স্বীকার করে নিচ্ছিল। সেই বোধই ক্রমে ক্রমে পীপল্স্ হিরো-রূপে বিদ্যাসাগরকে আক্ষুদ্র বাঙালীর মনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি কেবল রবীন্দ্রনাথের চোখে 'হিরো' নন, বাংলার জনমনেরও 'হিরো'।

শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ ও ইদানীং শ্রীযুক্ত ইন্দ্র মিত্র ('করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' গ্রন্থ) বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে প্রচলিত বহু তথ্য সংকলিত করেছেন, তার যাথার্থ্যও বিচার করেছেন। সরকারী দলিল-দস্তাবেজে ও বিদ্যাসাগরের রচনা ও চিঠিপত্রের থেকে লোকবাহিত এসব কাহিনীতে বিদ্যাসাগরের স্বরূপ—বিদ্যাসাগর-চরিত্র—কম প্রকটিত নয়। বরং একটু বিচারবুদ্ধি নিয়ে এসব পরীক্ষা করলে আমরা 'মানুষ বিদ্যাসাগরে'র আরও সহজ মানবিক রূপ এসবে প্রস্ফুটিত দেখতে পাই। সেই রূপই রবীন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখ পূর্বজ মনস্বীরা আমাদের সম্মুখে স্থাপিত করে গিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার ও স্মৃতিসংগ্রাহকরা তা লিপিবদ্ধ করেছেন। যেসব কাহিনী অবিসংবাদিত সত্য, এমনি কিছু কাহিনীর কথা উল্লেখ করে আমরা মানুষ বিদ্যাসাগরের মূল রূপটি এখানে নির্দেশ করতে চাই।

প্রারম্ভেই মনে রাখতে পারি—কেমন ছিলেন বিদ্যাসাগর দেখতে। কারণ মানুষের দৈহিক রূপ একটা বড় বাস্তব সত্য। এখনো রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির রূপ স্মরণ করলেই আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি। ঈশ্বরচন্দ্র কিন্তু একেবারেই রূপবান পুরুষ ছিলেন না। দীর্ঘকায় নয়, বরং তাঁকে কিছুটা খর্বকায়ও বলা চলত। রঙে শ্যামবর্ণ; নাক-মুখ-চোখেও বিধাতার সুনজর পড়েনি; মাথা একটু বড়, তাতে আবার সামনে কামানো উড়ে

খোঁপা বাঁধা—এই বিদ্যাসাগর কেমন দেখতে ছিলেন তা দু-একটি সামান্য সত্য গল্প থেকেও বোঝা যায় : বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কয়েকজন ভদ্রলোক—বিদ্যাসাগরকে তাঁরা আগে দেখেননি। বাইরের বাগানে যে লোকটি কাজ করছিল, তাঁরা বুঝলেন সে বাড়ির উড়ে মালী। তাকেই তাঁরা বললেন বিদ্যাসাগরকে খবর দিতে। সেও জানায়—'এখনি আসবেন, একটু অপেক্ষা করুন।' গল্পটি না বাড়িয়েও বলা যাক—আসতে দেরি হচ্ছিল ; ভদ্রলোকেরা লোকটিকে বললেন—একটু তামাক খাওয়াও। কিছুক্ষণ পরে তামাক নিয়ে হাজির হল লোকটি। আর একটু পরেই ভদ্রলোকরা বুঝলেন—সে লোকটিই বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর দেখতে কিরূপ ছিলেন—এই তার যথেষ্ট প্রমাণ—যাঁকে দেখে মালী বলে মনে হত, তামাক আনার হুকুম করতে দ্বিধা হত না। কৌতুক-প্রবণ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের একটি দিকও অবশ্য এ গল্পে সুস্পষ্ট—নিজেই তামাক সেজে এনে দেওয়া। বিদ্যাসাগর নিজেও তাঁর রূপ নিয়ে স্বচ্ছন্দে পরিহাস করতে পারতেন—কৈলাশচন্দ্র বসুর গৃহে তাঁর প্রতিকৃতির নিচে 'শ্রীমান্ ঈশ্বরচন্দ্রোহয়ং' লেখা দেখে তিনি বলেছিলেন—"শ্রীমান্ না হলে কি এমন উড়ে চেহারার রূপ হয় ?" এরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' দ্রষ্টব্য।)

রূপের পরেই—বেশভূষা। দেহকে বেশভূষায় কিছুটা শোভন করা মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা। এদিকে বিদ্যাসাগরের অভ্যাস সুবিদিত। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সেই ধুতি, মিরজাই, চাদর, চটিতে নিশ্চয়ই তাঁর দেহশ্রী বৃদ্ধি পেত না। সেরূপ বেশভূষায় সম্ভ্রম আকর্ষণেরও সম্ভাবনা ছিল না। অথচ আজীবন তিনি এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বেশই দূর্বার নিয়মে ধারণ করে গিয়েছেন। এ বিষয়ে গল্পগুলিও সুপরিচিত।—প্রধান গল্প অবশ্য ছোটলাট স্যর ফ্রেডারিক হ্যালিডের অনুরোধের সঙ্গে সম্পর্কিত। ছোটলাট হয়ে হ্যালিডে সাহেব সপ্তাহে একদিন তাঁর সুহৃদ্ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কামনা করেন, এবং সেরূপ ব্যবস্থাও করেন। বিদ্যাসাগরকে তিনি তখন অনুরোধ করেছিলেন, লাটবাড়িতে আসতে যেন সেরূপ পোশাকেই বিদ্যাসাগর আসেন—অর্থাৎ, ইজের, চোগা, চাপকান, শামলা ও ভারি জুতোসুদ্ধ দরবারী পোশাকে। বিদ্যাসাগর বন্ধুত্বের খাতিরে বার কয় অনুরোধ রক্ষা করে সেভাবে দেখা করতে গিয়েছিলেন। পরে একদিন বিদায়কালে হ্যালিডেকে জানালেন, "আপনার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হবে না।" ছোটলাট চমকিত হয়ে বললেন, "কেন ?" বিদ্যাসাগর জানালেন, "এসব পোশাক আমি পরতে চাই না, খারাপ লাগে।" হ্যালিডে অবশ্য তখনি বললেন, "তা হলে আপনার যেরূপ অভিপ্রেত সেরূপ পোশাকেই আসবেন।" বিদ্যাসাগরের সেই ধুতি-চটি-মিরজাই-চাদর লাটভবনে একক আভিজাত্যে আপন মর্যাদা পূর্বাপর অক্ষুন্ন রাখল।

দ্বিতীয় গল্পটিও প্রসিদ্ধ। পরিণত বয়সে হিন্দী সাহিত্যিক ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁকে এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহশালা দেখাতে যান। ঢুকতে গিয়ে তিনি বাধা পেলেন—চটি নিয়ে ঢোকা নিষেধ। হয় সাহেবী জুতো পরো, নয় খালি পায়ে ঢোকো। বিদ্যাসাগর বিনা বাক্যব্যয়ে ফিরে আসেন; হরিশ্চন্দ্রের দরবারী পোশাক ছিল, তিনি আগে-আগে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু বিনা দ্বিধায় তিনিও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ফিরে আসেন। এ ব্যাপারে ইংরেজচালিত সংবাদপত্রেও ('দি গ্রেট শু কোশ্চেন' নামে) যথেষ্ট লেখালেখি হয়। কিন্তু তখনকার সাহেব কর্তৃপক্ষরা তাতে ভ্রূক্ষেপ করেননি। শাসিত দেশের মানুষ আবার 'মানুষ' হবে কেন? শাসকের চাপ-রাশেই তো তাদের পরিচয়।

অবশ্য পোশাক-পরিচ্ছদ বাইরের আবরণ—তা দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বের কেন, সাধারণ শিষ্টাচারেরও মান স্থির হয় না। কিন্তু পরিচ্ছদ একেবারে তুচ্ছও নয়। আজকের দিনে আমরা জানি—প্রয়োজন বুঝে ধুতি পাঞ্জাবিও পরা চলে, কোট-পাতলুনও চলে। সত্য সত্যই, চটি-চাদরেও এমন কিছু মাহাত্ম্য নেই, ইজের-শেরওয়ানিতেও নেই। পরিচ্ছদটা মোটামুটি বিষদৃশ না হলেই হল। স্থান কাল অনুযায়ী ভব্য, পরিচ্ছন্ন (ডিসেণ্ট) হওয়াই প্রয়োজন। কিন্তু জাতীয় মর্যাদার প্রশ্নও তাতে জড়িত হতে পারে। দেশী ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদর বিজাতীয় ড্রেনপাইপ ও ছাপমারা হাওয়াই শার্টের থেকে নিশ্চয়ই কম ভদ্র বা ভব্য নয়। সহজ সাধারণ (সিম্পল) বেশভূষা চালিয়াতিও 'স্নবারি'র থেকে অধিক শোভন—অন্তত মানবিক মর্যাদাসূচক।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও শিক্ষাদীক্ষা যে পাশ্চাত্ত্য পোশাকের গুণ নয়, এমনকি, খ্রীষ্টধর্মেরও গুণ নয়, আধুনিকতাও নয়, (যেমন, মাইকেল প্রভৃতি সম্ভবত মনে করেছিলেন)—এ কথা চটি-চাদর-পরা বিদ্যাসাগর যতটা বুঝেছিলেন সেদিনের হিন্দু কলেজের ইংরেজি-পাগল কৃতী ছাত্ররাও তা বোঝেননি। চটি-চাদর ছিল একই কালে নবজাগরণের পুরুষ বিদ্যাসাগরের আত্মমর্যাদা ও জাতীয় মর্যাদাবোধের সুস্থির আত্মঘোষণা।

এই প্রসঙ্গেই তাই বিদ্যাসাগরের আত্মমর্যাদা ও জাতীয় মর্যাদাবোধের কথা ওঠে। একটা কথা আছে—বিদ্যাসাগর ইংরেজের গুণগ্রাহী শুধু নন, সাহেবদের নিকট নিজের ছাড়া দেশীয় অন্য কারও আনাগোনায় অসন্তুষ্ট হতেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মতো তাঁর অনুগামী শিষ্যও এরূপ আভাস দিয়েছেন ('পুরাতন প্রসঙ্গ' দ্বিতীয় খণ্ডে)। ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। তবে সে সম্পর্কে দু-একটি কথা স্মরণীয়। সেদিনে সাহেবদের নিকট দেশীয় লোকরা উপযাচকরূপেই বেশি যেতেন; আত্মমর্যাদা ও জাতীয় মর্যাদার কথা তাঁদের স্মরণেও থাকত না, তা রক্ষা করা তাঁদের সাহসেও কুলোত না। এসব

লোকের সংস্পর্শে এসেই সাহেবরা (যেমন, সম্ভবত মেকলে) বাঙালী-চরিত্র সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব পোষণ করতে অভ্যস্ত হত। শোনা যায়, ছোটলাট হ্যালিডের নিকট দেশী হোমরাচোমরারা অনুযোগ করেছিলেন—আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসে কতক্ষণ অপেক্ষা করি ; অথচ বিদ্যাসাগর এলেই আপনি তাঁকে ডেকে পাঠান। হ্যালিডে উত্তরে বলেছিলেন, "আপনারা আসেন আপনাদের গরজে, বিদ্যাসাগরকে আমি চাই আমার গরজে।"

বোধহয়, এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মনোভাব ও কৌশলগত নীতি রাজনারায়ণ বসুকে লেখা তাঁর পত্রেই প্রকাশিত হয়েছে : "লোকেল কমিটীর মধ্যে যে সাহেবকে ভদ্র দেখিবেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট গেলেও ক্ষতি নাই।" (বিনয় ঘোষ কর্তৃক উদ্ধৃত 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ', ১ম খণ্ড)। 'ভদ্র-সাহেব', 'মধ্যে মধ্যে' ও 'ক্ষতি নাই'—এই কয়টি শব্দেই তাঁর নীতি স্পষ্ট।

আরেকটি দৃষ্টান্ত আছে, তাতে নীতিটা আরও সুস্পষ্ট হয়।—সেই প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল কার সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সংঘর্ষ। বিদ্যাসাগরকে একবার কার সাহেবের সঙ্গে তাঁর কক্ষে দেখা করতে যেতে হয়। সাহেব তাঁকে বসতেও বলেন না, টেবিলের উপর জুতাসুদ্ধ পা তুলে রেখেই কথা চালান। বিদ্যাসাগর স্থির মর্যাদায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজের কথা বলে চলে আসেন। পরে একদিন সাহেবকে আসতে হল বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে বিদ্যাসাগরের কক্ষে। বিদ্যাসাগরও তাঁকে বসতে বললেন না, তালতলার চটি-পরা পা টেবিলের উপর তুলে দিয়েই কথা চালালেন। সাহেব অপমানিত হন ; চটে গিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট নালিশ করেন। বিদ্যাসাগর জবাব দেন—সাহেবের আচরণ থেকেই তিনি বুঝেছিলেন—ওরূপই সভ্য আচরণ ; আর সাহেবের সঙ্গে তাই সেরূপ আচরণই তিনি করেছেন। বিদ্যাসাগর মাথা নোয়াবেন না ; কর্তৃপক্ষ জানতেন।—না, সাহেব দেখলে মেরুদণ্ড বেঁকে যাবার মতো মানুষ বিদ্যাসাগর নন।

সাহেব কেন, ধনী বা ক্ষমতাবানদের নিকট আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে দিতেও তিনি ছিলেন সর্বদা অস্বীকৃত। শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রসিদ্ধ বক্তব্য স্মরণ করি (প্রবন্ধাবলি, ১ম খণ্ড, ১৯০৪) : "তিনি [বিদ্যাসাগর মহাশয়] এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন, 'ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতাসুদ্ধ পায়ে টক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি।' আমি তখন অনুভব করিয়াছিলাম, এবং এখনও অনুভব করিতেছি যে, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য। তাঁহার চরিত্রের তেজ এমনই ছিল যে, তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরাও নগণ্য ব্যক্তির মতো।" এ বড়াই নয়, এ বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক উগ্রতাও নয়। কারণ, তিনি সাহেবদের অনেকের

সদ্‌গুণের জন্য তাঁদের গুণগ্রাহী ছিলেন ; রাণী স্বর্ণময়ী প্রভৃতির মতো কোনো কোনো বঙ্গীয় জমিদারেরও গুণের জন্য বিদ্যাসাগর বিশেষ সুহৃদ্‌ ছিলেন। মনুষ্যত্বের মর্যাদাবোধেই তিনি মানুষকেও দিতেন মর্যাদা—ক্ষমতার ভয়ে নয়, পদগরিমায়ও নয়। বড়লোক, ধনী-লোকের থেকেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে দোকানে বসে তামাক খেতে গল্প করতে ছিল তাঁর সহজ আনন্দ। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তা দেখে কি লজ্জা পান? তা হলে বিদ্যাসাগরকেই রাজার ত্যাগ করতে হবে। বিদ্যাসাগর জানিয়ে দেন, ওসব সাধারণ মানুষই তাঁর আপনার জন। যতীন্দ্রমোহন অবশ্য তখন নিজেই লজ্জিত হন।

দয়াদাক্ষিণ্যের অজস্র কাহিনী আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই না। তবে মাইকেলের প্রতি তাঁর দাক্ষিণ্যের কথাটা একেবারে স্মরণ না করাও অনুচিত, আর তাঁর উইলের নানা সাহায্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাও সমুচিত। দানবীর বিদ্যাসাগর স্বোপার্জিত অর্থেই অকাতরে দান করেছেন—পিতৃপুরুষের সঞ্চিত বিত্তে তিনি সে ব্রত উদ্‌যাপন করেননি—নিজের অর্জনে ও সঞ্চয়েই তিনি এ ব্রত পালন করেছেন। তাঁর কর্মক্ষমতায় ও ব্যবসায়িক যোগ্যতায় তাঁর বই ও ব্যবসায়ের আয় মাসে ক্রমে তিন-চার হাজার দাঁড়িয়েছিল—সেদিনে তা প্রচুর আয়। তথাপি মনে রাখা প্রয়োজন—ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে তিনি তখনো পরম মিতব্যয়ী। শুধু মিতব্যয়ী নয়, আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে বুঝি ব্যয়কুণ্ঠ। ও বিষয়েও সত্যকাহিনী অনেক প্রচলিত আছে—দৌহিত্র সুরেশ সমাজপতির স্মৃতিকথায় ও আচার্য ক্ষুদিরাম বসুর 'পঞ্চপুষ্পে' প্রকাশিত পরম উপাদেয় 'বিদ্যাসাগরস্মৃতি'তে (বিনয় ঘোষ দ্বারা উদ্‌ধৃত—দ্রষ্টব্য 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ', ১ম খণ্ড) তার কয়েকটি উপভোগ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। বাজারের কেনা জিনিসের পুঁটলি-বাঁধা সামান্য দড়িটুকুও বিদ্যাসাগর ফেলতেন না, কাজে লাগবে। বালক সুরেশ সমাজপতি তা দেখে বলতেন —'কৃপণ'। একদিন সুরেশ নিজের প্রয়োজনে সে দড়ি চুরি করতে গেলেন। বিদ্যাসাগর ধরে ফেললেন—হাঁ, আমি সঞ্চয় করি বলে কৃপণ, আর তুমি তা চুরি করে খুব সদাশয়! মফঃস্বলে স্টেশন থেকে গ্রামে যেতে বেয়ারারা পাল্‌কিভাড়া অতিরিক্ত চাইছে। বিদ্যাসাগর দরাদরি করতে থাকেন—না হয়, হেঁটেই যাবেন। হাওড়া থেকে বাদুড়বাগানে আসতে ঠিকে গাড়ি ভাড়া বেশি চায়, তিনি হেঁটে গঙ্গার এপারে এসে সস্তায় গাড়িভাড়া করে বাড়ি ফেরেন। শিয়লদ বাজার থেকে কোঁচড় ভরে ফুলকপি কিনে নিয়েছেন, ক্ষুদিরাম বসুকে দেখিয়ে বলেন—আমাদের পাড়ার দর খুব বেশি, এখানে খুব সস্তা। এসব কৌতুকাবহ তুচ্ছ মিতব্যয়িতার উদ্দেশ্য হল, তাঁর অর্জিত অর্থ সম্পূর্ণ সার্থকভাবে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তের কষ্টমোচনে বা যোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অকাতরে উৎসর্গ করবেন। মিতব্যয়ী হলেই তো তা সম্ভব।

তবে এই ব্যয়কুণ্ঠ মানুষেরও বিলাসিতা ছিল—বই। আর বইগুলি ভালোভাবে রাখার জন্য বহু খরচে বাঁধাই করে রাখা। সেইদিকে ব্যয়ে তিনি অকুণ্ঠিত। সাহিত্যপরিষদ গ্রন্থাগারে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাগারের যে অংশ রক্ষিত আছে, এত বৎসর পরেও তার দিকে তাকালে বোঝা যায় কী সুবিস্তৃত ছিল তাঁর মনের জিজ্ঞাসা, আর কী সযত্ন প্রয়াস ছিল তাঁর গ্রন্থ-সংগ্রহ ও সংরক্ষণে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সেই বিদ্যাসাগর গ্রন্থসংগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের মন বিস্ময়ে পূর্ণ হয়ে যেত, চক্ষু সেই উজ্জ্বল শোভন বাঁধাই দেখে আনন্দে বিস্ফারিত হয়ে উঠত। এখনো সেই সংগ্রহ দেখে বোঝা যায়—কী ছিল বিদ্যাসাগরের গ্রন্থপরিচর্যা।

এ সম্বন্ধেও কাহিনী সুবিদিত।—বিদ্যাসাগরের অত্যধিক খরচ করে বই বাঁধানোর কথা শুনে এক ভদ্রলোক তাঁকে বললেন, দু-চার আনায় যা বাঁধাই হয়, তার জন্য দু-চার টাকা ব্যয়! লোকে যে বলে আপনার মাথা খারাপ, তা একেবারে মিথ্যা নয়। বিদ্যাসাগর তখনকার মতো হাসেন। খানিক পরে আলাপে আলাপে ভদ্রলোকের ঘড়ির সোনার চেনের দিকে তাকিয়ে জানতে চান, সে সোনার চেনের দাম কত। ভদ্রলোক সগর্বে দাম বললেন—শতখানেক টাকা। বিদ্যাসাগর তখন তাঁকে বললেন, সামান্য দু-চার আনার সুতোর দড়ি দিয়েও তো ঘড়ির চেন করা চলে; তার জন্যে এত দামের সোনার চেন কেন? ভদ্রলোক হাসলেন—সোনার চেন ও সুতো নিশ্চয়ই একসমান নয়। ভালো বাঁধাই ও মন্দ বাঁধাই কি এক কথা? বরং সোনার চেন না হলেও ঘড়ি চলে, মন্দ বাঁধাইতে বই টেঁকে না।

বই ব্যতীত আরেকটি মাত্র বিষয়ে তিনি কিছু অর্থব্যয় করেছিলেন—বাদুড়-বাগানের বাড়ি নির্মাণে। (সে বাড়ি এখন বাঙালীর হস্তচ্যুত ও মালিকের দ্বারা নতুন-ভাবে নির্মিত।) পরিবার ও আত্মীয়দের আচরণে নানা কারণে মর্মাহত হয়ে তিনি জন্মের মতো বীরসিংহ পরিত্যাগ করেন—শিক্ষাদীক্ষায় সে গ্রামের উন্নতি ও গ্রাম্য দরিদ্রদের সাহায্য তারপরেও আজীবন করেন—উইলেও সে ব্যবস্থা রাখেন; কিন্তু বীরসিংহতে আর তিনি পদার্পণ করেননি। কলকাতায় তখন নির্মাণ করেন এ বাড়ি—মোটামুটি তা বাসের পক্ষে প্রশান্ত, তার বাগানে কাজ করতে তিনি ভালোবাসতেন। তখন তাঁর বই ও ব্যবসায়ের আয়ও যথেষ্ট হয়েছিল।

কিন্তু বিদ্যাসাগর কেন বীরসিংহ ত্যাগ করেন? চিঠিপত্রে ও তৎকালীন নানা ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়, এত দীর্ঘকাল পরে সে তথ্য উদঘাটনে বাধাও নেই, কিন্তু তা নিষ্প্রয়োজন। বরং, তার ভিতরে যে সত্য নিহিত আছে তাই অনুধাবন-যোগ্য, আর তা অনুধাবন না করা অন্যায়। যে অখণ্ড মানবতা ও অজেয় পৌরুষ

বিদ্যাসাগরের স্বভাবধর্ম, সেই অখন্ড মানবতা ও অজেয় পৌরুষই তাঁর ললাটে লিখে দেয় এই বিধিলিপি—সংসারে তিনি একক, তিনি নিঃসঙ্গ।

নবজাগরণের ভদ্রসমাজে তিনি খাপছাড়া—উগ্রপ্রকৃতির না হয়েও আত্মস্বাতন্ত্র্যে একক, আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আত্মমর্যাদায় অনমনীয়। দশ টাকার কেরানী ঠাকুরদাসের পুত্র অর্থের সহায়তায় বা আভিজাত্যের টীকা ললাটে নিয়ে এসে রামমোহনের মতো কলকাতার সমাজে উদিত হননি। তিনি সে সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন বিদ্যায়, পাণ্ডিত্যে, চরিত্রবলে—এক কথায়, আপন দুর্জয় ব্যক্তিত্বের বলে, আপন পৌরুষে, আর শেষে মানবতায়। আভিজাত্যের যুগকে শেষ করে বাংলায় তিনি এসেছেন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের যুগের পুরোধারূপে—অথচ সেই মধ্যবিত্ত সমাজ থেকেই তিনি বিচ্ছিন্ন। তার কারণ কি?

আমাদের পরাধীনতার আওতায় নবজাগরণের দায়িত্ব তো বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরই নেবার কথা। কিন্তু ঝুঁকি নেবার সাহস কোথায়? উদ্যোগ কোথায়? চাকরিই তাদের প্রাণ। দু'মুঠো মুণ্টিভিক্ষাতেই খুশি, আপনার ও আপনার পরিবারের বৈষয়িক উন্নতিই তার আকাঙ্ক্ষা—সমাজের, রাষ্ট্রের বৃহত্তর দাবির কথা মনে বুঝলেও কার্যত সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে সে অনিচ্ছুক; বুদ্ধি আছে উদ্যোগ নেই, বোধ আছে সাধনা নেই, আকাঙ্ক্ষা আছে সংগ্রামের সংকল্প নেই—এই দ্বিধাগ্রস্ত, চির-চালাক ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত ইতিহাসকে ফাঁকি দিতে গিয়ে নিজেই শেষ পর্যন্ত ইতিহাসে ফাঁকি পড়ে যেতে বাধ্য। মধ্যবিত্তের প্রথম পথিকৃৎ মাইকেলের ভাষায়, 'দি ফার্স্ট ম্যান্ অ্যামাঙ্ আস্'—নবজাগরণের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আপনার শ্রেণীতেই তাই একক ও অগ্রাহ্য। ইতিহাসের দাবিকে মেনে নিয়েছেন বলেই নিজের শ্রেণীতে তিনি অপাংক্তেয়, আপন সংসারে-পরিবারেও নিঃসঙ্গ। পৃথিবীর অখ্যাত হতভাগ্যদের যে 'অবিবেচক' মানুষ ধন, মমতা উজার করে দেয়, আত্মীয়রা কি করে মনে করতে পারে সে তাদের আপন জন? সংসারে পরকে আপন যে করতে চায়, সংসারের নিয়মেই আপন তার পর হয়ে যায়। তাই দেখি—আবাল্য সুহৃদ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে বিদ্যাসাগর সম্পর্কচ্ছেদ করেন, মহেন্দ্রলাল সরকারের মতো কৃতী পুরুষের সঙ্গেও তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র তাঁর বিরুদ্ধে মামলায় প্রবৃত্ত হন; আস্থাভাজন ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রও তাঁর কম মনোব্যথার কারণ হননি। একমাত্র পুত্রকেও তিনি বর্জন করতে বাধ্য হন। বেশ বোঝা যায়—পরের অপরাধ যদি বা তিনি অবজ্ঞা করতে পারেন, যে যত নিকট তার অপরাধ ততই তাঁর মর্মদাহের কারণ, ক্ষমার অযোগ্য—মায়ামমতায় সেখানে তিনি নিজের ন্যায়বুদ্ধিকে খর্ব করেন না। এ কেমন তবে দয়ার সাগর? আত্মীয়রা কী করে তাঁকে বুঝবে? পত্নী দিনময়ীও তাঁকে বুঝতে পারতেন না। এমন-

কি, যে জনক-জননী ছিলেন তাঁর জীবন্ত দেবতা, ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁরাও বুঝেছিলেন মনে হয় না।

আপন পরিবারে বিদ্যাসাগর সুখী হতে পারেননি, বিদ্যাসাগরই কি কাউকে সুখী করতে পেরেছিলেন? মহৎ মানুষের জীবন এমনি ট্রাজিক হয়—প্রায়ই মহত্ত্বের এমনি নিয়তি, মর্মজ্বালায় জীবন তার দুঃসহ :

The Time is out of joint ;
O cursed spite
That ever I was born to set it right.

ক্লান্ত, পীড়িত, মানুষের প্রতারণায় প্রবঞ্চনায় দগ্ধবিদগ্ধ, বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত শান্তি পেতেন একমাত্র কর্মাটাড়ে সাঁওতালদের সাহচর্যে।—তারা কাপট্যহীন নর-নারী, সভ্য সমাজ ও তার সভ্যতার বাইরে সহজাত মনুষ্যত্বে তারা মানুষ—অকৃত্রিম, স্বচ্ছন্দ—'মানুষ' এই তাদের একমাত্র পরিচয়। তাই, তাদের কাছে বিদ্যাসাগর আপনার জন, আর বিদ্যাসাগরের কাছেও আপনার জন সেই সাঁওতাল নর-নারী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্মাটাড়ের সে জীবনের যে চিত্র রক্ষা করে গিয়েছেন, (দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ) তাতে কি মনে হয় বিদ্যাসাগর মানুষে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন, তিনি 'সিনিক'?—তাঁর বিশ্বাস বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল দেশের ধনী ও বড়লোকদের উপর, তাঁর স্বশ্রেণীর ভদ্রলোকদের উপর, এমনকি তাঁর আপন আত্মীয়-সুহৃদ্‌দের উপর। কিন্তু যেখানে মানুষ নিছক মনুষ্যত্বের অকৃত্রিম উত্তরাধিকারেই মানুষ—যেমন কর্মাটাড়ের সাঁওতালগণ—সেখানে উপস্থিত হলেই তিনি আপনার সুস্থ হৃদয়মন ফিরে পেতেন। বুঝতে পারতেন—মানুষে বিশ্বাস হারানোর কারণ নেই, মানুষ আসলে অমানুষ নয়। বিদ্যাসাগরের অখণ্ড মানবতা সেখানেই স্বচ্ছন্দ, মানবতায় স্বস্থ ও সানন্দ। কোথায় সেখানে তাঁর মানুষে অবিশ্বাস?

যদি বিদ্যাসাগর সেই দুমুখো শিক্ষিত-ভদ্রশ্রেণীর উপর সুস্থ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য নির্ভর না করে সমাজের এই সাধারণ মানুষের উপর আস্থা নিয়ে অগ্রসর হতে পারতেন, বঞ্চিত মানুষের দুঃখকে একা দূর করবার স্বপ্ন না দেখে সেই বঞ্চিত সাধারণের উদ্যোগে তাদের বঞ্চনা অবসানের ব্রত গ্রহণ করতেন, তা হলে—একমাত্র তা হলেই তিনি তাঁর সমাজ সুনিশ্চিত আধুনিক যুগের দিকে এগিয়ে দিতে পারতেন; আপন সাধনার সাফল্য লাভ করতে পারতেন। সমাজে সংসারে খণ্ডিত হবার বিরুদ্ধে তাঁর অখণ্ড মানবতা ও অজেয় পৌরুষ পেত প্রতিষ্ঠার সুনির্ভর অবলম্বন; তাঁর মহৎ জীবন ও মহৎ প্রত্যাশা পেত মহৎ শান্তি, মহৎ তৃপ্তি, মহৎ সার্থকতা।

কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। স্বীকার করতেই হয়—এজন্য অংশত দায়ী বিদ্যাসাগরের

ব্যক্তিত্ব—তাঁর 'এঁড়ে' স্বভাব, তাঁর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, একান্ত উদ্যোগ, কর্মাসক্তি—দশজনের সঙ্গে একত্র কাজ করবার অক্ষমতা ;—এসব ব্যর্থতার জন্য কম দায়ী নয়। কিন্তু স্থিরতর ও তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে আমরা বুঝতে পারি—আসলে তা বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের ত্রুটি নয় ; বাঙালী ভদ্রলোকের কর্মকুণ্ঠতা, ফাঁকিবাজি, আত্মবঞ্চনার বিরুদ্ধে সেই উদ্যোগী পুরুষকারের বিদ্রোহ অনিবার্য ছিল। ইতিহাসের প্রতি বিদ্যাসাগরের আনুগত্যই ভদ্রশ্রেণীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ। ত্রুটি বরং এই—বিদ্যাসাগর তথাপি বঞ্চিত জনসমাজকে আশ্রয় করে ভারতীয় সমাজের ঐতিহাসিক নিয়তিকে সংগ্রামী রূপ দান করতে উদ্যোগী হতে পারেননি। অতিসরলীকৃত কথায়, বিদ্যাসাগরের এই ত্রুটিকে কলোনিয়াল ভদ্রশ্রেণীর শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা বলা চলে। তা মিথ্যা নয়, কিন্তু এই নির্দেশ যথেষ্টও নয়। বোঝা উচিত—বাঙালী সমাজ ও ভারতীয় সমাজ যুগ-যুগের শাসনে ও বিধিবিধানে সমাজের বঞ্চিতসাধারণকে—নারী, শূদ্র, আদিবাসী প্রভৃতি অজস্র মানুষকে—কর্মফলে এমন বিশ্বাসী, নিষ্প্রাণ, নিরুদ্যম জীবে পরিণত করেছে, এতটাই তাদের জাতিগত ('কাস্ট'গত) ও সামাজিক ধারণায় উচ্চবর্ণের ও উচ্চ ও ভদ্র শ্রেণীর মুখাপেক্ষী করে রেখেছে যে, বিদ্যাসাগরের পক্ষে না ভেবে উপায় ছিল না, এই মূঢ়-ম্লান মানুষদের সামান্যভাবে সচেতন করতে হলেও আগে প্রয়োজন—যাঁদের নেতৃত্বে ও নির্দেশে এরা অভ্যস্ত, যাঁদের প্রয়াসে তাই এরা জীইয়ে উঠতে পারে, সমাজের সেই শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীকে আধুনিক শিক্ষায় এই সামাজিক দায়িত্ববোধে সচেতন করে প্রকৃত প্রগতিকামী এক উদ্যোগী কর্মী-গোষ্ঠী সৃষ্টি করা। কলোনিয়াল শিক্ষিত শ্রেণীরই যে ঐতিহাসিকভাবে নবজাগরণের ফলে বুর্জোয়া চেতনা ও সাধনার প্রধান মুখপাত্র হবার কথা, বাঙালী মধ্যবিত্ত সে সাধনা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করল না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের এ আশা তো অন্যায় ছিল না। অথচ এই আশাই বিদ্যাসাগরের সীমাবদ্ধতার কারণ। বিদ্যাসাগরের কেন, তাঁর পরবর্তী সমস্ত প্রগতিকামী ও বিপ্লবকামী বাঙালী মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর দৃষ্টির সীমাবদ্ধতার ও সাধনার ব্যর্থতার কারণ এইখানে—আমাদের খণ্ডিত রিনাইসেন্স ও স্ববিরোধী স্বভাবের মধ্যে। রিনাইসেন্স হয় তো জনসমাজ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয় না ; কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ তার বাহন হয়ে জনসমাজকে আপনাদের অগ্রগতির আয়োজনে সহগামী করে নেয়। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জনশিক্ষায় বাধা দেয়, বাঙালী ভদ্রলোকও জনশিক্ষায় উৎসাহবোধ করেননি, তা আমরা দেখেছি। এমনকি, বাঙালী ভদ্রলোক তার নিজ গণ্ডী ভেঙে জনসমাজকে স্বাধীনতার সংগ্রামেও আকর্ষণ করতে চায়নি ;—মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীকে সচেতন ও সক্রিয় করে তোলাতেই তাদের দৃষ্টি ও শক্তি আবর্তিত

হয়েছে। বিদ্যাসাগরের ট্রাজিডি এ হিসাবে পরবর্তী শ্রেষ্ঠ বাঙালী শিক্ষিত চিত্তেরও ট্রাজেডি : তবে ১৮৫০-৭৫এ বিদ্যাসাগরের কালে তা বোঝা যায়নি, ১৯০০-১৯৪০-এ তা না বোঝার কারণ ছিল না—অন্তত ১৯০৫এর পরে তা না-বোঝা শিক্ষিত ভদ্রলোক বাঙালীর আত্মপ্রতারণা।

ইচ্ছা করেই আমরা এ পর্যন্ত একটি প্রশ্ন তুলিনি—বিদ্যাসাগরের ধর্মবিশ্বাস। যে প্রশ্ন তুলতে বিদ্যাসাগর নিজে উৎসাহ বোধ করতেন না, সে প্রশ্ন বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে তুলতে আমরাও উৎসাহ বোধ করি না। কিন্তু তাই বলে প্রশ্ন উঠত না, তা নয়। মানুষে বিশ্বাস হারানো এ দেশ সহ্য করতে পারে—বিশেষ করে ঈশ্বরে প্রথাগত বিশ্বাসটা যদি না হারায়। যাঁর সেরূপ প্রথাগত বিশ্বাস নেই, তাঁর মানুষে বিশ্বাস থাকলেই বা কী, না থাকলেই বা কী? কোন একজন স্বামী বিবেকানন্দ হয়তো তা মানতেন না। ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে বিবেকানন্দের ধারণা—মানুষের উপর যাঁর এমন মমতা, তিনি যথার্থ ধার্মিক। ভগিনী নিবেদিতার নিকট বিবেকানন্দ বলেছিলেন, রামকৃষ্ণের পরেই তাঁর গুরু বিদ্যাসাগর। আধুনিক যুগের যথার্থ ধর্মপরায়ণ মানুষের পক্ষে এরূপ বিশ্বাসই স্বাভাবিক—মানবতার মধ্যেই তাঁরা অধ্যাত্মচেতনার বিকাশ দেখেন। তথাপি ঐশী শক্তির সম্বন্ধে নীরব বা উদাসীন যে মানুষ, 'অখণ্ড মানবতা' ও 'অক্ষয় পৌরুষে'র অধিকারী হলেও তাঁকে নিয়ে তাঁরাও অস্বচ্ছন্দ বোধ করেন। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে তাঁর কালে কী ঘটত জানি না—তিনি তো ওসব ঐশী শক্তি ও পারত্রিক জীবনের কথা রঙ্গতামাসায় উড়িয়েই দিতেন। অবশ্য দুএক সময়ে পৃথিবীর দুঃখ-দৈন্য-নৃশংসতায় বেদনার্ত হৃদয়ে বলে ফেলতেন—সাগরতলে যাত্রীসহ (সেণ্ট লরেন্স) জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের কী করুণা প্রকাশিত হল, তা তিনিই জানেন। কিন্তু এ হল অনুভূতিপ্রবণ মানবাত্মার সাধারণ খেদোক্তি, অন্তর-আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ—বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরবিষয়ক মতামতের সূত্র বলে এসব উক্তিকে গণ্য করা উচিত নয়। আসলে, অনেক সময়েই ঈশ্বরের প্রশ্ন বিদ্যাসাগর পাশ কাটিয়ে যেতেন—বলতেন, 'মরে পরের জন্য বেত খেতে পারব না।' কারণ, তাঁর কথায় কে কী বিশ্বাস করে বসছে, আর যদি পরকাল থাকে, যমদূত এসে বলবে, 'দোষ ওর নয়, দোষ বিদ্যাসাগরটার—তাকেই শাস্তি পেতে হবে।' অথবা, কাশীর পাণ্ডাদের প্রতি তাঁর উত্তর—"সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা আমার জনক-জননী, তাঁদের প্রসাদ পাই; আমার বিশ্বনাথদর্শনে বা গঙ্গাস্নানে কী প্রয়োজন?" ধর্মবিষয়ক স্বচ্ছ পরিহাস থাকত বন্ধুমহলেই সীমাবদ্ধ। যেমন শিবনাথ ব্রাহ্ম হয়ে যাওয়াতে মনের দুঃখে তাঁর পিতা কাশীবাসী হবেন। বিদ্যাসাগর তাকে বলেন, "হারান [শিবনাথের পিতা]

গাঁজাটাঁজা অভ্যেস করেছ?" হারান অবাক হলেন; "কেন?" "কাশী তো শিবঠাকুরের শহর, আর তিনি তো গাঁজায় বুঁদ হয়েই থাকেন। গাঁজা না খেলে সেখানে চলবে কী করে?" সাধারণত ব্রাহ্মদের সঙ্গে ছিল বিদ্যাসাগরের বেশি সদ্ভাব। কিন্তু এক যুবক ব্রাহ্ম প্রচারক এক বন্ধুকে নিয়ে একবার বিডন স্ট্রীট থেকে বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের নিকট আসতে গিয়ে পথ ভুল করে বন্ধুকে হয়রান করলেন। দেখা হলে তা শুনে বিদ্যাসাগর বললেন, "তাই তো, বিডন স্ট্রীট থেকে বাদুড়বাগানে আসতে এত পথ ভুল হয়, আর অন্য মানুষকে পৃথিবী ছেড়ে একেবারে পরলোকের পথ পর্যন্ত চিনিয়ে দিচ্ছেন?" সহজ কৌতুকবোধে কিন্তু এসব কথা শেষ হত না—যেখানে ধর্মের নামে তিনি উৎপাত দেখতেন। গায়ে পড়ে যে খ্রীস্টান পাদরি শিবনাথদের আক্রমণ করতে যান, 'খুব হাসছ, কিন্তু পরকালের জন্য কী করছ?' বিদ্যাসাগর সেই গোঁড়া ধর্মধ্বজীকে সহজে নিস্তার দেননি—ব্যঙ্গবিদ্রূপে তাঁকে নাস্তানাবুদ করে পালাতে বাধ্য করেন। অথচ তাঁর পরম স্নেহভাজন শিবনাথ ছিলেন জ্বলন্ত ব্রহ্মবিশ্বাসী। অপরদিকে রামতনু লাহিড়ীর মতো ভক্ত মানুষও যখন একবার ব্যস্ত হয়ে ব্রাহ্মণ পাচক খুঁজছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর পরিহাস না করে পারেননি—'তুমি তো জাত মান না, তবে ব্রাহ্মণ পাচকের কী দরকার?' রামতনু জানালেন, 'না হলে গৃহিণীর চলবে না।' শুনে বিদ্যাসাগর বলতে ছাড়লেন না: 'বাপের কথায় পৈতেগাছটা রাখতে পারলে না; এখন পরিবারের কথায় বামুন খুঁজতে বেরিয়েছ?'

শুধু কৌতুক নয়, এখানে পরোক্ষে বিদ্যাসাগরের জীবনযাত্রারও একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আহারে-বিহারে আচারে-নিয়মে তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মতোই চলতেন। বিবাহ, শ্রাদ্ধশান্তি প্রভৃতি ক্রিয়া যথানিয়মে পালন করতে আপত্তি করেননি। কারণ, ওসব নীতি-নিয়মে তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন না; কিন্তু তা মানা না-মানা নিয়ে ব্রাহ্মদের মতো বাড়াবাড়ি করাকে তিনি মনে করতেন অনর্থক। প্রত্যেক সমাজেরই ওরকম কতকগুলি প্রথা-নিয়ম থাকে—তা নিতান্তই 'বাহ্য', মূলকথা নয়। কেউ তা না মানলে তিনি আপত্তি করতেন না—শিবনাথকে কোনো দিনই তাঁর ব্রাহ্মমত বা আচরণ থেকে নিরস্ত করার কথা তিনি ভাবেননি। বিনা কারণে এসব প্রথানিয়ম ভাঙার জন্য মেতে উঠে সমাজসংস্কারের আসল কাজ পণ্ড করতে তাঁর উৎসাহ ছিল না। বাইরে বিদ্যাসাগর ছিলেন—সাধারণভাবে যাকে বলে কন্‌ফরমিস্ট্। কিন্তু পুজা-আর্চা যপ-তপ করতেও কেউ তাঁকে দেখেনি—মন্দির, মসজিদ, ব্রাহ্ম-উপাসনা—সকল জিনিসেই তাঁর সমান নিরপেক্ষতা ও নিস্পৃহতা। কেবল একটি কথায় মনে হয় তিনি আপনার চিন্তা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি একবার বলেছিলেন, 'এই বিধাতা ও বিধান এতই গভীর রহস্য যে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি আরও অনেক অনেক উন্নত হলেও তার

যথার্থ সন্ধান পেতে বহু বিলম্ব হবে।' অর্থাৎ, মনের একটা দ্বার খুলে রেখেছিলেন বিদ্যাসাগর, বুঝেছিলেন—জ্ঞানবিজ্ঞানের পথে এগিয়ে চলাই মানুষের ধর্ম, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে ও মানবিক প্রেমে-মমতায় কর্তব্যপালনই মানবধর্ম ; সে পথে ঈশ্বর সম্বন্ধে যদি জ্ঞান হয়, হোক—কিন্তু আপাতত তার হেতু নেই।

তথাপি তাতে প্রশ্ন শেষ হয়নি—আমাদের কালেও, ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মবিশ্বাস ছিল, কি ছিল না, একটা প্রশ্ন থেকে গিয়েছে। শ্রীযুক্ত হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাসাগর' পুস্তকে (ইংরেজি) উপনিষদের দোহাই দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই উপলব্ধিই বিদ্যাসাগরের ঘটেছিল। এঁরা একবারও ভেবে দেখছেন না, বিদ্যাসাগরের লেখায় কেন বেদ-উপনিষদের দোহাই নেই—যখন দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি 'তত্ত্ববোধিনী' কর্তৃপক্ষ তা নিয়ে তন্ময়। শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ মনে করেন—ভগবদ্-জিজ্ঞাসা ছিল বিদ্যাসাগরের 'সাবজেক্‌টিভ' ব্যাপার—একান্ত নিজস্ব ব্যাপার—প্রকাশের বা বাহ্যরূপায়ণের বস্তু নয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর ছিলেন এক ধরনের নাস্তিক—অর্থাৎ অজ্ঞেয়বাদী। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য স্পষ্ট করেই দাবি করেছেন—বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন। কৃষ্ণকমল নিজে ছিলেন সেদিনের পজিটিভিস্ট'। বিদ্যাসাগরের বিশিষ্ট বন্ধু জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি কলকাতার 'পজিটিভিস্ট সোসাইটি' গঠন করেছিলেন। কৃষ্ণকমল নিজে তার সদস্য ছিলেন। বিদ্যাসাগর আনুষ্ঠানিকভাবে সে সভার সদস্য না হলেও, সম্ভবত সে মতবাদের বিরোধী ছিলেন না, কার্যত পজিটিভিস্টদের 'রিলিজিয়ন অব্ ম্যান'ই পালন করতেন, বলা চলে। কৃষ্ণকমল তাই হয়তো তাঁকে নিজের মতো (পজিটিভিস্ট?) নাস্তিক বলে দাবি করেছেন। অন্য দিকে, ঈশ্বরচন্দ্রের রচিত পাঠ্যপুস্তকাদিতে পরমেশ্বরের সম্বন্ধে কোথাও কোথাও উল্লেখ আছে—'বোধোদয়ে'র সেই ঈশ্বর-প্রসঙ্গ তো সুবিদিত। বিদ্যাসাগরের নিজের চিঠিপত্রে 'শ্রীদুর্গা', 'শ্রীহরি সহায়' প্রভৃতি শিরঃপাঠ রয়েছে,—এসব 'প্রমাণ' থেকে অনেকের বক্তব্য, বিদ্যাসাগর ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হলে বই বা চিঠিপত্রে এসব লিখতেন না। কিন্তু ছাত্রপাঠ্য পুস্তকে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ না থাকলে সেদিনে কর্তৃপক্ষের নিকট বই গ্রাহ্য হত না ; চিঠিপত্রে 'শ্রীহরিসহায়' ইত্যাদি পাঠ তো তখনকার দিনের চিঠিপত্রে প্রথাগত ব্যাপার—যেমন প্রথাগত ছিল সাধারণ-ভাবে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় বিবাহশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া ও আচারনিয়ম পালন। এসব লেখায় বা আচরণে তাই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা কি সমীচীন? বিদ্যাসাগরের লেখা ও সাধারণ কথাবার্তায় অন্যরূপ 'প্রমাণ' তো অনেক বেশি। তাঁকে 'মেটিরিয়লিস্ট' না বললেও 'রিয়লিস্ট' বলে মানতেই হয়।

বিদ্যাসাগর দেবমন্দিরে যেতেন না—এই সাধুসন্ন্যাসীর দেশে কোনো মাতাজী,

বাবাজী প্রভৃতির কাছেও ঘেঁসতেন না। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাতের কথা বাঙালীমাত্রেই জানে—শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর স্বভাবগত ঔৎসুক্যে এসেছিলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে। যথারীতি বিদ্যাসাগর তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। দুজনাতে যে হাস্যকৌতুকের আলাপ হয়, তা 'শ্রীম'-র বিবরণে ('শ্রীম'—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত', ২য় খণ্ড) সুরক্ষিত রয়েছে। তাতে কৌতুকজনক কথা আছে, জ্ঞানের কথা, ভক্তির কথাও; কিন্তু বিদ্যাসাগরের মুখ থেকে যে ঈশ্বর সম্বন্ধে সুস্থির বিশ্বাসভক্তির একটি কথাও শ্রীরামকৃষ্ণও আদায় করতে পারেননি—তা বোঝা যায়। ভক্ত মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে কী মনে করেছিলেন বলা কঠিন। বিবেকানন্দের মত অবশ্য জানা যায়—আমরা তা এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু বিবেকানন্দ মূলত আধুনিক চেতনায় প্রবুদ্ধ মানুষ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মতো ভক্তিতে তন্ময় নন। বিশেষ করে মানুষ হিসাবে বিবেকানন্দও ছিলেন মানবতার ও পৌরুষের অধিকারী—জ্বলন্ত ব্যক্তিত্ব। বিদ্যাসাগরের মানবতার মর্মোপলব্ধি তাঁর পক্ষে তাই অসম্ভব হয়নি। তিনি তাতেই দেখেছেন বিদ্যাসাগরের অন্তরস্থ (অচেতন ?) অধ্যাত্মচেতনার আভাস।

তবু স্পষ্টই বোঝা যায় এদেশে ধর্ম বলতে যা বোঝায় এবং ধার্মিক লোকেরা ঈশ্বর বলতে যা বোঝেন—বিদ্যাসাগর তাতে আস্থা রাখতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল মানবিক ধর্মে—রিলিজিয়ন্ অব্ ম্যান্-এ, এ বরং বলা যায়; যদিও প্রমাণ অজস্র যে, তাঁর সারা জীবনের নিদারুণ অভিজ্ঞতায় মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাস বিষমরূপেই চিড় খেয়ে গিয়েছিল—সে বিশ্বাস ভেঙে যাওয়া তাঁর কালে, তাঁর মতো মানুষের পক্ষে, অনিবার্য ছিল। তথাপি ঈশ্বর সেই শূন্যস্থান—যতখানিই হোক তা জুড়ে বসতে পারেনি, তিনিও ঈশ্বরে আশ্রয় খোঁজেননি। তাই বলা যায়, বিদ্যাসাগরের মত ছিল বুদ্ধদেবেরই মতের সমতুল্য—বুদ্ধদেব যেমন প্রিয় শিষ্য আনন্দের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন; ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন কোরো না, বরং আমি যেমন বলেছি তেমনভাবে জীবন গঠন করো, 'আর্য অষ্ট সত্য' অবলম্বন করো। ক্ষমা-মৈত্রী-করুণায় জীবনকে নির্মল করে তোলাই জীবনের সম্ভাব্য সাধনা। বিদ্যাসাগরের জীবনদর্শনের সঙ্গে মূলত এই আদর্শেরই দেখা যায় সুসংগতি—এই সুস্থ মানবতাবাদের।

তাই আমাদের স্বীকার্য—বিদ্যাসাগরের ধর্মমত একটা গৌণ প্রসঙ্গ; প্রায় নিষ্ফল আলোচনা। তাতে নিজেদের মতভেদ প্রমাণ করা যেতে পারে, এইমাত্র। বিদ্যাসাগরের সমস্ত জীবনের মধ্য দিয়ে আমরা এই মানবধর্মেরই স্বীকৃতি দেখতে পাই—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। আর, এ 'মানুষ' চণ্ডীদাসের আধ্যাত্মিক মানুষ নন, আধুনিক সভ্যতার সামাজিক মানুষ। এ সত্য বিদ্যাসাগরের

রচনাতেই প্রকাশিত। নিজ বাস্তব কর্মজীবনের সমস্ত আঘাত-সংঘাতের মধ্যেও—ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা শুদ্ধই যুগমানবতার এক মূর্ত প্রকাশ মানুষ বিদ্যাসাগর ; আমাদের সে যুগের 'ফার্স্ট ম্যান'—ধর্মনিরপেক্ষ জীবন-যাত্রার, বস্তুমুখী জীবনদর্শনের, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্মত যুগসাধনার। শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ যেমন বলেছেন—ইনটেলেকচুয়াল হিউম্যানিস্ট, শুধু তা নন ; একই কালে বিদ্যাসাগর জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে মানুষকে স্বীকার করেছেন ; অন্তরের প্রেম-করুণা দিয়ে বুঝেছেন মানুষই সত্য—হিউমেন হিউম্যানিস্ট : আবার কর্ম ও সাধনা দিয়ে চেয়েছেন—মানুষের অধিকারে সেই মানুষের প্রতিষ্ঠা : ফাইটার্ ফর্ রাইট্স্ অব্ ম্যান্ অ্যান্ড হিউম্যানিজ্ম্।

এই জন্যই অনুভব করতে হয়—কাল এগিয়ে যাবে, বিদ্যাসাগরের কালও আমাদের দেশে আজ প্রায় শেষ হচ্ছে ; কিন্তু ইতিহাসের যে পরিণতির ইঙ্গিত বহন করে বিদ্যাসাগর বাঙালী সমাজে উদিত হন—সেই পরিণতি পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে ওঠাও নিয়ম—সেই 'বহমান কালগঙ্গা'র সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যোগ মনে-প্রাণে-কর্মে অচ্ছেদ্য। তাই, কাল যতই এগিয়ে যাক, বিদ্যাসাগরকে ছাড়িয়ে যাবে না। বিদ্যাসাগর থাকবেন আমাদের সঙ্গেই সহযাত্রী ও অভিযাত্রী।

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র

১। ১১ আগস্ট, ১৮৭০ (২৭ শ্রাবণ, ১২৭৭) পুত্র নারায়ণচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীকে বিয়ে করলে বিদ্যাসাগর ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে এই পত্র লেখেন।

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং

শুভাশিষঃ সন্তু—

২৭ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, নারায়ণ ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে। এই সংবাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে।

ইতিপূর্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারারণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে ; আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম, সে বিধবাবিবাহ করা স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয় সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা, আমার পক্ষে কোনও মতেই উচিত কর্ম হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, আমরা উদ্‌যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি। এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা-বিবাহ না করিয়া কুমারী-বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া, আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোন সৎকর্ম করতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্তস্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে, আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি ; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা

আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব ; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, সমাজের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে নারায়ণের সহিত আহার ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সেজন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবে, এরূপ বোধ হয় না এবং আমিও তজ্জন্য বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায় এরূপ বিষয়ে সকলেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ, অন্যদীয় ইচ্ছার অনুবর্তী বা অনুরোধের বশবর্তী হইয়া চলা, কাহারও উচিত নহে। ইতি—৩১ শ্রাবণ, ১২৭৭ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র

সংসারসুখে হতাশ হয়ে বিদ্যাসাগর এক সময়ে আত্মীয়দের যে সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন :

২। মাতৃদেবীকে লেখা

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মাতৃদেবী শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্বকং নিবেদনমিদম্

নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোনও বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোনও সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে পূর্বের মত নানা বিষয়ে সংসৃষ্ট থাকিলে অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। এজন্য স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃত ভাবে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি। মাতার নিকট পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং আপনকার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি, তাহা বলা যায় না। এজন্য কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বচনে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া এ অধম সন্তানের সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিবেন। আপনকার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত মাস মাস যে ত্রিশ টাকা পাঠাইয়া থাকি যতদিন শরীর ধারণ করিবেন কোনও কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবেক না। তদ্ব্যতিরিক্ত আপনকার পিতৃকৃত্য ও মাতৃকৃত্যের ব্যয়নির্বাহার্থে বার্ষিক দুইশত টাকা প্রেরিত হইবেক। যদি কখনও কোনও বিষয়ে আমায় কিছু বলা

আবশ্যক বোধ করেন পত্র দ্বারা লিখিয়া পাঠাইবেন। আমি অনেকবার আপনকার শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াছি এবং পুনরায় শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি, যদি আমার নিকট থাকা অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব এবং আপনকার চরণ সেবা করিয়া চরিতার্থ হইব ইতি ১২ই অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

৩। স্ত্রী দিনময়ী দেবীকে লেখা চিঠি

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

গুণালঙ্কৃত শ্রীমতী দিনময়ী দেবী
কল্যাণনিলয়েষু
শুভাশীর্বাদপূর্বকমাবেদনমিদম্

আমার সাংসারিক সুখভোগের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আর আমার সে বিষয়ে অণুমাত্র স্পৃহা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা....। এক্ষণে তোমার নিকটে এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি এবং বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যদি কখনও কোনও দোষ বা অসন্তোষের কার্য করিয়া থাকি, দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবে। তোমার পুত্র উপযুক্ত হইয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তোমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয়নির্বাহের যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি, বিবেচনাপূর্বক চলিলে, তদ্দ্বারা স্বচ্ছন্দরূপে যাবতীয় আবশ্যক বিষয় সম্পন্ন হইতে পারিবেক। পরিশেষে আমার সবিশেষ অনুরোধ এই, সকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ ধৈর্য অবলম্বন করিয়া চলিবে, নতুবা স্বয়ং যথেষ্ট ক্লেশ পাইবে এবং অন্যেরও বিলক্ষণ ক্লেশদায়িনী হইবে। ইতি ১২ই অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

৪। মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্নকে লেখা পত্রাংশ

এক্ষণে তোমাদের নিকট জন্মের মত বিদায় লইতেছি। যদি কখনও কোনও দোষ বা অসন্তোষের কার্য করিয়া থাকি দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করিবে। যদি কখনও কোনও বিষয় আমায় জানান আবশ্যক বোধ কর, পত্রদ্বারা জানাইবে, আর সাংসারিক ব্যয়নির্বাহার্থে মাসিক আনুকূল্য গ্রহণ অভিমত হইলে, তদর্থে মাসে মাসে ৭০ টাকা পাঠাইতে পারি। এককালীন অধিক দেওয়া আমার শক্তিবহির্ভূত।

৫। তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা পত্রাংশ

এক্ষণে তোমাদের নিকট....। তোমার সাংসারিক ব্যয়নির্বাহবিষয়ে যে আনুকূল্য করিতেছি, যতদিন আমার দিবার সঙ্গতি ও তোমার লইবার ইচ্ছা থাকিবেক ততদিন তাহা করিব, কোনও কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবেক না।...পরিশেষে আমার সবিশেষ অনুরোধ এই, যথাসম্ভব সকল লোকের সহিত, বিশেষতঃ প্রতিবেশিবর্গের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিবে, তাহা হইলে নির্বিরোধে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবে।

৬। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্রকে লেখা পত্রাংশ

...যদি সাংসারিক ব্যয়নির্বাহার্থে অভিরুচি হয়, মাস মাস ত্রিশ টাকা পাঠাইতে পারি। তুমি যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছ তদ্বিষয়ে কিছু সাহায্যও করিয়াছি, তাহার অতিরিক্ত আর পারিব না। কারণ এককালীন অধিক দেওয়া আমার শক্তিবহির্ভূত।

৭। বিদ্যাসাগর তাঁর দেশের বাড়ির অন্যতম পরিচায়ক গদাধর পালকে এই চিঠি লেখেন

নানাগুণালঙ্কৃত শ্রীযুত গদাধর পাল ভাইজী কল্যাণভাজনেষু

শুভাশীর্বাদপূর্বকমাবেদনমিদম্

নানা কারণবশতঃ স্থির করিয়াছি আমি আর বীরসিংহায় যাইব না। তুমি গ্রামের প্রধান, এজন্য তোমা দ্বারা গ্রামস্থ সর্বসাধারণ লোকের নিকট এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি এবং সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার ও আশীর্বাদ জানাইয়া বিনয়বাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি, যদি কখনও কোনও দোষ করিয়া থাকি, সকলে দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করিবে। সাধারণের হিতার্থে গ্রামে যে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে এবং গ্রামস্থ নিরুপায় লোকদিগের মাস মাস যে কিছু কিছু আনুকূল্য করিয়া থাকি, আমার শক্তি থাকিতে ঐ সকল বিষয় রহিত হইবে না। কিছুকাল হইল আমার মনের ও শরীরের অবস্থা অতি মন্দ হইয়াছে। সুতরাং অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। যত দিন বাঁচিব, যদি শুনিতে পাই, তোমরা সকলে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছ, তাহা হইলে যার পর নাই সুখী হইব। ইতি ১২ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

৮। পিতাকে লেখা

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পিতৃদেব শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণিপাতপূর্বক নিবেদনম্

নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আমার ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোনও বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোনও সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে সাংসারিক বিষয়ে সংসৃষ্ট থাকিলে অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। এজন্য স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃত ভাবে অতিবাহিত করিব। সঙ্কল্প করিয়া শ্রীমতী মাতৃদেবী প্রভৃতিকে যে পত্র লিখিয়াছি তাহার প্রতিলিপি শ্রীচরণসমীপে প্রেরিত হইতেছে, যদি ইচ্ছা হয় দৃষ্টি করিবেন।

সাংসারিক বিষয়ে আমার মত হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি। কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি, সে বিষয়ে কোনও অংশে কৃতকার্য হইতে পারি নাই। যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়, সে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না, এই প্রাচীন কথা কোনও ক্রমেই অযথা নহে। সংসারী লোক যে সকল ব্যক্তির কাছে দয়া ও স্নেহের আকাঙ্ক্ষা করে, তাঁহাদের একজনেরও অন্তঃকরণে যে, আমার উপর দয়া ও স্নেহের লেশমাত্র নাই, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। এরূপ অবস্থায় সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া ক্লেশভোগ করা নিরবচ্ছিন্ন মূর্খতার কর্ম। যে সমস্ত কারণে আমার মনে এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে আর তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

এক্ষণে আপনকার শ্রীচরণে আমার বক্তব্য এই, পিতার নিকট পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা, সুতরাং আপনকার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি তাহা বলা যায় না। তজ্জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর বচনে শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া এ অধম সন্তানের সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিবেন।

কার্যগতিকে ঋণে বিলক্ষণ আবদ্ধ হইয়াছি। ঋণ পরিশোধ না হইলে, লোকালয় পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে যাহাতে সত্বর ঋণমুক্ত হই, তদ্বিষয়ে যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছি। ঋণে নিষ্কৃতি পাইলেই কোনও নির্জন স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিব। আপনকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয়নির্বাহার্থে যাহা প্রেরিত হইয়া থাকে, যতদিন আপনি শরীর ধারণ করিবেন, কোনও কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবেক না। ইতি ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

৯। পুত্রবধূ ভবসুন্দরী দেবীকে লেখা চিঠি

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

বৎসে ভবসুন্দরী

শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি নানা কারণবশতঃ অনেক দিন তোমাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। সেজন্য বোধ করি তুমি অতিশয় দুঃখিত আছ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছ। আমি এতদিন তোমায় পত্র না লিখিয়া অন্যায় কর্ম করিয়াছি তাহার সন্দেহ নাই।

আমি কলিকাতায় অতিশয় অসুস্থ হইয়া দশ দিবস হইল কর্মাটাঁড় আসিয়াছি। কলিকাতায় বিলক্ষণ অসুখ ভোগ করিয়াছি, এখানে আসিয়াও ভালরূপ আরাম হইতে পারি নাই। এখানে আর ৮।১০ দিন থাকিয়া পুনরায় কলিকাতায় যাইব। কলিকাতায় গিয়া যেন তোমার পত্র পাই। কুন্দ বোধ করি এতদিনে আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাকে বসাইয়া খাওয়াইতে বড় ইচ্ছা হয়। তাহার সম্ভাষণ-বাক্যগুলি সর্বদাই মনে পড়ে। ইতি ১লা চৈত্র ১২৮৫ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

১০। পৌত্রী মৃণালিনীকে লেখা চিঠি

সস্নেহ সম্ভাষণমাবেদনমিদম্

তোমার পত্র পাইয়াছি এবং তোমার জননীদেবীর পেটের অসুখ ভাল হইয়াছে এবং তোমরা সকলে ভাল আছ আর তুমি বস্তুবিচার পড়িতেছ, কুন্দমালা কথামালা পড়িতেছে, এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। তোমরা মন দিয়া লেখাপড়া শিখিবে। ভাল শিখিতে পারিলে আমি তোমাদিগকে অতিশয় ভালবাসিব। তুমি মধ্যে মধ্যে আমাকে পত্র লিখিবে। আর কুন্দ যদি লিখিতে পারে, তাহাকে পত্র লিখিতে বলিবে। তোমাদের পত্র পাইলে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইব।

প্রায় এক মাস হইল আমার পেটের অসুখ হইয়াছে। এখনও ভাল হইতে পারি নাই। অতিশয় দুর্বল হইয়াছি। আজ তিন দিন হইল কিছু ভাল আছি। বোধ হইতেছে আর ৪।৫ দিনে ভাল হইতে পারিব। তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না। তোমার ঠাকুরমা, পিসিমারা এবং সুরেশ, যতীশ, হরিমোহন, রামকমল প্রভৃতি এবং রানীরা সকলে ভাল আছেন। তোমার জননী, কুন্দ, প্যারী, মতি ইহাদিগকে আমার আশীর্বাদ ও স্নেহসম্ভাষণ বলিবে। দুর্বল আছি বলিয়া তোমার জননীকে পত্র লিখিতে পারিলাম

না। তোমাকে না লিখিলে হয়ত তুমি রাগ করিবে এজন্য তোমাকে লিখিলাম। আজ আর লিখিতে পারিব না। ইতি ১লা আষাঢ় ১২৯১ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

১১। পৌত্র প্যারীমোহনকে লেখা চিঠি

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

প্রাণাধিক ভাই প্যারীমোহন

তুমি পত্র লিখিতে পারিয়াছ ইহাতে আমি কত আহ্লাদিত হইয়াছি বলিতে পারি না। তুমি মন দিয়া লেখাপড়া করিবে, তাহা হইলে আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইব। তুমি প্রতি মাসে দুইবার আমাকে পত্র লিখিবে।

তোমরা সকলে ভাল আছ এই সংবাদে আহ্লাদিত হইলাম। আমি এখন অনেক ভাল আছি। বাটীর আর সকলে ভাল আছেন। মতিমালা, কুন্দমালা, মৃণালিনী ও তোমার জননীকে আমার স্নেহসম্ভাষণ জানাইবে। ইতি ২৭শে পৌষ, ১২৯২।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

১২। প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীকে লিখিত চিঠি

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকার

ভ্রাতঃ!—প্রায় দুই সপ্তাহ কাল আমি অত্যন্ত অসুস্থ ও একটি দৌহিত্র উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় যৎপরোনাস্তি ব্যতিব্যস্ত ছিলাম। এজন্য পরিচারকদিগকে বলিয়াছিলাম কাহাকেও আসিতে দিও না। বলিবে আমি অতিশয় অসুস্থ আছি, দেখা হইবেক না। অনেকে এই কথায় ক্ষান্ত না হইয়া চিরকুটে আপন নাম ও পরিচয় লিখিয়া পরিচারকদিগকে দিতেন, তাহারা ঐ সকল চিরকুট আমার নিকটে আনিত আর যদি কেহ কাহারও পত্র আনিতেন, তাহাও আনিয়া দিত। এইরূপ চিরকুট ও পত্র প্রত্যহ অন্ততঃ পঁচিশখান তাহারা আনিয়া দিয়াছে। এক গোস্বামীর পুত্রকে তুমি যে পত্র দাও, তাহাও আনিয়া দিয়াছে; তোমার প্রেরিত যে পত্রের উত্তর লিখিতেছি তাহাও আনিয়া দিয়াছে, এমন স্থলে তোমার উল্লিখিত Gentleman's Son

(ভদ্রলোকের ছেলেটি) যে পত্র আনিয়াছিলেন, কেবল সেইখানি আনিয়া আমায় দিতে অসম্মত হইল কেন বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার পত্র পাইয়া পরিচারকদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল, 'কোনও ব্যক্তি পত্র আনিয়াছিলেন তাহা লইয়া আপনাকে দিতে অসম্মত হইয়াছি, যদি কেহ এরূপ কথা বলিয়া থাকেন, তিনি অন্যায় করিয়াছেন; আমরা পত্র লইয়া যাইব না, এরূপ কথা কাহাকেও বলি নাই; যিনি যখন পত্র আনিয়াছেন তখনই ঐ পত্র আপনার নিকট আনিয়া দিয়াছি। যাহা হউক সমুদয় অনুধাবন করিয়া পরিচারকদিগকে অপরাধী করিতে সাহস হইতেছে না এবং আপনাকেও অপরাধী ভাবিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। তুমি এখানকার বৃত্তান্ত কিছুই জান না, সুতরাং তোমার Gentleman's Son (ভদ্রলোকের ছেলেটি) যাহা কহিয়াছেন, তাহাতে নির্ভর করিয়া উচিত ও আবশ্যক বোধে আমায় যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়াছ। ফলকথা এই, আমার আত্মীয়েরা আমার পক্ষে বড় নির্দয়; সামান্য অপরাধ ধরিয়া অথবা অপরাধ কল্পনা করিয়া আমায় নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। এই সংস্কার অনেক দিন পূর্বে আমার হৃদয়ে প্ররূঢ় হইয়া ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে, এজন্য তোমার পত্র পাঠ করিয়া সবিশেষ ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত হইলাম না। ইতি—১৫ই মাঘ ১২৮৭ সাল।

ত্বদেকশর্মশর্মণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

১৩। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠি

সাদরসম্ভাষণমাবেদনমিদম্

আপনার নির্বিঘ্নে পঁহুছান সংবাদ পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, কিন্তু যাইয়া কিছু অসুস্থ হইয়াছেন পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। মেদিনীপুর স্থান ভাল, ত্বরায় সুস্থ হইবেন ও ভাল থাকিবেন কোনও সন্দেহ নাই, তবে সে স্থান নূতন, এখানে যেমন সর্বদা আত্মীয়বর্গের মধ্যে থাকিতেন ও সর্বদা তাঁহাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতেন, সেখানে আপাততঃ তাহা দুর্লভ, সুতরাং এ নিমিত্ত কিছু দিন মনের অসুখে থাকিবেন, ক্রমে তথায়ও আত্মীয়সঙ্ঘটন হইবেক। সংসারে এই রীতি। লিখিয়াছেন Second Master (দ্বিতীয় শিক্ষক) অধ্যক্ষবর্গের প্রিয়পাত্র, সুতরাং তাঁহার সহিত অস্বরস হইলে, অসুখের বিষয় ঘটিতে পারে, অতএব আমার মতে তাঁহার সহিত মিল করিয়া লওয়া ভাল। আর তিনি অভদ্র হন, ঘরের ভাত অধিক করিয়া খাইবেন, আপনি ধর্মতঃ আপন কর্ম নির্বাহ করিবেন, তাহা হইলে ধর্মদ্বারে খালাস।

লোকাল কমিটি (Local Committee) মধ্যে যে সাহেবকে ভদ্র দেখিবেন,

মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট গেলেও হানি নাই। বোধ করি, সকি সাহেব তথায় মাজিস্ট্রেট। আমি শুনিয়াছি তিনি ভদ্র বটেন ও বুদ্ধিজীবীও বটেন, বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার অনুরাগ আছে।

সর্বদা সাবধানে থাকিবেন এবং অনুগ্রহপূর্বক মধ্যে মধ্যে মঙ্গলসংবাদ লিখিয়া নিরুদ্বিগ্ন ও সুস্থ করিতে আজ্ঞা হইবেক। ত্বদেকশর্মশর্মণঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

১৪। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি

সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্

আপনার কন্যার বিবাহ বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়াছি, কিন্তু আপনাকে কি পরামর্শ দিব, কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। ফলকথা এই যে, এরূপ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া কোনও ক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে। প্রথমতঃ আপনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, ব্রাহ্মধর্মে আপনকার যেরূপ শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে দেবেন্দ্রবাবু যে প্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, যদি তাহা ব্রাহ্মধর্মের অনুযায়িনী বলিয়া আপনকার বোধ থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রণালী অনুসারেই আপনকার কন্যার বিবাহ দেওয়া সর্বতোভাবে বিধেয়। দ্বিতীয়তঃ যদি আপনি দেবেন্দ্রবাবুর অবলম্বিত প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন প্রণালী অনুসারে কন্যার বিবাহ দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মবিবাহ প্রচলিত হওয়ার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিবে। ব্রাহ্মপ্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিলে ঐ বিবাহ সর্বাংশে সিদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক কিনা, তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না। এ সমস্ত কারণে আমি এ বিষয়ে সহসা আপনাকে কোনও পরামর্শ দিতে উৎসুক বা সমর্থ নহি। তবে এইমাত্র পরামর্শ দিতে পারি যে, আপনি সহসা কোনও পক্ষ অবলম্বন করিবেন না।

উপস্থিত বিষয়ে আমার প্রকৃত বক্তব্য এই যে, এরূপ বিষয়ে অন্যের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা বিধেয় নহে; ঈদৃশ স্থলে নিজের অন্তঃকরণে অনুধাবন করিয়া যেরূপ বোধ হয় তদনুসারে কর্ম করাই কর্তব্য, কারণ যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সে ব্যক্তির নিজের যেরূপ মত ও অভিপ্রায় তদনুসারে পরামর্শ দিবেন, আপনকার হিতাহিত বা কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে তত দৃষ্টি রাখিবেন না।

এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া উপস্থিত বিষয়ে স্বয়ং কর্তব্য নিরূপণ করিলেই আমার মতে সর্বাংশে ভাল হয়।

ভবদীয়

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

১৫। চন্দ্রমুখী বসু বাঙালী মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বিদ্যাসাগর আনন্দ প্রকাশ করে এক সেট শেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী উপহার দিয়ে এই চিঠি লেখেন।

বৎসে চন্দ্রমুখি

সেদিন তোমায় দেখিয়া ও তোমার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া, আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। তুমি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবনী হইয়া সুখে কাল হরণ কর, এবং স্বজনবর্গের আনন্দদায়িনী ও সজ্জন সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হও, এই আমার আন্তরিক অভিলাষ ও ঐকান্তিক প্রার্থনা।

এই সমভিব্যাহারে যৎকিঞ্চিৎ উপহার (Shakespeare's Works) প্রেরিত হইয়াছে। পরিগৃহীত হইলে নিরতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইব। কিমধিকমিতি ১০ অগ্রহায়ণ ১২৯১ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

পরিশিষ্ট—খ

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা

সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতামতের সারাংশ :

"সংস্কৃত কলেজের হাতে লেখা অপ্রকাশিত নথিপত্রের মধ্যে 'Notes on the Sanskrit College' শিরোনামে একটি সুদীর্ঘ ২৬ প্যারা-সংবলিত রচনা আছে। ঈশ্বরচন্দ্র এই Notes-এর রচয়িতা, রচনার তারিখ ১২ এপ্রিল ১৮৫২।···এর মধ্যে বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শের সমগ্র রূপটি এমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যা আর অন্য কোথাও ওঠেনি।"—(বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—বিনয় ঘোষ, পৃঃ ১৭০)। শ্রীবিনয় ঘোষ অনূদিত Notes-এর সারাংশ নিচে উদ্ধৃত হল—

১। বাঙলাদেশে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।

২। যাঁরা ইয়োরোপীয় আকর থেকে জ্ঞানবিদ্যার উপকরণ আহরণ করতে সক্ষম নন, এবং সেগুলিকে ভাবগম্ভীর, প্রাঞ্জল বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম, তাঁরা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।

৩। যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নন, তাঁরা সুসংবদ্ধ প্রাঞ্জল বাঙলাভাষায়

রচনা সৃষ্টি করতে পারবেন না। সেইজন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ইংরেজীভাষায় ও সাহিত্যে সুশিক্ষার প্রয়োজন।

৪। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যাঁরা কেবল ইংরেজী বিদ্যায় পারদর্শী, তাঁরা সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাঙলাভাষায় কিছু প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁরা এত বেশী ইংরেজীভাবাপন্ন যে, তাঁদের যদি অবসর সময়ে খানিকটা সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলেও তাঁরা শত চেষ্টা করেও পরিমার্জিত দেশীয় বাঙলাভাষায় কোন ভাবই প্রকাশ করতে পারবেন না।

৫। তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজী সাহিত্য ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তারাই একমাত্র সুসমৃদ্ধ বাঙলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।

৬। পরের প্রশ্ন হল, এই উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজে কি ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

৭। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণে ও সাহিত্যে খুব ভালভাবে শিক্ষা দিতে হবে। সাহিত্যের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে কাব্য, নাটক ও গদ্য সবই থাকবে।

৮। অলঙ্কারশাস্ত্রে তাদের দু-একখানি ভাল বই পড়ালেই চলবে, যেমন 'কাব্যপ্রকাশ' ও 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের দু-একটি অধ্যায়।

৯। ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠ করলে ছাত্রদের সংস্কৃত বিদ্যার ভিত্ দৃঢ় হবে।

১০। স্মৃতিশাস্ত্রে এইগুলি পাঠ হতে পারে : মনুস্মৃতি, মিতাক্ষরা—দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা। এই শাস্ত্রগুলি পাঠ করলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে।

১১। বর্তমানে গণিতশাস্ত্রের পাঠ্য হল লীলাবতী ও বীজগণিত। গণিত-বিজ্ঞানের পক্ষে এই দুখানি বই যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া এমন এক পদ্ধতিতে বই দুখানি রচিত, প্রচলিত ছড়া আর্যা ইত্যাদির সাহায্যে, যে আসল বিষয়বস্তু এক-একটি প্রহেলিকা হয়ে উঠেছে। সহজ বিষয় সরল করে না বলার জন্য ছাত্রদের অনেক বেশী সময় লাগে এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে। প্রায় তিন চার বছর ধরে তাদের বই দুখানি পড়তে হয়। বইয়ের মধ্যে দৃষ্টান্ত না থাকার জন্য অনেক 'সমস্যা' ছাত্রদের বোধগম্য হয় না। আসল কথা হল, সংস্কৃত-গণিত ছাত্রদের পড়ানোর কোন সার্থকতা নেই, কারণ এতে ছাত্রদের প্রচুর সময় ও শ্রমের অপব্যয় হয়। সেই সময়টুকু তারা অন্য প্রয়োজনীয় বিষয় পড়তে পারে।

১২। সেইজন্য সংস্কৃতে গণিতশিক্ষা না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

১৩। এ থেকে একথা বুঝলে ভুল হবে যে আমি শিক্ষার ব্যাপারে গণিতবিদ্যার যথাযথ গুরুত্ব দিই না। তা আদৌ ঠিক নয়। আমি শুধু বলতে চাই যে সংস্কৃতের বদলে ইংরেজীর মাধ্যমে গণিতবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া উচিত, কারণ তাতে ছাত্ররা অর্ধেক সময়ে দ্বিগুণ শিখতে পারবে।

১৪। হিন্দু-দর্শনের ছয়টি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় আছে,—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত ও মীমাংসা। ন্যায়দর্শনে প্রধানত তর্কবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা, এবং মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ রসায়ন আলোকবিদ্যা ও বলবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। পাতঞ্জল ও মীমাংসা সম্বন্ধেও প্রায় ঐ একই কথা বলা যায়। মীমাংসায় উৎসব-পার্বণের এবং পতঞ্জলে ঈশ্বরচিন্তা হল বিষয়বস্তু।

১৫। কলেজপাঠ্য হিসেবে এইসব বিষয় প্রয়োজনীয় কিনা, সে সম্বন্ধে ১৩ ডিসেম্বর ১৮৫০ আমি আমার রিপোর্টে যে মত ব্যক্ত করেছি আজও তাই সমর্থন করি।

১৬। "এ কথা ঠিক যে হিন্দু-দর্শনের অনেক মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না, কিন্তু তা হলেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত। ছাত্ররা যখন দর্শনশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে, তার আগে ইংরেজী ভাষায় তারা সে জ্ঞান অর্জন করবে তাতে ইয়োরোপের আধুনিক দর্শনবিদ্যা পাঠ করারও সুবিধা হবে তাদের। ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দুই দর্শনেই সম্যক জ্ঞান থাকলে, এদেশের পণ্ডিতদের পক্ষে আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝা সহজ হবে। সমস্ত রকম মতামতের দর্শন ছাত্রদের পড়তে বলার উদ্দেশ্য হল, সেগুলি পড়লে তারা দেখতে পাবে কিভাবে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করেছেন এবং এক দর্শনের পণ্ডিত ভিন্ন দর্শনের ভুলভ্রান্তি দেখিয়েছেন এবং প্রতিপাদ্যের যৌক্তিকতা খণ্ডন করেছেন। সুতরাং আমার ধারণা, সর্বমতের দর্শন পাঠ করবার সুযোগ দিলে ছাত্রদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত গড়ে উঠবে। তার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে, দুই দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য কোথায় তাও তারা বুঝতে পারবে।"

১৭। এই শিক্ষার আর-একটি সুবিধা হল এই যে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ভাবধারা আমাদের বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করতে হলে যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (technical word) জানা দরকার, তা পণ্ডিতদের আয়ত্তে থাকবে।

১৮। এ-সব বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকার প্রয়োজন নেই। ছাত্ররা যদি এইগুলি পড়ে তাহলেই যথেষ্ট হবে : ন্যায়দর্শন—গোতমসূত্র ও কুসুমাঞ্জলি ; বৈশেষিক-দর্শন—কণাদের সূত্র ; সাংখ্যদর্শন—কপিলের সূত্র এবং কৌমুদী ; পাতঞ্জল দর্শন—পতঞ্জলের সূত্র ; বেদান্তদর্শন—বেদান্তসার এবং ব্যাসের সূত্র, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ;

মীমাংসাদর্শন—জৈমিনির সূত্র। এগুলি ছাড়া ছাত্ররা 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' পড়বে, কারণ তার মধ্যে সব দর্শনের সারকথা পাওয়া যাবে।

১৯। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণ ও সাহিত্যশ্রেণীতে পড়বার সময় তিন-ভাগের দুইভাগ সময় সংস্কৃতের জন্য ও একভাগ সময় ইংরেজীর জন্য দেওয়া উচিত। অলংকার, স্মৃতি ও দর্শনশ্রেণীতে পড়ার সময় তাদের প্রধান মনোযোগের বিষয় হবে ইংরেজী। অর্থাৎ তিনভাগের দুভাগ সময় ইংরেজীবিদ্যার জন্য নিয়োগ করা উচিত।

২০। আমার ধারণা, যে সমস্ত বিষয় সংস্কারের কথা আমি এখানে বলেছি, সেগুলি কার্যকর না হলে সংস্কৃত কলেজের কোন প্রকৃত উন্নতি হবার সম্ভাবনা নেই এবং তার আসল আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করাও অসম্ভব।

(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা
১২ই এপ্রিল, ১৮৫২

ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্টের বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পত্র

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের সংস্কারে ব্রতী, সেই সময় শিক্ষা-পরিষদ কাশীর সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ—বিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ জে. আর. ব্যালাণ্টাইনকে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করতে আহ্বান করেন। ১৮৫৩ (জুলাই-আগস্ট) সালে ডাঃ ব্যালাণ্টাইন কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে শিক্ষা-পরিষদের কাছে একটা রিপোর্ট পেশ করেন। শিক্ষা-পরিষদ ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্ট বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন (২৯ আগস্ট, ১৮৫৩)। সংস্কৃত কলেজের সংস্কার সাধনের জন্য ডাঃ ব্যালাণ্টাইন রিপোর্টে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর তা সমর্থন না করে, শিক্ষা-পরিষদের কাছে নিজের মতামত জানিয়ে যে চিঠি লেখেন, তার কিছুটা সংক্ষেপিত বঙ্গানুবাদ নিচে উদ্ধৃত হল (উৎস : সাহিত্য-সাধক চরিতমালা —১৮) :

বিদ্যালয়ে যে-সকল ব্যবস্থা সম্প্রতি প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের মত গুণী লোকের অনুমোদন লাভ করিয়াছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।

ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক প্রচলন বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। মিলের লজিকের যে সংক্ষিপ্তসার তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, সংস্কৃত কলেজে পাঠ্য পুস্তকরূপে তাহাই তিনি প্রবর্তিত করিতে চান। বর্তমান অবস্থায়, আমার মতে, সংস্কৃত কলেজে মিলের গ্রন্থ পড়ান একান্ত প্রয়োজন। মিলের পুস্তকের মূল্য অধিক,—ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সংক্ষিপ্তসারের প্রচলন প্রস্তাবের

প্রধান কারণ ইহাই মনে হয়। আমাদের ছাত্রদের প্রামাণিক গ্রন্থ-সমূহ একটু বেশী দাম দিয়াও কিনিবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; কাজেই মূল্যাধিক্যের জন্য এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রচলন হইতে বিরত থাকিবার কারণ নাই। ডাঃ ব্যালান্টাইন বলেন, তাঁহার সংক্ষিপ্তসার মিলের লজিকের মুখবন্ধ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু মিল নিজে তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় বিশেষভাবে লিখিয়া গিয়াছেন যে, আর্চবিশপ হোয়েটলির তর্কশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থই তাঁহার লজিকের সর্বোৎকৃষ্ট উপক্রমণিকা। অতএব এ-বিষয়ে বিবেচনার ভার শিক্ষা-পরিষদের উপর রহিল। ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ বেদান্ত, ন্যায় ও সাংখ্য-দর্শনের তিনখানি পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তনের প্রস্তাবও তিনি করিয়াছেন। 'বেদান্তসার' পূর্ব হইতেই পাঠ্যরূপে সংস্কৃত কলেজে গৃহীত; ইহার ইংরেজী অনুবাদ পড়ান যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত ন্যায়-সম্বন্ধীয় 'তর্ক-সংগ্রহ' এবং সাংখ্য সম্পর্কিত 'তত্ত্বসমাস' নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ। আমাদের পাঠ্য-সূচিতে উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম পুস্তকের নির্দেশ আছে। বিশপ বার্কলের Inquiry সম্বন্ধে আমার মত এই যে, পাঠ্য পুস্তকরূপে ইহার প্রবর্তনে সুফল অপেক্ষা কুফলের সম্ভাবনাই অধিক। কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য ও বেদান্ত না পড়াইয়া উপায় নাই। সে-সকল কারণের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন এ-সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই। মিথ্যা হইলেও হিন্দুদের কাছে এই দুই দর্শন অসাধারণ শ্রদ্ধার জিনিস। সংস্কৃতে যখন এগুলি শিখাইতেই হইবে, ইহাদের প্রভাব কাটাইয়া তুলিতে প্রতিষেধকরূপে ইংরেজীতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ান দরকার। বার্কলের Inquiry বেদান্ত বা সাংখ্যের মত একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে; ইউরোপেও এখন আর ইহা খাঁটি দর্শন বলিয়া বিবেচিত হয় না, কাজেই ইহাতে কোন ক্রমেই সে কাজ চলিবে না। তা ছাড়া হিন্দু-শিক্ষার্থীরা যখন দেখিবে, বেদান্ত ও সাংখ্য-দর্শনের মত একজন ইউরোপীয় দার্শনিকের মতের অনুরূপ, তখন এই দুই দর্শনের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা কমা দূরে থাকুক, বরং আরও বাড়িয়া যাইবে। এ অবস্থায় বিশপ বার্কলের গ্রন্থ পাঠ্য পুস্তকরূপে প্রচলন করিতে আমি ডাঃ ব্যালান্টাইনের সহিত একমত নহি।

সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় প্রকারের পাঠ-পদ্ধতিই যে ভাল, এ কথা ডাঃ ব্যালান্টাইন স্বীকার করিয়াছেন। অথচ উভয়বিধ পাঠের ফলে "সত্য দ্বিবিধ" —এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাত্রদের মনে জন্মিতে পারে এ ভয় করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "এ ভয় অলীক নয় সংস্কৃত-শাস্ত্রে পণ্ডিত অথচ ইংরেজীতেও অভিজ্ঞ আমি এমন-সব ব্রাহ্মণকে জানি, যাঁহারা পাশ্চাত্য লজিক ও সংস্কৃত ন্যায়—এই উভয় শাস্ত্রের মত ঠিক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু উভয়ের মূল তত্ত্বের ঐক্য সম্বন্ধে কোন ধারণা তাঁহাদের

নাই এবং সেজন্য এক ভাষায় অন্যটির চিন্তাপদ্ধতি প্রকাশ করিতে অক্ষম।" আমার বিশ্বাস যে-লোক সংস্কৃত ও ইংরেজী—এই উভয় ভাষার বিজ্ঞান ও সাহিত্য বুদ্ধিমানের মত পাঠ করিয়াছে—বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে—তাহার সম্বন্ধে এইরূপ ভয় করিবার কোন কারণ নাই। যে যথার্থরূপে ধারণা করিয়াছে, তাহার কাছে সত্য—সত্যই। "সত্য দুই রকমের" এই ভাব অসম্পূর্ণ ধারণার ফল। সংস্কৃত কলেজে আমরা যে-শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে এইরূপ ফলের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই দূর হইবে। যেখানে দুইটি সত্যের মধ্যে প্রকৃতই মিল আছে, সেখানে সেই ঐক্য যদি কোন বুদ্ধিমান ছাত্র বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে সেরূপ ঘটনা সত্যই অদ্ভুত বলিতে হইবে। ধরা যাক, ইংরেজী ও সংস্কৃত—উভয় ভাষাতেই ছাত্রেরা লজিক, অথবা দর্শন বিজ্ঞানের যে-কোন বিভাগ অধ্যয়ন করিল। এখন যদি তাহারা বলে, "লজিকের পাশ্চাত্য থিয়োরিও সত্য, হিন্দু থিয়োরিও সত্য", অথচ যদি তাহারা উভয়ের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান না পায়, এবং না পাইয়া এক ভাষার সত্য অন্য ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে হয় তাহারা বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই না-হয় যে-ভাষায় তাহারা নিজেদের ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম, সেই ভাষায় তাহাদের জ্ঞান অল্প। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, হিন্দু-দর্শনে এমন অনেক অংশ আছে, যাহা ইংরেজীতে সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ করা যায় না; তাহার কারণ, সে-সব অংশের মধ্যে পদার্থ কিছু নাই।

ডাঃ ব্যালাণ্টাইন আরও বলেন—"বর্তমান সংস্কৃত কলেজের গঠন-পদ্ধতির এবং ছাত্রদের সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ভাষায় শিক্ষার রীতি হইতেই বুঝা যায়, এমন এক-দল লোক গড়িয়া তোলা দরকার, যাহারা পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিবে, এবং উভয় দেশের পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বিভাষী ব্যাখ্যাতার কার্য করিয়া উভয়ের মধ্যে যেখানে দৃশ্যতঃ অনৈক্য, সেইখানে সত্যকার মিল দেখাইয়া দিয়া অনাবশ্যক কুসংস্কার দূর করিবে;—হিন্দুর দার্শনিক আলোচনা যে-সকল প্রাথমিক সত্যে পৌঁছিয়াছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে তাহাদের পূর্ণতর বিকাশ দেখাইয়া উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করিবে।" দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে আমি ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত অন্যমত। আমার মনে হয় না, আমরা সকল জায়গায় হিন্দুশাস্ত্র ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ঐক্য দেখাইতে পারিব। যদি-বা ধরিয়া লওয়া যায় ইহা সম্ভব, তবুও আমার মনে হয়, উন্নতশীল ইউরোপীয় বিজ্ঞানের তথ্য-সকল ভারতীয় পণ্ডিতগণের গ্রহণযোগ্য করা দুঃসাধ্য। তাহাদের বহুকাল সঞ্চিত কুসংস্কার দূর করা অসম্ভব। কোন নূতন তত্ত্ব, এমন কি, তাহাদের শাস্ত্রে যে তত্ত্বের বীজ আছে, তাহারই পরিবর্ধিত স্বরূপ—যদি তাহাদের গোচরে আনা যায়, তবে তাহারা গ্রাহ্য করিবে না।

পুরাতন কুসংস্কার তাহারা অন্ধভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। আরব-সেনাপতি অমরু আলেকজেন্দ্রিয়া বিজয় করিয়া যখন খালিফ ওমরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল—আলেকজেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালার ব্যবস্থা কি করা যাইতে পারে, তখন খালিফ উত্তর দিলেন, "গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলি হয় কোরাণের মতের অনুযায়ী, না-হয় বিরুদ্ধ; যদি অনুরূপ হয় তো এক কোরাণ থাকিলেই যথেষ্ট; আর যদি বিরূপ মত হয় তো গ্রন্থগুলি নিশ্চয়ই অনিষ্টকর। অতএব ওগুলি ধ্বংস কর।" ভাষায় বলিতে লজ্জা হয়—ভারতীয় পণ্ডিতগণের গোঁড়ামি ঐ আরব খালিফের গোঁড়ামির চেয়ে কিছু কম নয়। তাহাদের বিশ্বাস সর্বজ্ঞ ঋষিদের মস্তিষ্ক হইতে শাস্ত্র নির্গত হইয়াছে, অতএব শাস্ত্রসমূহ অভ্রান্ত। আলাপ অথবা আলোচনার সময় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নূতন সত্যের কথা অবতারণা করিলে, তাহারা হাসি-ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দেয়। সম্প্রতি ভারতবর্ষের এই প্রদেশে—বিশেষতঃ কলিকাতা ও তাহার আশেপাশে—পণ্ডিতদের মধ্যে একটি মনোভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, শাস্ত্রে যাহার অঙ্কুর আছে, এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনিলে, সেই সত্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা দেখান দূরে থাক, শাস্ত্রের প্রতি তাহাদের কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হয় এবং 'আমাদেরই জয়' এই ভাব ফুটিয়া উঠে। এই সব বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদের নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণ করাইবার কোন আশা আছে, এমন আমার বোধ হয় না। যে-প্রদেশের পণ্ডিতদের দেখিয়া ডঃ ব্যালান্টাইন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া এই সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তাঁহার মত পাল্টাইলে সুফল পাইবার সম্ভাবনা।

বাংলার কথা স্বতন্ত্র। 'দুই স্থানের বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনা করিয়া কার্য করা উচিত' এবং 'জোর করিয়া সামঞ্জস্য-বিধান বিজ্ঞের কার্য নহে'—তাঁহার এই মন্তব্যগুলি খুবই সমীচীন। ভারতবর্ষের এই অংশের স্থানীয় অবস্থার দরুন শিক্ষাবিস্তার-কার্যে আমাদের ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আমি সযত্নে এখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছি; তাহাতে আমার মনে হইয়াছে, দেশীয় পণ্ডিতদের কোন-কিছুতে হস্তক্ষেপ করা মোটেই উচিত নয়। তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের প্রয়োজন নাই; কেননা, আমরা তাঁহাদের কোনরূপ সাহায্য চাই না। আজ ইঁহাদের জ্ঞানও লুপ্তপ্রায়, কাজেই এই দলকে ভয় করিবার কারণ দেখি না। ইঁহাদের কণ্ঠ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। এ-দলের পূর্ব আধিপত্য ফিরিয়া পাইবার আর বড় সম্ভাবনা নাই। বাংলা দেশে যেখানে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, সেইখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব কমিয়া আসিতেছে। দেখা যাইতেছে, বাংলার অধিবাসীরা শিক্ষালাভের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। দেশীয় পণ্ডিতদের মনস্তুষ্টি না করিয়াও আমরা কি করিতে পারি তাহা দেশের

বিভিন্ন অংশে স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাই আমাদের শিখাইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার—ইহাই আমাদের প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করিতে হইবে, এই সব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে হইবে, শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে পারে, এমন এক দল লোক সৃষ্টি করিতে হইবে; তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল। মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তি,—শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই। এই ধরনের দরকারী লোক গড়িয়া তোলাই আমার উদ্দেশ্য—আমার সঙ্কল্প। ইহার জন্য আমাদের সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইবে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা কলেজের পাঠ শেষ করিয়া এই ধরনের লোক হইয়া উঠিবে—এমন আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এ আশা অলীক নয়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা যে বাংলা ভাষায় পূর্ণ অধিকারী হইবে—ইহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। ইংরেজী-বিভাগের পুনর্গঠনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা যদি মঞ্জুর হয়, তাহা হইলে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যেও যে তাহারা যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ ও তাহার ফলে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহে জ্ঞানলাভ করিবে, তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সুখের বিষয়, সম্প্রতি তাহাদের চিন্তাধারায় এমন পরিবর্তন হইয়াছে যে, মনে হয়, অতঃপর প্রত্যেক উপযুক্ত ছাত্রই দেশবাসীর মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবে।

(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা
অধ্যক্ষ সংস্কৃত কলেজ
৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩

পরিশিষ্ট—গ

শিক্ষা-পরিষদের অনুজ্ঞা বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পত্র

সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন বিষয়ে ডাঃ ব্যালান্টাইনের পরামর্শ গ্রহণে অক্ষমতা জানিয়ে বিদ্যাসাগর শিক্ষা-পরিষদের কাছে দীর্ঘ পত্র দেন (৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩)। তার উত্তরে শিক্ষা-পরিষদ লেখেন, "অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ডাঃ ব্যালান্টাইনের সংক্ষিপ্তসার ও অন্যান্য গ্রন্থ যেন অবাধে ব্যবহার করেন।...তাঁর বিদ্যালয়ের উন্নতি সম্বন্ধে অধ্যক্ষ যেন ডাঃ ব্যালান্টাইনের সঙ্গে সবসময় চিঠিপত্র আদান-প্রদান করেন (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩)।"

শিক্ষা-পরিষদের এই আদেশে বিদ্যাসাগর অসন্তুষ্ট হন। সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠনের কাজে তিনি অন্যের হস্তক্ষেপ মেনে নিতে রাজি নন। এ বিষয়ে, (৫ অক্টোবর ১৮৫৩) শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক ডাঃ ময়েটকে একখানা আধা সরকারী চিঠি লেখেন। চিঠিখানার বঙ্গানুবাদ নিচে উদ্ধৃত হল (উৎস—সাহিত্যসাধক চরিতমালা—১৮)—

প্রিয় মহাশয়,

ডাঃ ব্যালান্টাইনের রিপোর্ট-সম্পর্কে শিক্ষা-পরিষদের আদেশ স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম ; সেই আদেশগুলি হুবহু প্রতিপালন করিতে গেলে, পরিষদের অনুমতিক্রমে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্প্রতি সংস্কৃত কলেজে প্রবর্তন করিয়াছি, তাহাতে অযথা হস্তক্ষেপ করা হইবে। ফলে কলেজে আমার অবস্থা কতকটা অপ্রীতিকর, এবং বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার দিক্ দিয়াও ক্ষতিকর হইবে।

কলেজ বন্ধ এবং বাড়ি যাইবার উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যস্ততার দরুন আমি এ-বিষয়ে সরকারী চিঠি লিখিতে পারিলাম না। ডাঃ ব্যালান্টাইনের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করিবার বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর আপত্তি আমার মনে আসিয়াছে ; কলিকাতা-ত্যাগের পূর্বে তাহা আমি জানাইয়া যাইতে চাই।

যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমি অনুমোদন করিতে পারি না, তাহাই গ্রহণ করিতে, অথবা আমার সমপদস্থ এক জন অধ্যক্ষের সহিত বিদ্যালয়ের উন্নতির সম্বন্ধে পত্র-ব্যবহার করিতে বাধ্য হওয়ার মধ্যে মর্যাদাহানির যে কথা আছে, এমন একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে সেই ব্যক্তিগত কথা সম্প্রতি আমি মিশাইতে চাহি না ; এই সব সর্তে কাজ করিতে কোন শিক্ষিত ইংরেজই রাজী হইতেন না। ব্যক্তিগত আপত্তি ছাড়িয়া, প্রকৃত বিষয়ে অবতীর্ণ হইতেছি।

মনে হয়, ডাঃ ব্যালান্টাইন এই ভাবিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে কার্য না হইলে ইংরেজী, সংস্কৃতের ছাত্রেরা 'দুইরূপ সত্যের' অনুবর্তী হইয়া পড়িবে। তাঁহার কাশীর পণ্ডিত-বন্ধুগণের মনোবৃত্তির সম্বন্ধে আমি কোন প্রশ্ন তুলিব না। কিন্তু এ কথা আমি জানি এবং জোর করিয়া বলিতে পারি, বঙ্গদেশে এমন একজনও বুদ্ধিমান লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যিনি সংস্কৃত ও ইংরেজীতে শিক্ষিত হইয়া মনে করেন, 'সত্য দুই প্রকার।'

বাংলায় যথার্থ অধিকারী করিবার জন্য যদি আমি সংস্কৃত শিখাইতে পাই, তার পর যদি ইংরেজীর সাহায্যে ছাত্রদের মনে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার করিতে পারি এবং আমার কার্যে শিক্ষা-পরিষদের সাহায্য ও উৎসাহ পাই, তাহা হইলে এ-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন এক দল যুবক তৈয়ারী করিয়া দিব, যাহারা নিজ রচনা ও পড়াইবার গুণে আপনাদের ইংরেজী অথবা দেশীয় যে-

কোন কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রদের অপেক্ষা ভালরূপে দেশের লোকের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করিতে পারিবে। আমার এই একান্ত অভিলাষ—এই মহৎ উদ্দেশ্য কার্যকর করিবার জন্য আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা দিতে হইবে। ডাঃ ব্যালাণ্টাইন-কৃত সংক্ষিপ্ত-সার ও গ্রন্থের যেগুলি আমি অনুমোদন করিতে পারি—যেমন Novum Organum-এর সুন্দর ইংরেজী সংস্করণ—তাহা আনন্দসহকারে সত্বর বিদ্যালয়ে চালাইব। কিন্তু তাহাদের প্রয়োজন, মূল্য অথবা আমি যেখানকার অধ্যক্ষ, সেই বিদ্যালয়ের বিশেষ অভাব ও অবস্থার সম্বন্ধে আমার বিবেচনার উপর নির্ভর না করিয়াই যদি আমাকে তাঁহার গ্রন্থগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—'আমার কার্য শেষ হইয়াছে।' এইরূপ ব্যবস্থা আমার প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির বাধা জন্মাইবে এবং শিক্ষা-পরিষদের কর্মচারী হিসাবে আমার কর্তব্য-জ্ঞান সত্ত্বেও যে-দায়িত্ব আমি তীক্ষ্মভাবে বোধ করি, তাহা একেবারে নষ্ট না হউক—ক্ষীণ হইয়া আসিবে।

আশা করি, ব্যস্তভাবে লিখিত আমার বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিতগুলি শিক্ষা-পরিষদ্ সদয়-ভাবে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের প্রস্তাব কতকটা পরিবর্তিত করিয়া লইবেন,—যাহাতে সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে তাঁহাদের নির্দেশিত শিক্ষা-ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক না হইয়া পড়ে।

যদি দরকার হয়, কলেজের অবকাশের পর আমি এই বিষয়ে সরকারী—সুতরাং অধিকতর কেতাদুরস্ত—পত্র লিখিব।

(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

৫ অক্টোবর, ১৮৫৩

বাংলায় শিক্ষা-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মতামত

বঙ্গদেশে ছোটলাটের পদ সৃষ্ট হয়, ১ মে, ১৮৫৪। প্রথম ছোটলাট হলেন—ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডে। এই পদে প্রতিষ্ঠিত হবার দু'মাস আগে শিক্ষা-পরিষদের সদস্যরূপে হ্যালিডে বাঙলায় শিক্ষা-সম্বন্ধে তাঁর মত একটা মিনিটে ব্যক্ত করেছিলেন, ২৪ মার্চ, ১৮৫৪। হ্যালিডের এই মিনিটের মূল উৎস ছিল বিদ্যাসাগরের সুচিন্তিত মন্তব্য। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৮' থেকে বিদ্যাসাগরের মন্তব্যটির বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হল—

১। সুবিস্তৃত এবং সুব্যবস্থিত বাঙলা-শিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়, কেন-না, মাত্র ইহারই সাহায্যে জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব।

২। লেখা, পড়া, আর কিছু অঙ্ক শেখাতেই এই শিক্ষা পর্যবসিত হইলে

চলিবে না। শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবন-চরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শরীরতত্ত্ব শেখান প্রয়োজন।

৩। নিম্নলিখিত প্রকাশিত প্রাথমিক পুস্তকগুলি পাঠ্যরূপে গ্রহণযোগ্য ঃ—

(ক) শিশুশিক্ষা (পাঁচ ভাগ)। প্রথম তিন ভাগে আছে—বর্ণপরিচয়, বানান এবং পঠন শিক্ষা। চতুর্থ ভাগ—জ্ঞানোদয় সম্পর্কিত একখানি ছোট বই। পঞ্চম ভাগ—'চেম্বার্স এডুকেশনাল কোর্স'-অন্তর্গত নৈতিক-পাঠ পুস্তকের ভাবানুবাদ।

(খ) পশ্বাবলী, অর্থাৎ জীবজন্তুর প্রাকৃতিক বিবরণী।

(গ) বাংলার ইতিহাস—মার্শম্যানের গ্রন্থের ভাবানুবাদ।

(ঘ) চারুপাঠ বা প্রয়োজনীয় এবং চিত্তাকর্ষক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে পাঠমালা।

(ঙ) জীবনচরিত—'চেম্বার্স এক্সেম্প্ল্যারি বায়োগ্রাফি'-অন্তর্গত কোপার্নিকস্, গ্যালিলিও, নিউটন, সার্ উইলিয়ম হর্শেল, গ্রোশ্যস, লিনিয়স, ডুবাল, সার্ উইলিয়ম জোন্স ও টমাস জেঙ্কিন্সের জীবনবৃত্তের ভাবানুবাদ।

৪। পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা এবং নীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী রচিত হইতেছে। ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি, শারীরতত্ত্ব, ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ এবং কতকগুলি ধারাবাহিক জীবনচরিত এখনও রচনা করিতে হইবে। বর্তমানে ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস হইলেই চলিবে।

৫। একজন শিক্ষক হইলে চলিবে না ; প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্ততঃ দুই জন করিয়া শিক্ষক চাই। স্কুলগুলিতে সম্ভবতঃ তিনটি হইতে পাঁচটি করিয়া শ্রেণী থাকিবে ; কাজেই এক জন শিক্ষকের দ্বারা সুশৃঙ্খলায় কাজ চলিবে না।

৬। গুণ এবং অন্যান্য অবস্থা অনুসারে পণ্ডিতদের মাহিনা ন্যূনপক্ষে ৩০্, ২৫্, অথবা ২০্ টাকা হওয়া চাই। পূর্বকথিত পুস্তকগুলি যখন রচিত হইয়া পাঠের জন্য গৃহীত হইবে, তখন প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক ৫০্ টাকা বেতনে এক জন হেড-পণ্ডিত রাখার প্রয়োজন হইবে।

৭। শিক্ষকেরা কোথাও না গিয়া নিজেদের নির্দিষ্ট স্থানেই যাহাতে যথানিয়মে বেতন পান, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮। হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর—এই চারিটি জেলা বর্তমানে কাজের জন্য নির্বাচিত করিয়া লইতে হইবে। উপস্থিত পঁচিশটি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত। প্রয়োজনানুসারে জেলা চারিটির মধ্যে এইগুলি ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। নগর এবং গ্রামের এমন স্থানে স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যেন তাহার নিকটে কোন ইংরেজী কলেজ বা স্কুল না থাকে। ইংরেজী কলেজ ও স্কুলের আশেপাশে বাংলা-শিক্ষা ঠিকভাবে আদৃত হয় না।

৯। কর্মকুশল সুদক্ষ তত্ত্বাবধানের উপরও বটে, এবং কৃতবিদ্য ছাত্রদের উৎসাহ-দানের উপরও বটে, বাংলা-শিক্ষার সাফল্য বহুপরিমাণ নির্ভর করে। জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানোপার্জন সাধারণ দেশবাসীর এখনও উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায় নাই। এই কারণে, ছোট লাট হার্ডিঞ্জের প্রস্তাব যাহা এত দিন চাপা ছিল—দৃঢ়ভাবে প্রযুক্ত হওয়া দরকার।

১০। তত্ত্বাবধানের নিম্নলিখিত উপায় বিশেষ কার্যকর এবং অল্পব্যয়সাধ্য হইবে।

১১। যাতায়াতের ব্যয়সুদ্ধ, মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে দুই জন বাঙালী তত্ত্বাবধায়ক রাখা প্রয়োজন;—এক জন মেদিনীপুর ও হুগলীর জন্য আর এক জন নদীয়া ও বর্ধমানের জন্য। তাহাদের কাজ হইবে ঘন ঘন স্কুলগুলি পরিদর্শন করা, শ্রেণীগুলির পরীক্ষা লওয়া, এবং শিক্ষাপ্রণালী সংশোধন করা।

১২। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইবেন। ইহার জন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত কোন পারিশ্রমিক দিতে হইবে না; কেবলমাত্র যাতায়াতের খরচা দিলেই চলিবে। এই বাবদ বৎসরে ৩০০৲ টাকার বেশী ব্যয় হইবে না। তিনি বৎসরে একবার স্কুলগুলি পরিদর্শন করিয়া কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দিবেন। কর্তৃপক্ষের উপরই বাংলা স্কুলগুলির পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকিবে।

১৩। গ্রন্থ-প্রণয়ন এবং পুস্তক ও শিক্ষক নির্বাচনের ভার প্রধান তত্ত্বাবধায়কের উপর থাকিবে।

১৪। সংস্কৃত কলেজ সাধারণ শিক্ষার এক কেন্দ্রভূমি হইয়াও বাংলা শিক্ষক গড়িবার জন্য নর্মাল স্কুলরূপে পরিগণিত হইবে।

১৫। এমনি ভাবে শিক্ষকদের শিক্ষাদান, পাঠ্য পুস্তক রচনা ও গ্রহণ, শিক্ষক-নির্বাচন এবং সাধারণ তত্ত্বাবধানের ভার একই পদে যুক্ত হইলে, অনেক অসুবিধা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে।

১৬। মাসিক এক শত টাকা বেতনে, প্রধান তত্ত্বাবধায়কের একজন সহকারী নিযুক্ত করিতে হইবে। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে শিক্ষক-তৈয়ারী ও পাঠ্য-পুস্তক-প্রণয়নে সাহায্য করিবেন এবং প্রধান তত্ত্বাবধায়ক বাংলা স্কুল-পরিদর্শনে বাহির হইলে তাঁহার স্থানে অস্থায়িভাবে কাজ চালাইবেন।

১৭। গুরুমহাশয়-চালিত এখনকার পাঠশালাগুলি কোন কাজেরই নয়। যে-কাজে তাহারা অযোগ্য, এই সকল শিক্ষক সেই কাজ হাতে লওয়াতে পাঠশালাগুলির অবস্থা শোচনীয়। তত্ত্বাবধায়কদের কাজ হইবে—এই সকল পাঠশালা পরিদর্শন করা এবং শিক্ষাদানের রীতি সম্বন্ধে গুরুমহাশয়দের যথাসাধ্য উপদেশ দেওয়া। পূর্বো-

লিখিত পাঠ্য পুস্তকগুলি সুযোগ-মত যথাসাধ্য প্রবর্তন করাও তাঁহাদের কর্তব্যের অন্তর্গত প্রকৃতপক্ষে পাঠশালাগুলি যাহাতে প্রয়োজনসাধক বিদ্যালয়রূপে গড়িয়া উঠে, সেদিকে তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১৮। দেশীয় লোক অথবা মিশনরী কর্তৃক স্থাপিত যে-সব স্কুল সুদক্ষ শিক্ষকের হাতে আছে, অবশ্য তাহাদের উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। তত্ত্বাবধায়কেরা এই সকল বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া কি রকম উৎসাহ ও সাহায্য তাহারা পাইতে পারে, তাহা নির্ধারণ করিবেন।

১৯। নিজের নিজের এলাকার অন্তর্গত, শহর ও পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগকে গবর্মেণ্ট স্কুলের আদর্শে স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিতে প্ররোচিত করাও তত্ত্বাবধায়কদের এক কর্তব্য হইবে।—৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৫৪।

পরিশিষ্ট—ঘ

বিদ্যাসাগরের উইল

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

১। আমি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া সচ্ছন্দচিত্তে আমার সম্পত্তির অন্তিম বিনিয়োগ করিতেছি। এই বিনিয়োগ দ্বারা আমার কৃত পূর্বান সমস্ত বিনিয়োগ নিরস্ত হইল।

২। চৌগাছা নিবাসী শ্রীযুত কালীচরণ ঘোষ, পাথরানিবাসী শ্রীযুত ক্ষীরোদনাথ সিংহ, আমার ভাগিনেয় পসপুরনিবাসী শ্রীযুত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় এই তিন জনকে আমার এই অন্তিম বিনিয়োগপত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত করিলাম, তাঁহারা এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী যাবতীয় কার্য নির্বাহ করিবেন।

৩। আমি অবিদ্যমান হইলে আমার সমস্ত সম্পত্তি নিযুক্ত কার্যদর্শীদিগের হস্তে যাইবেক।

৪। এক্ষণে আমার যে সকল সম্পত্তি আছে কার্যদর্শীদিগের অবগতি নিমিত্ত তৎসমুদয়ের বিবৃতি এই বিনিয়োগপত্রের সহিত গ্রথিত হইল।

৫। কার্যদর্শীরা আমার ঋণ পরিশোধ ও আমার প্রাপ্য আদায় করিবেন।

৬। আমার সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে আমার পোষ্যবর্গ ও কতকগুলি নিরুপায় জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রভৃতির ভরণপোষণ ও কতিপয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ হইয়া আসিতেছে, এই সমস্ত ব্যয় এককালে রহিত করিয়া আপন আপন প্রাপ্য আদায়ে প্রবৃত্ত হইবেন,

আমার উত্তমর্ণেরা সেরূপ প্রকৃতির লোক নহেন। কার্যদর্শীরা তাঁহাদের সম্মতি লইয়া এরূপ ব্যবস্থা করিবেন যে বিনিয়োগপত্রের লিখিত বৃত্তি প্রভৃতি প্রচলিত থাকিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য ক্রমে আদায় হইয়া যায়।

৭। এক্ষণে যে সকল ব্যক্তি আমার নিকট মাসিকবৃত্তি পাইয়া থাকেন আমি অবিদ্যমান হইলে তাঁহাদের সকলের সেরূপ বৃত্তি পাওয়া সম্ভব নহে। তন্মধ্যে যাঁহারা আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যেরূপ মাসিক বৃত্তি পাইবেন তাহা নির্দিষ্ট হইতেছে ঃ

প্রথম শ্রেণী

পিতৃদেব শ্রীযুত ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০	পঞ্চাশ টাকা
মধ্যম সহোদর শ্রীযুত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন	৪০	চল্লিশ টাকা
তৃতীয় সহোদর শ্রীযুতশম্ভূচন্দ্র বিদ্যারত্ন	৪০	চল্লিশ টাকা
কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০	ত্রিশ টাকা
জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী	১০	দশ টাকা
মধ্যমা ভগিনী শ্রীমতী দিগম্বরী দেবী	১০	দশ টাকা
কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী	১০	দশ টাকা
বনিতা শ্রীমতী দিনময়ী দেবী	৩০	ত্রিশ টাকা
জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবী	১৫	পনর টাকা
মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী	১৫	পনর টাকা
তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী	১৫	পনর টাকা
কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী	১৫	পনর টাকা
পুত্রবধূ শ্রীমতী ভবসুন্দরী দেবী	১৫	পনর টাকা
পৌত্রী শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী	১৫	পনর টাকা
জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	১৫	পনর টাকা
কনিষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান যতীশচন্দ্র সমাজপতি	১৫	পনর টাকা
দৌহিত্রী শ্রীমতী রাজরানী দেবী	১৫	পনর টাকা
কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ শ্রীমতী এলোকেশী দেবী	১০	দশ টাকা
শাশুড়ী শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী	১০	দশ টাকা
জ্যেষ্ঠা কন্যার শাশুড়ী শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবী	১০	দশ টাকা
জ্যেষ্ঠা কন্যার ননদ শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দেবী	১০	দশ টাকা
মাতৃদেবীর মাতুলকন্যা শ্রীমতী উমাসুন্দরী দেবী	৩	তিন টাকা
মাতৃদেবীর মাতুল-দৌহিত্র গোপালচন্দ্রের বনিতা	৩	তিন টাকা

পিতৃম্বসৃপুত্র ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায়ের বনিতা	৩	তিন টাকা
পিতৃদেবের পিতৃম্বসৃকন্যা শ্রমতী নিস্তারিণী দেবী	৩	তিন টাকা
বৈবাহিকী শ্রীমতী সারদা দেবী	৫	পাঁচ টাকা
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মাতা	৮	আট টাকা
মদনমোহন বসুর বনিতা শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসী	১০	দশ টাকা
শ্রীযুত মধুসূদন ঘোষের বনিতা শ্রীমতী থাকমণি দাসী	১০	দশ টাকা
বারাসতনিবাসী শ্রীযুত কালীকৃষ্ণ মিত্র	৩০	ত্রিশ টাকা
কালীকৃষ্ণ মরিয়া গেলে তাঁহার বনিতা শ্রীমতী উমেশমোহিনী দাসী	১০	দশ টাকা
শ্রীরাম প্রামাণিকের বনিতা শ্রীমতী ভগবতী দাসী	২	দুই টাকা
দ্বিতীয় শ্রেণী		
মাতৃম্বসৃ-পুত্র শ্রীযুত সর্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	দশ টাকা
ভাগিনেয়ী শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী	৫	পাঁচ টাকা
জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ননদ শ্রীমতী তারামণি দেবী	৫	পাঁচ টাকা
পিতৃম্বসৃ-কন্যা শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী	২	দুই টাকা
মাতৃদেবীর মাতৃম্বসৃ-পুত্র শ্রীযুত শ্যামাচরণ ঘোষাল	৫	পাঁচ টাকা
মাতৃদেবীর মাতুলপুত্র তারাচরণ মুখোর পরিবার	৮	আট টাকা
মাতৃদেবীর মাতৃম্বসৃ-পুত্র শ্রীযুত কালিদাস মুখো	৫	পাঁচ টাকা
মাতৃদেবীর পিতৃম্বসৃ-পুত্র রামেশ্বর মুখোর পরিবার	৫	পাঁচ টাকা
মাতৃদেবীর মাতুলকন্যা শ্রীমতী বরদা দেবী	২	দুই টাকা
বারাসতনিবাসী নবীনকৃষ্ণ মিত্রের বনিতা শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দাসী	১০	দশ টাকা
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা শ্রীমতী কুন্দমালা দেবী	১০	দশ টাকা
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ভগিনী বামাসুন্দরী দেবী	৩	তিন টাকা
বর্ধমানের প্যারীচাঁদ মিত্রের বনিতা শ্রীমতী কামিনী দাসী	১০	দশ টাকা

৮। যদি কার্যদর্শীরা দ্বিতীয়শ্রেণীবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে মাসিক বৃত্তি দেওয়া অনাবশ্যক বোধ করেন অর্থাৎ আমার দত্ত বৃত্তি না পাইলেও তাঁহার চলিতে পারে এরূপ দেখেন তাহা হইলে তাঁহার বৃত্তি রহিত করিতে পারিবেন।

৯। আমার দেহান্তসময়ে আমার মধ্যমা, তৃতীয়া ও কনিষ্ঠা কন্যার যে সকল পুত্র ও কন্যা বিদ্যমান থাকিবে কোনও কারণে তাহাদের ভরণপোষণ বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতির ব্যয়নির্বাহের অসুবিধা ঘটিলে তাহারা প্রত্যেকে দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত মাসিক ১৫ পনর টাকা বৃত্তি পাইবেক।

১০। আমার দেহান্তসময়ে আমার যে সকল পৌত্র ও দৌহিত্র অথবা পৌত্রী ও

দৌহিত্রী বিদ্যমান থাকিবেক তাহাদের মধ্যে কেহ অন্ধত্ব পঙ্গুত্ব প্রভৃতি দোষাক্রান্ত, অথবা অচিকিৎস্যরোগগ্রস্ত হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যাবজ্জীবন মাসিক ১০ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেক।

১১। যদি আমার মধ্যমা অথবা কনিষ্ঠা ভগিনীর কোন পুত্র উপার্জনক্ষম হইবার পূর্বে তাঁহার বৈধব্য ঘটে তাহা হইলে যাবৎ তাঁহার কোনও পুত্র উপার্জনক্ষম না হয় তাবৎ তিনি আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে সপ্তম ধারা নির্দিষ্ট বৃত্তি অতিরিক্ত মাসিক ২০ কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইবেন।

১২। যদি শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসীর কোন পুত্র উপার্জনক্ষম হইবার পূর্বে তাঁহার বৈধব্য ঘটে তাহা হইলে যাবৎ তাঁহার কোনও পুত্র উপার্জনক্ষম না হয় তাবৎ তিনি আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে সপ্তম ধারা নির্দিষ্ট বৃত্তি ব্যতিরিক্ত মাসিক ১০ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেন।

১৩। কার্যদর্শীরা আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে নীলমাধব ভট্টাচার্যের বনিতা শ্রীমতী সারদা দেবীকে তাঁহার নিজের ও পুত্রদ্বয়ের ভরণপোষণার্থে মাস মাস ৩০ ত্রিশ টাকা আর তাঁহার পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যাবজ্জীবন মাস মাস ১০ দশ টাকা দিবেন। তিনি বিবাহ করিলে অথবা উৎপথবর্তিনী হইলে তাঁহাকে উক্ত উভয় বিধের মধ্যে কোনও প্রকার বৃত্তি দিবার আবশ্যকতা নাই।

১৪। আমি অবিদ্যমান হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যে অনুষ্ঠানে যেরূপ মাসিক ব্যয় হইবেক তাহা নিম্নে নির্দিষ্ট হইতেছে।

জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে আমার স্থাপিত বিদ্যালয়—১০০ একশত টাকা।

" " গ্রামে স্থাপিত চিকিৎসালয়—৫০ পঞ্চাশ টাকা।

" " গ্রামের অনাথ ও নিরুপায় লোক—৩০ ত্রিশ টাকা

বিধবাবিবাহ—১০০ একশত টাকা

১৫। যদি শ্রীযুত জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র ভড় এই তিন জন আমার দেহান্তসময় পর্যন্ত আমার পরিচারক নিযুক্ত থাকে তাহা হইলে কার্যদর্শীরা তাহাদের প্রত্যেককে এককালীন ৩০০ তিন শত টাকা দিবেন।

১৬। কার্যদর্শীরা বিষয় রক্ষা লৌকিক রক্ষা কন্যা দান আবশ্যক ব্যয়-স্বীয় বিবেচনা অনুসারে করিবেন।

১৭। এই বিনিয়োগপত্রে যাঁহার পক্ষে অথবা যে বিষয়ে যে রূপ নির্বন্ধ করিলাম যদি তাহাতে তাঁহার পক্ষে সুবিধা অথবা সে বিষয়ের সুশৃঙ্খলা না হয় তাহা হইলে কার্যদর্শীরা সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া যাঁহার পক্ষে অথবা যে

বিষয়ে যেরূপ নির্বন্ধ করিবেন তাহা আমার স্বকৃতের ন্যায় গণনীয় ও মাননীয় হইবেক।

১৮। এক্ষণে আমার সম্পত্তির যেরূপ উপস্বত্ব আছে যদি উত্তরকালে তাহার খর্বতা হয় তাহা হইলে যাঁহাকে বা যে বিষয়ে যাহা দিবার নির্বন্ধ করিলাম কার্যদর্শীরা স্বীয় বিবেচনা অনুসারে তাহার ন্যূনতা করিতে পারিবেন।

১৯। আবশ্যক বোধ হইলে কার্যদর্শীরা আমার সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রয় করিতে পারিবেন।

২০। আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক সকল শম্ভুচন্দ্রের (সংস্কৃত যন্ত্রের) পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। আমার একান্ত অভিলাষ শ্রীযুত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় যাবৎ জীবিত ও উক্ত পুস্তকালয়ের অধিকারী থাকিবেন তাবৎকাল পর্যন্ত আমার পুস্তক সকল ঐ স্থানেই বিক্রীত হয়, তবে এক্ষণে যেরূপ সুপ্রণালীতে পুস্তকালয়ের কার্যনির্বাহ হইতেছে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে তন্নিবন্ধন ক্ষতি বা অসুবিধা বোধ হইলে কার্যদর্শীরা স্থানান্তরে বা প্রকারান্তরে পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

২১। কার্যদর্শীরা একমত হইয়া কার্য করিবেন, মতভেদস্থলে অধিকাংশের মতে কার্যনির্বাহ হইবেক।

২২। নিযুক্ত কার্যদর্শীদিগের মধ্যে কেহ অবিদ্যমান অথবা এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী কার্য করিতে অসম্মত হইলে দুইজন তাঁহার স্থলে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন। এই রূপে নিযুক্ত ব্যক্তি আমার নিজের নিয়োজিত ব্যক্তির ন্যায় কার্য-ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

২৩। যদি নিযুক্ত ব্যক্তি কার্যদর্শীরা এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী কার্যভার গ্রহণে অসম্মত বা অসমর্থ হন তাহা হইলে যাঁহারা এই বিনিয়োগপত্র অনুসারে বৃত্তি পাইবার অধিকারী তাঁহারা বিচারালয়ে আবেদন করিয়া উপযুক্ত কার্যদর্শী নিযুক্ত করাইয়া লইবেন। তিনি এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী সমস্ত কার্যনির্বাহ করিবেন।

২৪। যাবৎ আমার ঋণ পরিশোধ না হয় তাবৎকাল পর্যন্ত এই বিনিয়োগপত্রের নিয়ম অনুসারে নিযুক্ত কার্যদর্শীদিগের হস্তে সমস্ত ভার থাকিবেক। ঋণ পরিশোধ হইলে ঐ সময়ে যাঁহারা শাস্ত্রানুসারে আমার উত্তরাধিকারী থাকিবেন তাঁহারা আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন এবং সপ্তম নবম দশম একাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ ধারার নির্দিষ্ট বৃত্তি প্রভৃতি প্রদানপূর্বক উপস্বত্ব ভোগ করিবেন, ঐ উত্তরাধিকারীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কার্যদর্শীরা তাঁহাদিগকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া অবসৃত হইবেন।

২৫। আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই

যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী। এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণ বশতঃ আমি তাঁহার সংস্রব ও সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি। সেই হেতু বশতঃ বৃত্তিনির্বন্ধস্থলে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং এই হেতু বশতঃ তিনি চতুর্বিংশ ধারা নির্দিষ্ট ঋণ-পরিশোধকালে বিদ্যমান থাকিলেও আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত অথবা দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ ধারা অনুসারে এই বিনিয়োগপত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। তিনি চতুর্বিংশ ধারা নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধকালে বিদ্যমান না থাকিলে যাঁহাদের অধিকার ঘটিত তিনি তৎকালে বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা চতুর্বিংশ ধারার লিখিত মত আমার সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। ইতি তাং ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ সাল ইং ৩১ মে ১৮৭৫ সাল।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মোকাম কলিকাতা।

ইশাদী।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্যামাচরণ দে শ্রীবিহারীলাল ভাদুড়ী
শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় শ্রীনীলমাধব সেন শ্রীকালীচরণ ঘোষ
শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন শ্রীযোগেশচন্দ্র দে। সর্ব সাকিম কলিকাতা।

(পরে হাইকোর্টের বিচারে নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কিত উইলের ব্যবস্থা বাতিল হয়। ফলে নারায়ণচন্দ্র উত্তরাধিকারী স্বীকৃত হন।—সম্পাদক।)

চতুর্থ ধারায় উল্লিখিত সম্পত্তির বিবৃতি—(ক) সংস্কৃত যন্ত্রের তৃতীয় অংশ

(খ) আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক।

বাঙ্গালা—(১) বর্ণপরিচয় দুই ভাগ (২) কথামালা (৩) বোধোদয় (চ) চরিতাবলী (৫) আখ্যানমঞ্জরী দুই ভাগ (৬) বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ (৭) জীবনচরিত (৮) বেতাল পঞ্চবিংশতি (৯) শকুন্তলা (১০) সীতার বনবাস (১১) ভ্রান্তিবিলাস (১২) মহাভারত (১৩) সংস্কৃত ভাষা প্রস্তাব (১৪) বিধবাবিবাহ বিচার (১৫) বহুবিবাহ প্রস্তাব।

সংস্কৃত—(১) উপক্রমণিকা (২) ব্যাকরণ কৌমুদী (৩) ঋজুপাঠ তিন ভাগ (৪) মেঘদূত (৫) শকুন্তলা (৬) উত্তরচরিত।

ইঙ্গরেজী—(১) Poetical Selection, (২) Selection of Goldsmith

(গ) যে সকল পুস্তকের স্বত্বাধিকার ক্রয় করা হইয়াছে।

(১) মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত শিশুশিক্ষা তিন ভাগ।

(২) রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীনকুলসর্বস্ব।

(ঘ) কাদম্বরী সটীক, বাল্মীকি রামায়ণ প্রভৃতি মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তক।

(ঙ) নিজ ব্যবহারার্থ সংগৃহীত সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, পার্শী, ইংরেজী প্রভৃতি পুস্তকের লাইব্রেরী।

(ঙ) কর্মাটারের বাঙ্গালা ও বাগান।

(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পরিশিষ্ট—৬

বিদ্যাসাগর গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা রচনাবলী

১। বেতাল পঞ্চবিংশতি ১৯০৩ সংবৎ। ১৮৪৭ খৃীস্টাব্দ।

প্রথম সংস্করণের গ্রন্থের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকার হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম ছিল না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মেজর জি. টি. মার্শালের আদেশে এই গ্রন্থ লিখিত হয়।

"কালেজ অব্ ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ে তত্রত্য ছাত্রগণের পাঠার্থে··· উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহামতি শ্রীযুক্ত মেজর জি. টি. মার্শল মহোদয় কোনও নূতন পুস্তক প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে আমি, বৈতালপচ্চীসী নামক প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অবলম্বন করিয়া, এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম।"

'বিজ্ঞাপন' দ্বিতীয় সংস্করণ, সংবৎ ১৯০১

২। বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ ১৯০৪ সংবৎ। ১৮৪৮ খৃীস্টাব্দ

"বাংলার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ, শ্রীযুক্ত মার্শমন সাহেবের রচিত ইংরাজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বন পূর্বক, সংকলিত। ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। কোনও কোনও অংশ, অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং কোনও কোনও বিষয়, আবশ্যক বোধে, গ্রন্থান্তর হইতে সংকলন পূর্বক সন্নিবেশিত হইয়াছে।"—

'বিজ্ঞাপন' প্রথম সংস্করণ ১৯০৪ সংবৎ

৩। জীবনচরিত ১৭৭১ শক [১৮৪৯ খৃীস্টাব্দ]

"রবর্ট ও উইলিয়ম চেম্বর্স, বহুসংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ মহানুভবদিগের বৃত্তান্ত সংকলন করিয়া, ইংরেজী ভাষায় যে জীবনচরিত পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, তাহা বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হইলে, এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থিগণের পক্ষে বিশিষ্ট-

রূপ উপকার দর্শিতে পারে, এই আশায় আমি ঐ পুস্তকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু, সময়াভাব ও অন্যান্য প্রতিবন্ধক বশতঃ, তন্মধ্যে আপাততঃ কেবল কোপর্নির্কষ, গ্যালিলিয়, নিউটন, হর্সেল, লিনিয়স্, ডুবাল, জেঙ্কিন্স ও জোন্স এই কয়েক মহাত্মার চরিত অনুবাদিত ও প্রচারিত হইল।"

'বিজ্ঞাপন'

৪। বোধোদয় ১৯০৭ সংবৎ [১৮৫১ খ্রীস্টাব্দ]

"বোধোদয় নানা ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল। পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে। ...অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালকবালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক, এই আশায় অতি সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছি।"

'বিজ্ঞাপন' প্রথম সংস্করণ

৫। সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ১৯০৮ সংবৎ [১৮৫১ খ্রীস্টাব্দ]

"এই গ্রন্থে অল্পবয়স্ক বালকদিগের প্রথম শিক্ষাপযোগি মূল মূল বিষয় সকল সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি জন্মিবেক না যথার্থ বটে কিন্তু উপদেশ সাপেক্ষ হইয়া সহজ সহজ সংস্কৃত গ্রন্থ সকল সহজে অধ্যায়ন করিবার ক্ষমতা জন্মিবেক, সন্দেহ নাই।"

'বিজ্ঞাপন' প্রথম সংস্করণ

৬। ঋজুপাঠ

প্রথম ভাগ ১৯০৮ সংবৎ [১৮৫১ খ্রীস্টাব্দ]

দ্বিতীয় ভাগ ১৯০৮ সংবৎ [১৮৫১ খ্রীস্টাব্দ]

তৃতীয় ভাগ ১৯০৮ সংবৎ [১৮৫১ খ্রীস্টাব্দ]

'ঋজুপাঠ' প্রথমভাগে পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি উপাখ্যান আছে, দ্বিতীয়ভাগে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অংশ বিশেষ আছে ও তৃতীয়ভাগে হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংহার ও বেণীসংহার-এর অংশবিশেষ আছে।

৭। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব

১৯১০ সংবৎ [১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দ]

"এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কলিকাতাস্থ বীটন সোসাইটি নামক সমাজে পঠিত হইয়াছিল। আমি তৎকালীন সভাপতি মহামতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার মোয়েট মহোদয়ের অনুমতি লইয়া দুইশত পুস্তক মুদিত করিয়া বিতরণ করি।"

'বিজ্ঞাপন' দ্বিতীয় সংস্করণ

৮। ব্যাকরণ কৌমুদী

প্রথম ভাগ ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দ। দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দ। তৃতীয় ভাগ ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দ। চতুর্থ ভাগ ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দ।

৯। শকুন্তলা ১৯১১ সংবৎ [১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দ]

"কালিদাসের প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তল সংস্কৃত ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট নাটক।... সেই সর্বোৎকৃষ্ট নাটকের উপাখ্যান ভাগ সঙ্কলিত হইল।...এই শকুন্তলা দেখিয়া, কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলের উৎকর্ষ পরীক্ষা না করেন।"

'বিজ্ঞাপন'

১০। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব

প্রথম পুস্তক ১৯১১ সংবৎ [জানুয়ারি ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ]

দ্বিতীয় পুস্তক ১৯১২ সংবৎ [অক্টোবর ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ]

১১। বর্ণপরিচয়

প্রথম ভাগ ১৯১২ সংবৎ [১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ]

দ্বিতীয় ভাগ ১৯১২ সংবৎ [১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ]

১২। কথামালা ১৯১২ সংবৎ [১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দ]

"শ্রীযুক্ত রেবেরেণ্ড টমাস জেম্‌স ঈসপ রচিত গল্পের ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, অনুবাদিত গল্পগুলি সেই পুস্তক হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে।"

'বিজ্ঞাপন'

১৩। চরিতাবলী ১৯১৩ সংবৎ। [১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দ]

"সংক্ষেপে, সরল ভাষায় কতকগুলি মহানুভাবের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল।"

'বিজ্ঞাপন'

১৪। পাঠমালা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশার্থি বিদ্যার্থিগণের ব্যবহারার্থ সঙ্কলিত। ১৮৫৭।

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশার্থী বিদ্যার্থীদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনচরিত এই দুই পুস্তকে পরীক্ষা দিতে হইত। নানা কারণবশতঃ উল্লিখিত পুস্তকদ্বয় উক্ত বিষয়ের অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয় সমাজে এই স্থিরীকৃত হয় জীবনচরিত, শকুন্তলা, মহাভারতের অংশবিশেষ ও টেলিমেকসের প্রথম তিন সর্গ লইয়া এক পুস্তক সঙ্কলিত হয়। তদনুসারে প্রথম নির্দিষ্ট পুস্তকদ্বয়ের নির্ধারিত অংশ সকল গ্রহণপূর্বক এই

গ্রন্থ সংকলিত হইল আর টেলিমেকসের প্রথম তিন সর্গ স্বতন্ত্র পুস্তকে মুদ্রিত আছে, এজন্য উহা এই পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত হইল না।"

কলিকাতা শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

১লা মাঘ সংবৎ ১৯১৫

১৫। মহাভারত (উপক্রমণিকা ভাগ) ১৯১৬ সংবৎ [১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ]

"মহাভারতের উপক্রমণিকাভাগ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল। কতিপয় বন্ধুর সবিশেষ অনুরোধে পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল।"

'বিজ্ঞাপন'

১৬। সীতার বনবাস ১৯১৭ সংবৎ [১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ]

"সীতার বনবাস প্রচারিত হইল।···ভবভূতি প্রণীত উত্তর চরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত; অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ সকল পুস্তক বিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে। রামায়ণে উত্তরকাণ্ড অবলম্বন পূর্বক সংকলিত হইয়াছে।"

'বিজ্ঞাপন'

১৭। আখ্যানমঞ্জরী ১৯২০ সংবৎ [১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দ]

মাত্র ছয়টি আখ্যান ও অতিরিক্ত কয়েকটি নূতন আখ্যান নিয়ে আখ্যানমঞ্জরী। পরে প্রথম ভাগ ১৯২৪ সংবৎ [১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ] প্রকাশিত হয়, বাকী আখ্যানগুলির সঙ্গে আরও সাতটি নূতন আখ্যান নিয়ে আখ্যান-মঞ্জরী। দ্বিতীয় ভাগ ১৯২৪ সংবৎ [১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ] প্রকাশিত হয়। ১৯৪৫ সংবৎ [১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দ] আখ্যানমঞ্জরীর দ্বিতীয় ভাগের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হলে গ্রন্থকার 'বিজ্ঞাপনে' বলেন "এই পুস্তকের যে ভাগ, ইতঃপূর্বে দ্বিতীয় ভাগ বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহা অতঃপর তৃতীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইবেক।"

১৮। শব্দমঞ্জরী (বাংলা অভিধান) ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দ

১৯। পদ্যমঞ্জরী—দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন সংবৎ ১৯২৪ [১৮৬৭]

বিজ্ঞাপন। চাস, লোভ, সুখ, ক্রোধ ত্যাগ করিতে মনের প্রতি উপদেশ, অপকারীরও উপকার করা উচিত, আত্মপরীক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভাবিতে ভাবিতে যদৃচ্ছাক্রমে মুখ হইতে বিনির্গত হওয়ায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। পরে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অগ্রজ মহাশয়কে দেখাইলে তিনি উৎসাহ দিয়া তাহার সংকলিত ইংরাজী পোয়েটীকাল সিলেক্শন হইতে কয়েকটি বিষয় অবলম্বন করিয়া লিখিতে আদেশ দেন। তদনুসারে কয়েকটি বিষয় অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছিলাম। গত বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় হইতে একাল পর্যন্ত অবকাশ না থাকায় আর লেখা হয় নাই,

মুদ্রিত করাও হয় নাই। এই পদ্যমঞ্জরী পাঠ করিয়া বালকদিগের কিছুমাত্র উপকার দর্শিলেই শ্রম সফল বোধ করিব।

২০। ভ্রান্তিবিলাস ১৯২৬ সংবৎ [১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দ]

"ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি শেক্সপীয়রের প্রণীত ভ্রান্তিপ্রহসন পড়িয়া আমার বোধ হইয়াছিল, এতদীয় উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত হইলে লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে। তদনুসারে ঐ প্রহসনের উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত ও ভ্রান্তিবিলাস নামে প্রচারিত হইল।"

'বিজ্ঞাপন'

২১। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার

১৯২৮ সংবৎ [১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ]

এই বই প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত বহু বিবাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপিত করা। এই গ্রন্থ প্রকাশের পরে দেশের নানাস্থানে প্রতিবাদকারীরা বিরুদ্ধতা করলে বিদ্যাসাগর 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' দ্বিতীয় পুস্তক ১৯২৯ সংবৎ [১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দ] প্রকাশ করেন।

২২। বামনাখ্যানম ১৭৯৫ শক [১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দ]

মধুসূদন তর্কপঞ্চাননের ১১৭টি সংস্কৃত শ্লোক সংস্কৃত করিয়া বাংলা অনুবাদ সংযোজন দ্বারা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

২৩। নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস ১২৯৫ সাল [১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দ]

"মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম. এ., তর্কালংকার প্রণীত শিশুশিক্ষা উপলক্ষে আমার উপর পরস্বহারী বলিয়া যে দোষারোপ করেন, তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভের অভিপ্রায়ে, তদ্বিষয়ে স্বীয় বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া কতিপয় আত্মীয়ের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া⋯প্রচারিত করিতে হইল।"

'বিজ্ঞাপন'

২৪। সংস্কৃত রচনা ১২৯৬ সাল। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দ।

বিদ্যাসাগর কৃত বাল্যকালের কতকগুলি সংস্কৃত রচনা সংগ্রহ।

২৫। শ্লোকমঞ্জরী ১২৯৭ সাল [১৮৯০ খ্রীস্টাব্দ]

কতকগুলি উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ।

২৬। বিদ্যাসাগর চরিত ১৯৪৮ সংবৎ [১৮৯১ খ্রীস্টাব্দ]

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তাঁর এই অপ্রকাশিত আত্মচরিত পুত্র নারায়ণ বিদ্যারত্ন পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

২৭। ভূগোলগোলবর্ণনম্‌ ১২৯৯ সাল [১৮৯২ খ্রীস্টাব্দ]

১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম প্রদেশের সিবিলিয়ান জন মিয়র বিদ্যাসাগরকে "পুরাণ সূর্যসিদ্ধান্ত ও য়ুরোপীয় মতের অনুযায়ী" ভূগোল ও খগোল বিষয়ে শ্লোক রচনা করিতে বলেন। বিদ্যাসাগর উক্ত রচনা সমাপ্ত করে পুরস্কার লাভ করেন। এই বইটির মুদ্রণকার্য বিদ্যাসাগরের জীবিতকালে আরম্ভ হলেও তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র নারায়ণ বিদ্যারত্ন প্রকাশ করেন।

গ্রন্থাবলী

১। গ্রন্থাবলী : ১৩০২ সাল

ইহা নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন সম্পাদনা করেন। সম্পাদকের ভূমিকায় প্রকাশ : "পূজ্যপাদ পিতৃদেব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানবলীলা সম্বরণের পর অনেকেই বলিয়াছিলেন যে 'যাঁহার অমৃতময়ী লেখনীর প্রসাদে বঙ্গভাষা পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে, সেই মহাত্মার পুস্তকগুলি গ্রন্থাবলীরূপে প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থাবলী মহামূল্য সামগ্রীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া সর্বত্র সাদরে পরিগৃহীত হইবেক।'

"এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া, আমি এই গ্রন্থাবলী মুদ্রণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কার্যটি বহুব্যয় ও সময় সাধ্য ; এতদিনে, উহার দুই খন্ড মাত্র প্রকাশিত হইল। প্রথম খণ্ডে শকুন্তলা, সীতার বনবাস, বেতালপঞ্চবিংশতি, ভ্রান্তিবিলাস ও মহাভারত উপক্রমণিকা ; দ্বিতীয় খণ্ডে বিধবা বিবাহ বিচার এবং উহার ইংরেজী অনুবাদ ও বহুবিবাহ বিচার সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই ৮ খানি পুস্তকের মূল্য পৃথক মূল্য ধরিলে ৭।।০ টাকা হয় ; কিন্তু সাধারণের সুবিধার জন্য দুই খণ্ডের মূল্য ৪ চারি টাকা মাত্র নির্দিষ্ট হইল। গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ দেখিতে পাইলে পিতৃদেবের রচিত শিশুপাঠ্য ও অপর পুস্তকগুলি প্রকাশিত করিবার সম্পূর্ণ বাসনা রহিল।"

'বিজ্ঞাপন'

২। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী : ১৩৪৪-৪৬ সাল

মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতির পক্ষে 'রঞ্জন পাবলিশিং হাউস' কর্তৃক বিদ্যাসাগরের সমগ্র রচনাবলী 'সাহিত্য' (১৩৪৪), 'সমাজ' (১৩৪৫), 'শিক্ষা ও বিবিধ' (১৩৪৬) মোট তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৩। বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার : ১৩৬৪ সাল

প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত। বিদ্যাসাগরের রচনার সার সঙ্কলিত।

৪। বিদ্যাসাগর রচনাবলী : দেবকুমার বসু-সম্পাদিত।
১ম ও ২য় খণ্ড, ১৯৬৬, ৩য় খণ্ড, ১৯৬৭, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৬৯।

৫। বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ : প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপাল হালদার।
১ম খণ্ড, ১৯৭২ ; ২য় খণ্ড ১৯৭২ ; ৩য় খণ্ড ১৯৭২

সাময়িকপত্রে ও অন্যগ্রন্থে প্রকাশিত রচনাবলী :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা : ফাল্গুন ১৭৭০—চৈত্র ১৭৭৪ শক

'মহাভারতের উপক্রমণিকা' এই পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৭০ শক থেকে চৈত্র ১৭৭৪ শক পর্যন্ত।

সর্বশুভকরী পত্রিকা : ভাদ্র ১৭৭২ শক

'বাল্য বিবাহের দোষ' প্রকাশিত হল।

নীতিবোধ : ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দ

'নীতিবোধ' রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত। এই গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন' থেকে জানা যায় যে প্রথম সাতটি প্রস্তাব বিদ্যাসাগর রচিত।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা : ফাল্গুন ১৭৭৬ শক

'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা'—প্রথম পুস্তিকাটি পুনর্মুদ্রিত হয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা : অগ্রহায়ণ ১৭৭৭ শক।

'বিধবাবিবাহ' ২য় পুস্তিকার অংশ বিশেষ পুনর্মুদ্রিত হয়।

সাহিত্য : বৈশাখ ১২৯৯ সাল

'প্রভাবতী সম্ভাষণ' প্রথমে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সখা : এপ্রিল ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ

'মাতৃভক্তি'—জর্জ ওয়াশিংটনের কথা প্রকাশিত হয়।

সখা : জানুয়ারী ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দ

'ছাগলের বুদ্ধি' প্রথমে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১৩০৮ সাল, ২য় সংখ্যা

'শব্দ-সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়।

রামের অধিবাস : ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দ

নারায়ণ বিদ্যারত্ন লিখিত 'রামের অধিবাস' গ্রন্থে 'রামের রাজ্যাভিষেক' অংশটি বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবিত গ্রন্থের অসম্পূর্ণ রচনা।

ইংরেজী গ্রন্থাবলী

1. A Guide to Bengal : 1850
   'বাঙ্গালার ইতিহাস' দ্বিতীয় ভাগের ইংরাজী অনুবাদ। অনুবাদ করেন 'কলেজ অফ ফোর্ট উইলিয়ম'-এর সম্পাদক ও পরীক্ষক জি. টি. মার্শাল।
2. Widow Marriage: 1855—'বিধবাবিবাহ' পুস্তকের অনুবাদ।
3. Introduction to Sanskrit Grammar in Bengali : 1889
   সংস্কৃত ব্যাকরণের 'উপক্রমণিকা' গ্রন্থের অনুবাদ। অনুবাদ করেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

   Introduction To Sanskrit Grammar In Bengali / By Pundit Iswara Chandra Vidyasagara ; Translated into English With Additions and Alterations For the use of Candidates for University Examinations, / By Rajkrishna Banerjee, / Assistant Professor of Sanskrit in the Presidency College Calcutta/The Sanskrit Press 1866.
4. Exile of Sita : 1904
   'সীতার বনবাস' গ্রন্থের অনুবাদ। অনুবাদ করেন H. Jana Harding.
5. A vocabulary of all words occuring in the text of the Charitabali —J. M. Blumhardt.

সম্পাদিত গ্রন্থ

বাংলা

অন্নদামঙ্গল : ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দ। গদ্য সংগ্রহ ; প্রথম ভাগ ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দ। কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে সঙ্কলিত ; দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দ। ভারতচন্দ্র রায় থেকে সঙ্কলিত।

ইংরাজী

(1) Selections from the Writings of Goldsmith. (2) Poetical Selections from English Literature. (3) Poetical Selection.

হিন্দী

বৈতাল পচ্চীসী : ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দ।

সংস্কৃত

রঘুবংশম্ ১৮৫৩। কিরাতার্জুনীয়ম্ ১৮৫৩। সর্বদর্শন সংগ্রহ : ১৮৫৩-৫৮

শিশুপালবধ ১৮৫৭। কুমারসম্ভব ১৮৬১। কাদম্বরী ১৮৬২। বাল্মীকি রামায়ণম্। মেঘদূতম্ ১৮৬৯। উত্তরচরিতম্ ১৮৭০। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ১৮৭১। হর্ষচরিতম্ ১৮৮৩।

পরিশিষ্ট—চ

উনিশ শতকের ঘটনাক্রম
ও
বিদ্যাসাগরের জীবনপঞ্জী

১৮০০ খৃীস্টাব্দ : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা। এই কলেজে বিদ্যাসাগরের পূর্বসূরী পণ্ডিত রামরাম বসুর চাকরি প্রাপ্তি ১৮০১ ও তাঁহার কৃত প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রকাশ। শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা। ডেভিড হেয়ারের কলিকাতা আগমন।

১৮০২ খৃীস্টাব্দ : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' প্রকাশ। এই বই কলেজের পাঠ্য-গ্রন্থ-রূপে নির্দিষ্ট।

১৮১৪ : এই বছরের মাঝামাঝি থেকে রামমোহন রায়ের স্থায়িভাবে কলকাতায় বাস।

২২ জুলাই। কলকাতায় প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্ম।

২১ অক্টোবর। কলকাতায় রামগোপাল ঘোষের জন্ম।

১৮১৫ : রামমোহনের আত্মীয় সভা স্থাপন।

অনুবাদ ও ভাষ্যসহ রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ। বাংলা ভাষায় রামমোহনই বেদান্তের প্রথম ভাষ্যকার।

১৮১৭ : ২০ জানুয়ারি। কলকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা।

১৫ মে। কলকাতার জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম।

৪ জুলাই। 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা।

নদীয়া জেলার বিল্বগ্রামে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্ম।

১৮১৮ : ১৪ মে থেকে ৯ জুলাই-এর মধ্যে কোন তারিখে, কলকাতা থেকে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায় কর্তৃক 'বাঙ্গাল গেজেটি' সংবাদপত্র প্রকাশ। খাস কলকাতা শহর থেকে প্রবর্তিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি'।

এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র (মাসিক) 'দিগ্দর্শন' এবং ২৩ মে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র (সাপ্তাহিক) 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়।

১ সেপ্টেম্বর : 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা।

নভেম্বর। রামমোহনের 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' গ্রন্থ প্রকাশ।

১৮১৯-০৮ : রাধাকান্ত দেব-কৃত সংস্কৃত অভিধান 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশ।

১৮২০ : ১৫ জুলাই। বর্ধমান জেলার চুপীগ্রামে অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম।

এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে উইলিয়াম কেরী কর্তৃক এগ্রিকালচারাল ও হর্টি-কালচারাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা। এখানে কৃষি বিষয়ে বাংলা পুস্তকাদি প্রকাশিত হতে থাকে।

১৮২০ : ২৬ সেপ্টেম্বর (১২ আশ্বিন, ১২২৭, মঙ্গলবার) মেদিনীপুর জেলার (তদানীন্তন হুগলী) বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম। পিতা—ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা—ভগবতী দেবী।

১৮২১ : ৪ ডিসেম্বর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশ। এই পত্রিকার সঙ্গে রামমোহন রায় ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

সেপ্টেম্বর। রামমোহন রায়ের 'ইউনিটেরিয়ান কমিটি' নামে একটি সভা স্থাপন এবং শিবপ্রসাদ শর্মা নামে 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকা প্রকাশ।

১৮২২ : ১৬ ফেব্রুয়ারি, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্ম। এই বছর মার্চ মাসে বাঙালী মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' গ্রন্থ প্রকাশ। রামমোহন রায়ের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল স্থাপন। ২৬ ডিসেম্বর 'নাটুকে' রামনারায়ণ তর্করত্নের জন্ম।

১৮২৪ : ১ জানুয়ারি,—৬৬ নং বহুবাজারে ভাড়া বাড়িতে 'সংস্কৃত কলেজে'র পাঠারম্ভ। ২৫শে জানুয়ারি, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম। ২৫ ফেব্রুয়ারি, গোলদীঘিতে সংস্কৃত কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

১৮২৬ : ১ মে, সংস্কৃত কলেজ (হিন্দুকলেজ ও স্কুলসহ) গোলদীঘির নবনির্মিত গৃহে স্থানান্তরিত। ৭ সেপ্টেম্বর, রাজনারায়ণ বসুর জন্ম।

১৮২৭ : মাত্র ১৭ বছর বয়সে ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত।

১৮২৭-২৮ : ডিরোজিও ও তাঁর তরুণ ছাত্রদের উদ্‌যোগে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে'র প্রতিষ্ঠা।

*১৮২৫-২৮ : বীরসিংহ গ্রামে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় বিদ্যাসাগরের শিক্ষালাভ।

১৮২৮ : ২০ আগস্ট, রামমোহনের 'ব্রাহ্মসমাজ' সভা স্থাপন।

*১৮২৮ : নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিদ্যাসাগর পিতার সঙ্গে পদব্রজে বীরসিংহ

থেকে কলকাতায় আসেন। বড়বাজার নিবাসী ভগবতচরণ সিংহের গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। স্বরূপচন্দ্র দাসের পাঠশালায় কিছুদিন শিক্ষালাভ করেন।

*১৮২৯ : ১ জুন, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন।

১৮২৯ : ৪ ডিসেম্বর, উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক 'সহমরণ-সতীদাহ প্রথা' আইনবিরুদ্ধ ঘোষণা করেন।

১৮৩০ : ১৭ জানুয়ারি, রক্ষণশীল হিন্দুদের 'ধর্মসভা' স্থাপন।

১৩ জুলাই, রামমোহন রায়ের সহায়তায় আলেকজাণ্ডার ডাফ্ কমললোচন বসুর বাড়িতে স্কুল স্থাপন করেন।

২৯ নভেম্বর, রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন।

১৮৩১ : ২৮ জানুয়ারি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশ।

২৫ এপ্রিল, হিন্দুধর্মবিরোধী মতামত ও নাস্তিকতা প্রচারের অভিযোগে ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষকের পদ থেকে অপসারিত।

১৮ জুন, 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশ।

২৬ ডিসেম্বর, ডিরোজিওর মৃত্যু।

১৮৩৩ : ২৭ সেপ্টেম্বর, ইংলণ্ডের ব্রিস্টলে রামমোহন রায়ের মৃত্যু।

*১৮৩৫ : ক্ষীরপাই গ্রাম নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা দিনময়ী দেবীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিবাহ।

১৮৩৫ : জুন মাসে কলকাতায় 'মেডিকেল কলেজ অব বেঙ্গলে'র প্রতিষ্ঠা। ৭ মার্চ বেণ্টিঙ্ক ইংরেজিশিক্ষা সরকারী নীতিরূপে ঘোষণা করেন।

১৮৩৬ : রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম।

১৮৩৮ : ১৬ মে, 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র (Society for the acquisition of General Knowledge) প্রতিষ্ঠা।

১৭ এপ্রিল, কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম।

২৬ জুন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম।

১৯ নভেম্বর, কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম।

*১৮৩৯ : ১৬ মে, হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষায় বিদ্যাসাগর উত্তীর্ণ হন। এই বছরই ঈশ্বরচন্দ্রের নামের সঙ্গে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি যুক্ত হয়। "This certificate has been granted to the said Issur Chunder Vidyasagur under the seal of the committee this 16th Sixteenth day of May in the year 1839...."

৬ অক্টোবর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা।

১৮৪০ : কালীপ্রসন্ন সিংহ, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম।

*১৮৪১ : ৪ ডিসেম্বর, সংস্কৃত কলেজে বার বছর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন সমাপ্ত। ২৯ ডিসেম্বর, বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে যোগ দেন।

১৮৪৩ : ৯ ফেব্রুয়ারি, মধুসূদন দত্তের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা ও মাইকেল নাম গ্রহণ। ২০ এপ্রিল, জর্জ টমসন ও কয়েকজন ইয়ংবেঙ্গল কর্তৃক 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা। ১৬ আগস্ট, তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ। ২১ ডিসেম্বর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা।

*১৮৪৬ : ৬ এপ্রিল, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদে যোগ দেন। ৬ ডিসেম্বর, লণ্ডনে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু।

১৮৪৭ : ৩১ জানুয়ারি শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম।

*১৮৪৭ : সংস্কৃত কলেজের উন্নতি সাধনের জন্য বিদ্যাসাগরের মতামত—সম্পাদক রসময় দত্ত উপেক্ষা করায়, বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেন। ১৬ জুলাই পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়।

*১৮৪৮ : বিদ্যাসাগর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র 'পেপার-কমিটি'র সভ্য নির্বাচিত হন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নিয়ম ছিল যে, গ্রন্থসম্পাদক বা গ্রন্থাধ্যক্ষ বা অন্য যে কেউ হুন, প্রত্যেকের রচনা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার আগে 'পেপার-কমিটি'র অধিকাংশ সভ্যের দ্বারা পঠিত ও অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।

*১৮৪৯ : ১ মার্চ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কোষাধ্যক্ষের পদে যোগদান।

১৮৪৯ : ৭ মে, ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কলকাতায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথমে এই স্কুলের নাম ছিল 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল', পরে ১৮৫১ সালে বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর স্কুলের নাম হয় 'বেথুন স্কুল'। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন—১৮৪৭ সালে বারাসাতে প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র ও তাঁর ভাই নবীনকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখের উদ্‌যোগে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইটি বাংলাদেশে সম্ভ্রান্ত বাঙালীদের উদ্‌যোগে স্থাপিত প্রথম প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয়। কালীকৃষ্ণ মিত্র ও নবীনকৃষ্ণ মিত্র বিদ্যাসাগরের সুহৃদ্‌ ছিলেন। বিদ্যাসাগর এ ব্যাপারে তাঁদের অর্থ সাহায্য করতেন।

*১৮৫০ : ১৪ জুন, কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোৎসাহিনীসভা প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যোৎসাহিনীসভার সঙ্গে বিদ্যাসাগর কিছুটা যুক্ত ছিলেন।

আগস্ট, সর্বশুভকরী সভার মুখপত্র 'সর্বশুভকরী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের 'বাল্যবিবাহ' নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।
৪ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকরি ত্যাগ করেন।
৫ ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক পদে যোগ দেন।
ডিসেম্বর, বেথুন স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদক।

*১৮৫১ : ২২ জানুয়ারি, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন।
৯ জুলাই, অব্রাহ্মণ হিন্দুদের সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাগ্রহণের অধিকার দান।
অষ্টমী ও প্রতিপদের পরিবর্তে শুধু রবিবার কলেজ বন্ধ রাখার নিয়ম চালু করেন।

১৮৫১ : ৩১ অক্টোবর, 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'র প্রতিষ্ঠা। ডিসেম্বর 'বেথুন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা।

*১৮৫২ : ১২ এপ্রিল, বিদ্যাসাগর 'Notes on the Sanskrit College' নামে ২৬টি পরিচ্ছেদে একটা খসড়া রচনা করেন। ৩০ জুন, হ্যালিডে এই খসড়াটি মন্তব্য সহ শিক্ষাসংসদে প্রেরণ করেন।

*১৮৫৩ : সংস্কৃত কলেজের পঠন-পাঠন ও পুনর্গঠন সম্পর্কে ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্ট এবং এর উত্তরে বিদ্যাসাগরের রিপোর্ট।
বীরসিংহ গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা প্রকাশ।

১৮৫৪ : রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব নাটক'-এর প্রকাশ।
সার চার্লস উড শিক্ষা সম্বন্ধে এক ডেসপ্যাচ ভারত সরকারের কাছে পাঠান। এই ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুযায়ী ভারত সরকার তাদের শিক্ষানীতি পুনর্গঠিত করে।

*১৮৫৪ : জানুয়ারি, বিদ্যাসাগর বোর্ড অব একজামিনার্সের সদস্য হন।
জুন, সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদের মাসিক ১ টাকা বেতন গ্রহণের রীতি প্রচলন করেন।
বাংলার ছোট লাট হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের উপর প্রস্তাবিত মডেল বঙ্গ-বিদ্যালয়গুলির স্থান নির্বাচনের ভার দেন।

*১৮৫৫ : ১ মে, দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয়গুলির সহকারী ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। ১৭ জুলাই, নিজের তত্ত্বাবধানে নর্মাল স্কুল স্থাপন করেন।
৪ অক্টোবর, বিদ্যাসাগর সমাজের নানা স্তরের ৯৮৭ জন লোকের স্বাক্ষরসহ বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন বিষয়ক আবেদন পত্র ভারত সরকারের কাছে প্রেরণ

করেন। বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করে বিধবা-বিবাহের পক্ষে কৃষ্ণনগর, কলকাতা, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বর্ধমান থেকেও আরো স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন পত্র প্রেরিত হয়। বারাসাত ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ৩১৬ জন ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ আবেদন পত্র ৭ ডিসেম্বর, ১৮৫৫ প্রেরণ করা হয়।

বিধবাবিবাহের প্রতিবাদীরাও স্বাক্ষর সংগ্রহ করে। বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ৩৭ হাজার লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ভারত সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়।

২৭ ডিসেম্বর, বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ রহিত করার জন্য আর একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন।

*১৮৫৬ : ১৬ জুলাই, বিধবাবিবাহ আইন পাস।

৭ ডিসেম্বর, কলকাতায় প্রথম আইনানুযায়ী বিধবাবিবাহ। খাটুরা গ্রাম-নিবাসী বিখ্যাত কথক রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বর্ধমান জেলার ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতী দেবীকে বিবাহ করেন। বিদ্যাসাগরের উপস্থিতিতে কলকাতার ১২নং সুকিয়া স্ট্রিটের রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

১২ ডিসেম্বর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে গঠিত কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন বিদ্যাসাগর এবং তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' মনোনীত করা হয়।

১৮৫৭ : জাতীয় মহাবিদ্রোহ। ২৪ জানুয়ারি, কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

*১৮৫৭ ঃ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন নিয়ে ডি. পি. আই. গর্ডন ইয়ং-এর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতপার্থক্য। নভেম্বর ১৮৫৭ থেকে মে ১৮৫৮ এই কয়মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসে খরচ ৮৪৫ টাকা ; ছাত্রীসংখ্যা প্রায় ১,৩০০ জন।

*১৮৫৮ : ৩ নভেম্বর, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ।

১৫ নভেম্বর, বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

বিদ্যাসাগর 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সম্পাদক হন। ৭ নভেম্বর বিপিনচন্দ্র পালের জন্ম। টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্র) 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর প্রকাশ।

*১৮৫৯ : বিদ্যাসাগর 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন।
২৩ এপ্রিল, কলকাতায় উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' নাটকের অভিনয়।

১৮৫৯-৬০ : নীল বিদ্রোহ। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য' প্রকাশ।
বিদ্যাসাগরের পোষকতায় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের অনুবাদের কাজ শুরু করেন। এই অনুবাদের কাজ শেষ হয় ১৮৬৬ সালে।

*১৮৬১ : ২৫ জুলাই, 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর কালীপ্রসন্ন সিংহ ৫০০০ টাকা দিয়ে পত্রিকাস্বত্ব কেনেন এবং বিদ্যাসাগরের হাতে পত্রিকা পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। বিদ্যাসাগর কৃষ্ণদাস পালকে পত্রিকা সম্পাদক নিযুক্ত করেন

১৮৬১ : কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ। রবীন্দ্রনাথের জন্ম। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রকাশ।

*১৮৬২ : ১৫ ডিসেম্বর বেথুন স্কুল সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' প্রকাশ।

*১৮৬৩ : ১২ জানুয়ারি, স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম। ১২ জুলাই, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম। 'বোর্ড অব রেভিনিউ'-এর অনুরোধে বিদ্যাসাগর 'ওয়ার্ডস্ ইন্স্টিটিউশনে'র পরিদর্শকের পদ গ্রহণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি-বিধানের জন্য তিনি একাধিক স্মারকলিপি প্রেরণ করেন।
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

*১৮৬৪ : নভেম্বর, 'কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল' নামের পরিবর্তে 'মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যাসাগরের পরিচালনভার গ্রহণ।
৪ জুলাই, বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির অনরারি মেম্বর।
২০ আগস্ট, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্ম।

১৮৬৫ : বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশ।

*১৮৬৬ : ১ ফেব্রুয়ারি, বহুবিবাহ রহিত করার জন্য বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় বার আবেদন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিদ্যাসাগর রাষ্ট্রীয় বিধানের সাহায্য নিয়ে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু বহুবিবাহ-প্রথা রহিত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিলেন। হিন্দু সমাজে রাষ্ট্রীয় বিধান অনুযায়ী বহুবিবাহ প্রথা রহিত হয় বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার ঠিক একশো বছর পরে ১৯৫৫ সালে।

১৮৬৬ : ১১ নভেম্বর, ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীল অংশের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় কেশবচন্দ্র

'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন। এই সময় থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হয়।

১৮৬৭ : এপ্রিল, বেলগাছিয়া ভিলাতে 'হিন্দু মেলা'র প্রথম অধিবেশন।

১৮৬৮ : ২০ ফেব্রুয়ারি, শিশিরকুমার ঘোষের সম্পাদনায় যশোহর থেকে 'অমৃত-বাজার পত্রিকা' প্রকাশ।

*১৮৭০ : জানুয়ারি, ড. মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স'-এর প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যাসাগর কর্তৃক এক হাজার টাকা দান।

*১৮৭০ : ১১ আগস্ট, বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র দ্বাবিংশবর্ষীয় নারায়ণচন্দ্রের সহিত খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চতুর্দশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর বিবাহ হয়।

*১৮৭১ : ১২ এপ্রিল, কাশীতে ভগবতী দেবীর মৃত্যু।

*১৮৭২ : ১৫ জুন, বিদ্যাসাগর 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফাণ্ডে'র অন্যতম ট্রাস্টি নিযুক্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ। অসবর্ণ বিবাহ আইনসিদ্ধ।

*১৮৭৩ : জানুয়ারি, বিদ্যাসাগর কর্তৃক 'মেট্রোপলিটান কলেজ' প্রতিষ্ঠা। 'দেশীয়-দিগের দ্বারা স্বাধীনভাবে প্রথম এই কলেজ স্থাপিত হইল'।

*১৮৭৫ : ৩১ মে, বিদ্যাসাগর তাঁর সম্পত্তির উইল করেন।

*১৮৭৬ : ২১ ফেব্রুয়ারি 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফণ্ডে'র ট্রাস্টি-পদ ত্যাগ।

১২ এপ্রিল, পিতা ঠাকুরদাসের কাশীতে মৃত্যু। কলকাতা বাদুড়বাগানে নবনির্মিত গৃহে প্রবেশ। এই গৃহেই মহেন্দ্রগুপ্তের (শ্রীম) সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

১৫ সেপ্টেম্বর, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম।

১৮৭৭ : বিপ্লবী মাৎসিনির 'কার্বোনারি'র আদর্শে 'হামচু পামুহাফ' নামে কলকাতায় গুপ্তসভার প্রতিষ্ঠা।

*১৮৮০ : ১ জানুয়ারি, ভারত সরকার বিদ্যাসাগরকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করে।

১৮৮১ : নভেম্বর, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ।

১৮৮২ : বড়লাট রিপন কর্তৃক 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে'র (Local Self Government) প্রস্তাব পেশ। শহরে 'কর্পোরেশন' ও গ্রামে 'জেলাবোর্ড' ও 'লোকাল বোর্ড' স্থাপন।

১৮৮৩ : 'ইলবার্ট বিল' সংক্রান্ত আন্দোলন।

১৮৮৫ : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা।

*১৮৮৮ : ১৩ আগস্ট, পত্নী দিনময়ী দেবীর মৃত্যু।

*১৮৯০ : এপ্রিল, বীরসিংহে বিদ্যাসাগরের 'ভগবতী বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা।

*১৮৯১ : ১৯ মার্চ, নারী ও শিশুদের কল্যাণের জন্য 'ফ্যাক্টরি বিল' পাস হয়। সহবাস-সম্মতি-সূচক (Age of consent to Marriage Bill) বিল পাস হয়। এই বিল কাউন্সিলে উপস্থাপনের প্রাক্কালে, সরকারের অনুরোধে বিদ্যাসাগর তাঁর স্বতন্ত্র মতামত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১ সালে প্রেরণ করেন।

*১৮৯১ : ২৯ জুলাই (১৩ শ্রাবণ ১২৯৮, রাত্রি ২-১৮ মিনিট), ৭০ বৎসর বয়সে, কলকাতায় বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়।

পরিশিষ্ট—ছ

বিধবা-বিবাহ আন্দোলন ও বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনকে তাঁর 'জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম' বলে মনে করতেন। এই 'সৎকর্ম' পালন করতে গিয়ে তিনি 'সর্বস্বান্ত' হয়েছিলেন এবং এজন্য তিনি 'প্রাণান্ত স্বীকারে'ও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি সহোদর শম্ভুচন্দ্রের কাছে লেখা একখানা চিঠিতে লিখেছেন, "আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি ; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব ···।" আমরা জানি, সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর সংকল্প সাধনের জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে গিয়েছেন, এক্ষেত্রে তিনি অনন্য—প্রবাদ-পুরুষ। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়—বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তন বিদ্যাসাগরের জীবনের শ্রেষ্ঠ-কীর্তি।

হিন্দু-বিধবার পুনর্বিবাহের কথাটা বিদ্যাসাগরই প্রথম উত্থাপন করেননি। আমাদের সমাজে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। সংক্ষেপে সে ইতিহাস বর্ণনা করা হলো—

(ক) রাজা রাজবল্লভ ১৭৬০ খ্রীঃ তাঁর বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দেবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এ সম্পর্কে 'ক্ষিতীশ বংশাবলি-চরিত'-এর লেখক দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (নদীয়ার মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের দেওয়ান) লিখেছেন—"বিক্রমপুরবাসী প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ, স্বীয় তরুণ বয়স্কা তনয়ার বৈধব্য যন্ত্রণা দর্শনে, যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হৃদয় হইয়া, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন।" জনশ্রুতি, রাজা রাজবল্লভ দ্রাবিড়, কাশী ও

মিথিলার পণ্ডিতদের কাছ থেকে 'বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে' এ রকম বিধান নিয়ে এসেছিলেন ; কিন্তু নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গোপন বিরোধিতার ফলে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন।

(খ) "রামমোহন রায় 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেছিলেন ১৮১৫ সালে। 'আত্মীয়-সভা'র বৈঠকে যে-সব সামাজিক প্রথার সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা হতো, তার মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বালবৈধব্য অন্যতম। ১৮১৯ সালে এই সভার একটি বৈঠকের বিবরণে দেখা যায়—'At the meeting in question....the necessity of an infant widow passing her life in a state of celibacy, the practice of polygamy and of suffering widows to burn with the corpse of their husbands, were condemned....'। জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার সমস্যার সঙ্গে বালবৈধব্য-বহুবিবাহ-সতীদাহের সমস্যাও 'আত্মীয় সভা'র বৈঠকে নিয়মিত আলোচিত হতো। ১৮২৮-২৯ সাল থেকে ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্র-শিষ্যদের 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে'র বৈঠকেও এইসব সামাজিক সমস্যা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হয়েছে।"—(বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ : বিনয় ঘোষ ; পৃঃ ২৪২)।

(গ) "বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের আন্দোলন প্রথম উত্থাপিত করেন, এমন নহে। তাঁহার প্রায় ১৯ কি ২০ বৎসর পূর্বে মধ্যপ্রদেশ-নাগপুরের এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ এ বিষয়ে আন্দোলন তুলিয়াছিলেন। সে আন্দোলনে ফল হয় নাই।...বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ-বিষয়িণী পুস্তিকা প্রকাশিত হইবার ২০ বৎসর পূর্বে মাদ্রাজের এক ব্রাহ্মণ এতৎ সম্বন্ধে আইন করাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।"—(বিদ্যাসাগর/ বিহারীলাল সরকার ; পৃঃ ১৭৭)।

(ঘ) ১৮৩৭—৩৮ সালে, "ভারতীয় 'ল কমিশন' (Indian Law Commission) বালবিধবাদের পুনর্বিবাহের সমস্যাটি বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করে আইন প্রণয়নের জন্য সর্বপ্রথম উদ্যোগী হন।" 'ল কমিশনে'র তৎকালীন সেক্রেটারি জে. পি. গ্রাণ্ট এ বিষয়ে মতামত জানার জন্য ৩০ জুন ১৮৩৭, কলকাতা-এলাহাবাদ-মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলের সদর আদালতের বিচারকদের কাছে চিঠি দেন। 'মানবিক কর্তব্যের দিক থেকে আইন পাস করলে ন্যায়সংগত কাজই হবে'—এ কথা বলেও বিচারকেরা এ জাতীয় আইন পাস করা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে বলেই, তা বাতিল করে দেন।—(বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, পৃঃ ২৪২—২৪৩)।

(ঙ) "অনেকের সংস্কার আছে, পন্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্বপ্রথমে বঙ্গসমাজে বিধবা বিবাহের বিচার উপস্থিত করেন। কিন্তু বোধহয় তাহা ঠিক নহে। ১৮৪২ সাল হইতে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ডিরোজিও শিষ্যগণ যে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটার' নামক কাগজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে তাঁহারা বিধবা-বিবাহের বৈধতা বিষয়ে বিচার উপস্থিত করেন। কয়েক মাস ধরিয়া ঐ পত্রে উক্ত বিচার চলিয়াছিল। এমন কি 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' ইত্যাদি যে পরাশর বচনের উপরে ভিত্তি স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সর্বপ্রথম উক্ত পত্রে বিচারের মধ্যে উদ্ধৃত করা হয়।"—(রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ / শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ১৬৬)।

(চ) মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং নবদ্বীপের পণ্ডিত-মণ্ডলীকে দিয়ে বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত করানোর জন্য উদ্যোগী হন। "এমন সময়ে, নগরস্থ নব্যসম্প্রদায় সহসা এখানকার কলেজ গৃহে এক সভা করিয়া স্বদেশের প্রচলিত রীতিনীতির বহুবিধ নিন্দাবাদ করণান্তর বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বিরুদ্ধবাদিগণ, নবমতাবলম্বীরা কলেজে একত্র হইয়া স্বহস্তে গোহত্যা করিয়া, তাহার মাংস ভোজন ও মদিরা পান করিয়াছেন, এইরূপ অপবাদ সর্বত্র রটনা করিয়া দিলেন।…রাজা যে ব্যবস্থা লইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাই এই গোলযোগে বিফল হইয়া গেল।"—(ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিত / দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়)। "অনুমান করি পূর্বোক্ত গোহত্যার আন্দোলন ও বিধবা-বিবাহের সভা ১৮৫০ সালের অবসানে বা ১৮৫১ সালের প্রারম্ভে ঘটিয়া থাকিবে…।"—(রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ / শিবনাথ শাস্ত্রী ; পৃঃ ১৬৯)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, রামতনু লাহিড়ীর বন্ধু এবং ডিরোজিও-শিষ্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৮৫৬ সালের হিন্দু-বিধবা-বিবাহ আইন পাস হওয়ার বেশ কয়েক বছর আগেই বর্ধমানের বিধবা রানী বসন্ত-কুমারীকে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে বঙ্গদেশে তুমুল আলোড়ন তুলেছিলেন। বিধবা-বিবাহের সমর্থক, 'সম্বাদভাস্কর' সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য) এই বিয়ের সাক্ষী ছিলেন।

(ছ) "কলিকাতা শহরের প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য মতিলাল শীল বিধবা-বিবাহ প্রচলনের উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি কৃতকার্য হন নাই।"—(১০.২.১৮৫৫ তারিখে 'সংবাদ-প্রভাকরে'র পাতায়

এ তথ্য পাওয়া যায়)। "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশিত হইবার দুই বৎসর পূর্বে পটলডাঙা-নিবাসী শ্যামাচরণ দাস নামক কর্মকার জাতীয় এক ধনাঢ্য ব্যক্তি আপনার বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণ এ বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন—কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভাস্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ। পরে ইঁহাদের অনেকের ভ্রান্তি দূর হইয়াছিল। শ্যামাচরণ দাস বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই।" (বিদ্যাসাগর / বিহারীলাল সরকার; পৃঃ ১৭৭-৭৮। এই তথ্যটি বিদ্যাসাগর অনুজ শম্ভুচন্দ্রও তাঁর 'বিদ্যাসাগর-জীবন চরিতে' উল্লেখ করেছেন)। বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব—প্রথম পুস্তকের দ্বিতীয় মুদ্রণের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর স্বয়ং এ তথ্য দিয়েছেন।

(জ) ১৮৫৫ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের সমর্থনে "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" নামে একখানি পুস্তিকা লেখেন। রচনাটি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়ও (ফাল্গুন ১৭৭৬ শক, চতুর্থ ভাগ, ১৩৯ সংখ্যা) প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয়—"শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বিধবা-বিবাহ বিষয়ক যে পুস্তক পূর্বমাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই ঐ আন্দোলনের মূলীভূত। অপর সাধারণ সকল লোকেই ঐ পুস্তক অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত বিষম ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে, ইদানীং ঐ বিষয়ই সর্বত্র সকল লোকের কথোপকথনের প্রধান বিষয় হইয়া উঠিয়াছে,...।" (বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ / বিনয় ঘোষ, পৃঃ ২৪৭)।

"শহরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিকেই বাদ-প্রতিবাদের ধূম লাগিয়া গেল।" (বিদ্যাসাগর / বিহারীলাল সরকার; পৃঃ ১৭৩)। "বিধবা-বিবাহ পুস্তক প্রচারিত হইবামাত্র, লোকে এরূপ আগ্রহ-প্রদর্শনপূর্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, এক সপ্তাহের অনধিক কাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষ হইয়া গেল।"—(বিদ্যাসাগর জীবনচরিত/শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন; পৃঃ ১২০)। "বিধবা-বিবাহ-সংক্রান্ত প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হইবার পর চারিদিকেই নানা পণ্ডিত-সমাজ হইতে ইহার প্রতিবাদ-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল।.... যশোহর হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী সভা ও কলিকাতা ধর্মসভা হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃত বিধবা-বিবাহ প্রস্তাবের প্রবল প্রতিবাদ হইয়াছিল।"—(বিদ্যাসাগর / বিহারীলাল সরকার; পৃঃ ১৭৫)।

বিধবা-বিবাহের সমর্থনে প্রথম পুস্তিকা প্রকাশের পর যে-সব প্রতিবাদ বের হয়েছিল তার উত্তর দিয়ে বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

বিধবা-বিবাহের সমর্থনে বিদ্যাসাগর যে শাস্ত্র প্রমাণ দেন, তা বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রথম পুস্তক থেকে উদ্ধৃত হলো—"পরাশর সংহিতা কলিযুগের ধর্ম-শাস্ত্র। অতঃপর এই অনুসন্ধান করা আবশ্যক, বিধবাদিগের পক্ষে পরাশর-সংহিতাতে কিরূপ ধর্ম নিরূপিত আছে। উক্ত গ্রন্হের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে,

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

* * *

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ করা শাস্ত্র-বিহিত।"....

(বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ—২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫-২৬)

শাস্ত্র প্রমাণ ছাড়াও বিধবা-বিবাহ সমর্থনের জন্য দেশবাসীর উদ্দেশে বিদ্যাসাগর যে মানবিক-আবেদন জানিয়েছিলেন তাও এখানে স্মরণযোগ্য। বিধবা-বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহার থেকে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো—
"হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কত কাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমোদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে। একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। ....তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, তাহারা দুর্নিবার-রিপুবশীভূত হইয়া ব্যভিচারদোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ, ধর্মলোপ ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জা ভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু, কি আশ্চর্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত

যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়। যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক-রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।"—(বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ—২ খণ্ড, পৃঃ ১৬৪-৬৫)।

(ঝ) বিধবা-বিবাহের অনুকূলে বিদ্যাসাগর স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন এবং প্রায় একহাজার লোকের (৯৮৭ জন) স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্র ৪.১০.১৮৫৫ তারিখে ভারত সরকারের কাছে প্রেরণ করেন। এই আবেদন পত্রের শেষ অনুচ্ছেদের অনুবাদ নিচে উদ্ধৃত হলো—"আবেদনকারীদের প্রার্থনা এই যে, ব্যবস্থাপক সভা যত শীঘ্র সম্ভব বিধবাবিবাহের বৈধতা স্বীকার ক'রে এক আইন প্রণয়ন ও প্রচার করেন, যাতে হিন্দুদের বিধবাবিবাহের সর্বপ্রকার বাধা দূর হয় এবং বিবাহ-জাত সন্তানেরা সমাজে বৈধ সন্তান বলে গৃহীত হয়।"—('বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থে ২৫৩ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত)।

(ঞ) ১৭.১১.১৮৫৫ তারিখে ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য মিঃ গ্র্যাণ্ট বিধবা বিবাহ আইনের খসড়া পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠের পর আইনের পাণ্ডুলিপি ১৯.১.১৮৫৬ তারিখে সিলেক্ট কমিটির হাতে অর্পিত হয়।

(ট) "১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ আইনের বিরুদ্ধে রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ছত্রিশ হাজার সাত শত তেষট্টি জন লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র পেশ করা হয়।"—(বিদ্যাসাগর/বিহারীলাল সরকার ; পৃঃ ১৯১)।

(ঠ) শেষপর্যন্ত ১৮৫৬, ২৬ জুলাই বিধবা-বিবাহ আইন পাস হয়। আইনের প্রথম ও ষষ্ঠ ধারাটির অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো—

১ম. ধারা : "স্বামী মারা গেছে এমন কোনো হিন্দু মেয়ে, বা বাগ্‌দান হয়েছে, কিন্তু বিয়ের আগেই হবু স্বামী মারা গেছে এমন কোনো হিন্দু মেয়ে যদি আবার বিয়ে করে, তা হলে সেই বিয়ে হিন্দু আচার ও হিন্দু আইনসম্মত নয় একথা বলা হবে না এবং সেই বিবাহজাত সন্তানদের অবৈধ বলেও গণ্য করা হবে না।"

ষষ্ঠ ধারা : "আগে বিবাহিত নয়, এমন কোনো হিন্দু মেয়ের বিবাহে যে মন্ত্র

উচ্চারিত হয় বা যে সব আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়, যার ফলে বিবাহ অনুষ্ঠানটি আইনসিদ্ধ বলে গণ্য হয়, হিন্দু বিধবার বিবাহেও সেই সব মন্ত্র উচ্চারিত হলে বা আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হলে একই ফল হবে। ঐ সব মন্ত্র বা আচার-অনুষ্ঠান হিন্দু বিধবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এই আপত্তিতে ঐ বিবাহকে বে-আইনী বলা হবে না।"

২৬.৭.১৮৫৬ বিধবা-বিবাহ আইন পাস হয়। বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতীরা বিদ্যাসাগরকে অভিনন্দিত করলেন; আর বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে নানাভাবে তাঁকে অপদস্থ করেছেন; এমনকি তাঁর প্রাণনাশের চক্রান্তও করা হয়েছিল বলে শোনা যায়। বিধবা-বিবাহের সমর্থক 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও 'হিতবাদী' পত্রিকায় লেখা হলো—

"এই মহৎ ব্যাপার যে ক'এক ব্যক্তি অসামান্য ধীসম্পন্ন প্রসন্নমতি মহাত্মাদিগের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তন্মধ্যে মহামান্য ও সর্বাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণ আমরা জীবন সত্ত্বেও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অদ্বিতীয় নাম এই অসাধারণ কীর্তির সহিত মহীতলে চিরকাল জীবিত থাকিবে।"—(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা)।

"বিদ্যাসাগর পথে বাহির হইলে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিত; কেহ পরিহাস করিত, কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহার করিবার— এমন কি মারিয়া ফেলিবারও ভয় দেখাইত। বিদ্যাসাগর এ সকলে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না।"—(হিতবাদী পত্রিকা / বিদ্যাসাগর / বিহারীলাল সরকার; পৃঃ ২০১)।

১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে বিধবা-বিবাহ আইন পাস হয়। ১৮৫৬ থেকে ১৮৯১ খ্রীঃ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশাতেই বাংলা দেশে বেশ কিছু বিধবা-বিবাহ হয়। এই সব বিবাহের ব্যয় বহুক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগর বহন করেছেন। তাঁর জীবনী লেখকেরা উল্লেখ করেছেন, ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত মাত্র ১১ বছরের মধ্যেই ৬০টি বিধবা-বিবাহ দিতে বিদ্যাসাগর ৮২,০০০ টাকা ব্যয় করেছিলেন। এজন্য তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

নিচে কয়েকটি বিধবা-বিবাহের বিষয়ে উল্লেখ করা হলো—

(ক) বিধবা-বিবাহ আইন অনুযায়ী প্রথম বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ৭.১২.১৮৫৬ তারিখে। বর—রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়) বিদ্যারত্ন। কনে—ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশম বর্ষীয়া বিধবা-কন্যা কালীমতী দেবী।

এই বিবাহে বিদ্যাসাগর প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয় করেছিলেন। "১৮৫৬ সালের শেষভাগে যেদিন প্রথম বিধবা-বিবাহ দেওয়া হয়, সেদিন আমি বাসার লোকের সঙ্গে সে বিবাহ দেখিতে গিয়াছিলাম। সে কি ভিড়! সুকিয়া স্ট্রীটের রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে ঐ বিবাহ হয়।"—(আত্মচরিত/ শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ৪৪)।

(খ) ৮.১২.১৮৫৬ তারিখে কলকাতার ঈশানচন্দ্র মিত্রের ১২ বছরের বিধবা মেয়ে থাকমণির সঙ্গে বিয়ে হয় ২৪ পরগণা পানিহাটির মধুসূদন ঘোষের। এ বিয়ের সমস্ত ব্যয় বহন করেন বিদ্যাসাগর।

(গ) ২১.২.১৮৫৭ তারিখে কলকাতার রামসুন্দর ঘোষের ১৪ বছরের বিধবা মেয়ে গোবিন্দমণির সঙ্গে বিয়ে হয় ২৪ পরগণা বোড়াল গ্রামের মধুসূদন বসুর ছেলে দুর্গাচরণ বসুর। দুর্গাচরণ বসু রাজনারায়ণ বসুর জেঠতুতো ভাই। এই বিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় দিয়েছিলেন।

(ঘ) ৮.৩.১৮৫৭ তারিখে হরিশচন্দ্র বিশ্বাসের ১৪ বছরের বিধবা মেয়ে নৃত্যকালীর সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর মেজভাই মদনমোহন বসুর বিয়ে হয়। এই বিয়ের সমস্ত ব্যয় বহন করেন বিদ্যাসাগর। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিত'-এ লেখেন, "তৃতীয় বিধবা-বিবাহ ও চতুর্থ বিধবা-বিবাহ আমার জেঠতুত ভাই দুর্গানারায়ণ ও আমার সহোদর মদনমোহন বসু করেন।"

(ঙ) ডিসেম্বর, ১৮৫৭ খ্রীঃ মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা গ্রামের স্বরূপচন্দ্র চক্রবর্তীর বিধবা মেয়ে লক্ষ্মীমণির সঙ্গে যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিয়ে হয়। এই বিয়ে বিদ্যাসাগর দিয়েছিলেন। ৩.১১.১৮৫৮ তারিখে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করেন। "সেই বৎসর তিনি হুগলী জেলার মধ্যে কতকগুলি গ্রামে নিজ ব্যয়ে ১৫টি (পনেরটি) বিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন।"—(বিদ্যাসাগর/বিহারীলাল সরকার ; পৃঃ ২১৯)।

(চ) ১৮৬৪ খ্রীঃ ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রচারক অঘোরনাথ রায় (পিতা—যাদবচন্দ্র রায়, কবিভূষণ) একজন অসবর্ণ বাল-বিধবাকে বিয়ে করেন।

(ছ) ১৮৬৮ খ্রীঃ যোগেন্দ্রনাথ (বন্দ্যোপাধ্যায়) বিদ্যাভূষণ ঈশানচন্দ্র রায়ের বিধবা বোন মহালক্ষ্মী দেবীকে বিয়ে করেন। এই বিয়ে সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিতে' লেখেন, "এই বিবাহ ১৮৬৮ সালের প্রথম ভাগে হয়।.... আমি শৈশবাবধি বিদ্যাসাগরের চেলা ও বিধবা-বিবাহের পক্ষে।—...যোগেন্দ্র ও ঈশানের ভগিনী মহালক্ষ্মী পরস্পরের সহিত পরিচিত হইলেন ; এবং বিবাহিত হওয়া স্থির করিলেন। মহালক্ষ্মীর বয়স তখন বোধহয় ১৮ বৎসর হইবে।...

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবাহের সমুদয় ব্যয় দিলেন, এবং আমার যতদূর স্মরণ হয়, কন্যাকে কিছু কিছু গহনা দিলেন।"—(আত্মচরিত/শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ৭৫-৭৬)।

(জ) ১৮৬৮ খ্রীঃ "গত শুক্রবার রাত্রিতে ভবানীপুরস্থ মৃত নবকৃষ্ণ বসুর বিধবা কন্যার সহিত বহুবাজারস্থ শ্রীযুক্তবাবু শ্রীনাথ দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাসের বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।"—('সোম প্রকাশ, ৫ শ্রাবণ ১২৭৬)।

(ঝ) রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বিধবা গণেশসুন্দরী বা মনোমোহিনী দেবীকে বিয়ে করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "গণেশসুন্দরী কলিকাতা নিবাসী এক বৈদ্য পরিবারের বিধবা কন্যা। ...তৎপরে ঈশ্বর কৃপায় অতি উপযুক্ত ব্যক্তির সহিত (রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নামক আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সহিত) বিবাহিত হইয়াছেন। আমি তাঁহার গণেশসুন্দরী নাম তুলিয়া দিয়া তাঁহার অপর নাম মনোমোহিনীই প্রবল করিয়াছি।"—(আত্মচরিত, পৃঃ ৯৯-১০০)।

(ঞ) ১৮৬৯ খ্রীঃ "ক্ষীরপাই নিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামে কেঁচকাপুর স্কুলের হেড পণ্ডিত কাশীগঞ্জবাসিনী মনোমোহিনী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ-বিধবাকে বিবাহ করিতে উদ্যোগ করেন। পাত্র-পাত্রী উভয়কেই বীরসিংহ গ্রামে আনয়ন করা হইয়াছিল।... বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যমভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও গ্রামের অন্যান্য কয়েকজন রজনীযোগে তাঁহাদের বিবাহ-কার্য সম্পাদন করিয়া দেন।"—(বিদ্যাসাগর / বিহারীলাল সরকার ; পৃঃ ২৯২)।

(ট) ১১.৮.১৮৭০ তারিখে বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ১৪ বছর বয়সী বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীকে বিয়ে করেন। এই বিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগর এক চিঠিতে লিখেছেন, "২৭ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, নারায়ণ ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে।... আমি বিধবা-বিবাহের প্রবর্তক ; আমরা উদ্‌যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি। এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারীবিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া, আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে, তাহার পথ করিয়াছে।"

(ঠ) ১৮৬০-১৮৭০ খ্রীঃ বিদ্যাসাগরের স্নেহভাজন এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর সুহৃদ্ দুর্গামোহন দাস পূর্ববঙ্গের বরিশালে বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টায় বরিশালে বেশ কয়েকটি বিধবাবিবাহ হয়।

পিতার মৃত্যুর পর দুর্গামোহন দাস তাঁর অল্পবয়স্ক বিধবা-বিমাতারও আবার বিয়ে দেন। "অনেক বিধবার বিবাহ কার্য সমাধা হইল ; তন্মধ্যে দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের বিমাতার বিবাহ সর্বপ্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য। নিজে উদ্যোগী হইয়া বিমাতার বিবাহ দেওয়া ইহার পূর্বে ঘটে নাই, হয়ত পূর্বে কেহ স্বপ্নেও দেখে নাই। এই কার্যে শুধু বরিশাল কেন সমগ্র বঙ্গদেশ আন্দোলিত হইয়া যাইতে লাগিল।"—(রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ / শিবনাথ শাস্ত্রী ; পৃঃ ২৩৬)। …"অনেক ব্যয় ও অনেক কৌশলে বিমাতাকে কাশী হইতে চুরি করিয়া আনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যে বিবাহ দেওয়া হইল।" —ঐ/পৃঃ ২৯৭)।

(ড) ব্রজসুন্দর মিত্র—"কলিকাতাতে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন উপস্থিত হইলে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত পুস্তকসকল নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া পূর্ববঙ্গে বিতরণ করিয়াছিলেন। …১৮৬২ সালে ব্রজসুন্দরবাবু স্বীয় বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার জন্য সকল আয়োজন করেন, কেবল তাঁহার জননী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হওয়াতেই সে কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়।"—(ঐ পৃঃ ২৩৩)। মা মারা গেলে পর ব্রজসুন্দরবাবু তাঁর বিধবা মেয়ের বিয়ে ব্রাহ্মমতে দিয়েছিলেন।

(ঢ) ১৮৭৬ খ্রীঃ শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন হিন্দু বিধবাকে বিয়ে করেন।

(ণ) ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস সংসারচন্দ্র সেনের বিধবা ভাগিনেয়ী হেমাঙ্গিনী দেবীকে বিয়ে করেন।

(ত) ১৮৮১ খ্রীঃ জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নেতা বিপিনচন্দ্র পাল বোম্বাইয়ের এক ব্রাহ্মণ বাল-বিধবাকে ব্রাহ্মমতে বিয়ে করেন।

(থ) ১৮৯১ খ্রীঃ দুর্গামোহন দাস ঢাকার কালীনারায়ণ গুপ্তের এক বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি কবি অতুলপ্রসাদ সেনের বিধবা মাতা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মৃত্যুর দু-মাস আগে রোগশয্যা থেকে দুর্গামোহন দাসকে এই উপলক্ষ্যে একখানি চিঠি লেখেন—

প্রিয় ভ্রাতঃ

তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে, এই সংবাদে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম। আমার আন্তরিক বাসনা ও প্রার্থনা এই, যে কয়েকদিন জীবিত থাক, নব প্রণয়িনীর সহিত সুখে কালযাপন কর। তোমার নব প্রণয়িনীকে আমার আশীর্বাদ ও স্নেহ-সম্ভাষণ জানাইবে। ইতি ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

বিদ্যাসাগরের জীবন ও সাহিত্য-বিষয়ক রচনা

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ—যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর
অমরেন্দ্রনাথ বসু—বাংলার নবরত্ন-শিক্ষাবিস্তারে
অমলকুমার রায়—বিদ্যাসাগর ও পরমহংস
অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ—বিদ্যাসাগর
অরুণ চক্রবর্তী—শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর
অসীমা মৈত্র—শতবর্ষের আলোয়
আজাহারউদ্দিন খান ও উৎপল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত—বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্হ
ইন্দ্র মিত্র—করুণাসাগর বিদ্যাসাগর
ইন্দ্র মিত্র—বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা
ঋষি দাস—বিদ্যাসাগর
এস. কে বোস—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
কনক বন্দ্যোপাধ্যায়—মনীষীদের জীবনস্মৃতি
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য—পুরাতন প্রসঙ্গ
গোপালচন্দ্র মিশ্র—বাংলার বিদ্যাসাগর
গোপালচন্দ্র রায়—বিদ্যাসাগরের হাসির গল্প
গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত—বিদ্যাসাগর
জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর
দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বিদ্যাসাগর
নগেন্দ্রনাথ সোম—মধু স্মৃতি
নমিতা চক্রবর্তী—বিদ্যাসাগর
নারায়ণচন্দ্র শর্মা—বিদ্যাসাগর প্রশস্তি
প্রণবরঞ্জন ঘোষ—উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার মনন ও সাহিত্য
প্রবোধচন্দ্র বসু—বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন
ঐ —সাগর তরঙ্গ
প্রিয়দর্শন হালদার—বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী
বদরউদ্দীন উমর—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ

বিনয় ঘোষ—বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ
বনফুল—বিদ্যাসাগর
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর
বিপিনবিহারী গুপ্ত—পুরাতন প্রসঙ্গ
বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর
বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে ছড়াগান কবিতা
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ
ঐ —সাহিত্যসাধক চরিতমালা (২য় খণ্ড)
মণি বাগচী—বিদ্যাসাগর
যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
যোগনাথ মুখোপাধ্যায়—প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর
যোগীন্দ্রনাথ বসু—মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত
যোগীন্দ্রনাথ সরকার—বিদ্যাসাগর
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—বিদ্যাসাগর
যোগেশচন্দ্র বাগল—বিদ্যাসাগর পরিচয়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চরিত্র পুজা
ঐ —বিদ্যাসাগর চরিত
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—চরিত কথা
রাধারমণ মিত্র—কলিকাতায় বিদ্যাসাগর
রমেশচন্দ্র দত্ত—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (রমেশ-রচনাবলী ২য় খণ্ড)
শক্তি রাহা—বিদ্যাসাগর : সমকাল থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব
শঙ্খ ঘোষ ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত—বিদ্যাসাগর
শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বিদ্যাসাগর জীবনচরিত
ঐ —বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরসন
শরচ্চন্দ্র কাব্যরত্ন—বিদ্যাসাগর চরিত
শরৎকুমার রায়—বিদ্যাসাগর চরিত
শিবনাথ শাস্ত্রী—আত্মচরিত
ঐ —রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ
ঐ —স্বনামা পুরুষ
শিবরতন মিত্র—বিদ্যাসাগর
সত্যপ্রসাদ গুপ্ত সম্পাদিত—বিদ্যাসাগর স্মৃতি

সন্তোষ অধিকারী—বিদ্যাসাগর
ঐ —বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষ দিনগুলি
সন্তোষ অধিকারী ও ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত—বিদ্যাসাগর পরিক্রমা
সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী—প্রকাশক বিদ্যাসাগর
ঐ —সংস্কৃত কলেজ ও বিদ্যাসাগর
সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার—বাঙালী জীবনে বিদ্যাসাগর
স্বদেশরঞ্জন দত্ত—বিদ্যাসাগর
হরিপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত—বিদ্যাসাগর স্মরণিকা
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়—বঙ্গভাষার লেখক
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
Arabinda Guha—Unpublished letters of Vidyasagar
Asok Sen—Iswarchandra Vidyasagar and his elusive milestone
Amalesh Tripathi—Vidyasagar : The Traditional Moderniser
Subalchandra Mitra—Iswarchandra Vidyasagar : a story of his life and work
Sureshprasad Neyogi—Glimpses of Early History of the Calcutta Sanskrit College
Gopal Haldar—Vidyasagar

বি. দ্র. এ তালিকা সম্পূর্ণ নয়, এর বাইরে অনেক রচনা রয়েছে।